শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

সমগ্র রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড



সুভাষচন্দ্র বসু

সমগ্র রচনাবলী



শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমগ্র রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

চিঠিপত্র, নিবন্ধ এবং বিবৃতি

(জানুয়ারি ১৯৩৮ - এপ্রিল ১৯৩৯)

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১০

সম্পাদনা শিশিরকুমার বসু ও সুগত বসু
অনুবাদ ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

© নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো, কলিকাতা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7756-939-1

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকদ্বয়ের ভূমিকা

১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে এক সাক্ষাৎকারে সুভাষচন্দ্র বোস রজনী পাম দত্তকে বলেছিলেন, "আজকের দিনে আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টে সংগঠিত করা উচিত এবং তার দুটি লক্ষ্য থাকবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।"[১] কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্যে নির্বাচিত সুভাষচন্দ্র এই সময় স্বল্পকালের জন্যে লন্ডনে ছিলেন। কেমব্রিজে যখন তিনি ছাত্র ছিলেন, তার পরে এটাই ছিল সে-দেশে তাঁর প্রথম যাওয়া। ১৫ জানুয়ারি ১৯৩৮-এর রাতে আরেকজন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়, তিনি ছিলেন আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি ডি ভ্যালেরা।[২] লন্ডনে তিনি যতদিন ছিলেন তার মধ্যে বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ রাজনীতিক, বিশেষত শ্রমিক দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর কয়েকবার বৈঠক হয়েছিল।

ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান লিখেছিল, "যে-সকল ইংরেজ ব্যক্তি প্রথমবার শ্রীবোসের সঙ্গে আলাপ করেন, তাঁর শান্ত, ধীর আচরণ ও ভারত-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় সম্পর্কে আলোচনার সময়ে তাঁর সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট বক্তব্য তাঁদেরকে চমৎকৃত করে।[৩] সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮-এ ২৩ জানুয়ারি, তাঁর ৪১তম জন্মদিনে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং যত দিন তিনি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, তাঁর নির্দিষ্ট দ্বিবিধ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে চেষ্টা করে যান।

নেতাজির রচনা-সংগ্রহের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডটিতে সংকলিত হয়েছে জানুয়ারি ১৯৩৮ থেকে ১৯৩৯-এর ২৯ এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তাঁর পদত্যাগের অব্যবহিত পর পর্যন্ত তাঁর ভাষণ, রচনা ও চিঠিপত্র। এইসবে তাঁর আলোচ্য বিষয় সাম্রাজ্যবাদ এবং জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয় পরিকল্পনা, বিজ্ঞান, সাংবিধানিক নানা বিষয়, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, নারীর ভূমিকা, ইউরোপীয় রাজনীতি প্রভৃতি। এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্ভবত ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরায় প্রদত্ত সভাপতির প্রসিদ্ধ ভাষণটি।[৪] হরিপুরার উদ্দেশে যাত্রার প্রাক্কালে কলকাতায় নিজের বাসভবনে রচিত এই ভাষণে পাওয়া যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্বব্যাপী সংগঠনের বিবিধ শক্তি ও দুর্বলতার এক অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ ও স্বাধীন ভারতের আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের একটি সাম্যতন্ত্রী মনশ্চিত্র। বিশেষভাবে যা লক্ষ করবার তা হল, এই ভাষণে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সম্পর্কে কোনও বিদ্বেষ নেই। তাঁদেরকে তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, সাম্রাজ্যকে স্বাধীন জাতি সমূহের একটি বন্ধনহীন সঙ্ঘে পরিণত করতে। লেনিনের একটি উক্তি তিনি উদ্ধৃত করেছেন, "কয়েকটি জাতিকে পদানত করার ফলে ব্রিটেনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আরও পুষ্ট ও শক্তিশালী হয়েছে।" সুভাষচন্দ্র বলেন:

---

১. এই বইয়ের ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. এই বইয়ের ১৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩. শিশিরকুমার বোস ও অন্যান্যদের A Beacon Across Asia: A Biography of Subhas Chandra Bose (New Delhi, 1973) পৃ. ৭১-এ উল্লিখিত।

৪. এই গ্রন্থের ৪-২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

> "আমরা যারা ভারত ও অন্যান্য পরাধীন দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছি, তারা সেই সঙ্গে লড়াই করছি ব্রিটিশ জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যেও। ....একবার আমরা প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা লাভ করলে, ব্রিটিশ জনগণের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত আন্তরিক সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়ার কোনও কারণ নেই।"

ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন প্রতিহত করবার জন্যে যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে থাকে, তার সম্পর্কে সাবধান থাকবার উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র এ বিষয়েও অবহিত ছিলেন যে—"বিভক্ত করো এবং শাসন করো নীতি" "শাসক শক্তির পক্ষেও অবিমিশ্র ভাল নয়।" সুভাষচন্দ্র দেখতে পেয়েছিলেন, "স্বেচ্ছাতন্ত্রী" রাজন্যবর্গ এবং "ব্রিটিশ ভারতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পাশাপাশি অবস্থানের মধ্যে" "বিভক্ত করার নীতি" নিহিত এবং ১৯৩৫-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের বিরুদ্ধে তিনি আপোষহীন সংগ্রামের আহ্বান জানান। সুভাষচন্দ্রের আশঙ্কা ছিল, সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে ব্রিটিশেরা "ভারতকে বিভক্ত করার অন্য কোনও সাংবিধানিক উপায় সন্ধান করবে এবং সেই ভাবে ভারতীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকে অর্থহীন করে দেবে।" কিন্তু সুভাষচন্দ্র একইরকমভাবে এ-ও দেখতে পেয়েছিলেন যে, ব্রিটেন তার নিজের "রাজনৈতিক দ্বৈতনীতির জালে" নিজেই পড়বে, আসলে সেটা ভারতেই হোক আর প্যালেস্টাইন কিংবা ইরাক কিংবা আয়ারল্যান্ডেই হোক, তার বিভাজন নীতিরই ফল। সেই কারণে তিনি ভারতের সংখ্যালঘু সংক্রান্ত প্রশ্নটি অবিলম্বে সমাধানের সংকল্প করলেন। চেষ্টা করলেন, এবং বললেন, "ধর্মীয় ব্যাপারে তুমিও বাঁচো, আমিও বাঁচি, নীতি অবলম্বন করা উচিত এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবিধ প্রশ্ন সম্পর্কে একটা বোঝাপড়া করা উচিত।" তিনি আরও চাইলেন, তথাকথিত দলিত শ্রেণিসমূহের প্রতি সুবিচার করা হোক। বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের জন্যে তিনি সাংস্কৃতিক স্বাধিকার দাবি করলেন, আবার সাধারণ ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে বললেন হিন্দুস্তানি (হিন্দি ও উর্দুর মিশ্রণ), রোমান হরফে। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার দিকে লক্ষ রেখে তাঁর বক্তব্য ছিল "বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ও প্রদেশের সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাও দেখতে হবে।"

স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুত থাকবার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের জন্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। তাঁর মতে "প্রথমে যে সমস্যাটি নিয়ে কাজ করতে হবে," সেটি "জনসংখ্যা বৃদ্ধি"। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ,মধ্যে সম্ভবত তিনিই প্রথম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ব্যক্ত করেছিলেন। "পুনর্গঠন"-এর প্রসঙ্গে "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা" হবে "দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা।" তার জন্যে দরকার হবে আমাদের "ভুমি ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার যার মধ্যে থাকবে জমিদারি প্রথার লোপ।" "কৃষকের ঋণগ্রস্ততার অবসান করতে হবে এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্যে সুলভ ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।" কিন্তু "অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে গেলে" শুধুমাত্র কৃষির উন্নতিই "যথেষ্ট নয়," রাষ্ট্র-পরিচালিত শিল্প বিকাশের জন্যে উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "আধুনিক কল-কারখানা এবং তার আনুষঙ্গিক যত কিছু মন্দ তা আমরা যতই অপছন্দ করি, আমরা চাইলেও আর প্রাক-শিল্প যুগে ফিরে যেতে পারব না।" স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রকে "পরিকল্পনা পর্ষদের পরামর্শ অনুযায়ী—উৎপাদন এবং অধিগ্রহণ, এই উভয় ক্ষেত্রে আমাদের কৃষি এবং শিল্প ব্যবস্থাকে ক্রমশ সমাজতন্ত্রীকরণ করবার জন্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ" করতে হবে।

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, কংগ্রেস জীর্ণ হতে হতে অবলুপ্ত হয়ে যাবে এমন

আশা করা যায় না। বরং তাকে স্বাধীনতার পর জাতীয় পুনর্গঠনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, "একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতির এবং কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক ভিত্তি ভবিষ্যতের ভারত রাষ্ট্রকে একচ্ছত্রবাদী হয়ে উঠতে দেবে না।" দলে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র থাকার ফলেও আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে, "ওপর থেকে দেশবাসীর ওপর নেতা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, নীচে থেকে তাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসবেন।" পরবর্তীকালে দেখা গেল, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সম্পর্কে কংগ্রেস দলের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের আশাবাদ মাত্রাতিরিক্ত ছিল। তিনি মনে করেছিলেন, কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলিকে কংগ্রেস সমষ্টিগতভাবে স্বীকৃতি দেবে, এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করবার জন্যে কংগ্রেস প্রস্তুত থাকবে, কিন্তু কংগ্রেসের ভিতরেই তাঁর অনেক সহকর্মী এ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন না।

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র হরিপুরা-কার্যতালিকার অধিকাংশ সম্পন্ন করবার চেষ্টা করেছিলেন, ভারতের আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের জন্যে একটি বিশদ পরিকল্পনা রচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তিনি বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলন আহ্বান করেন, এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান সংবাদ পরিষদের এক সভায় মেঘনাদ সাহার সঙ্গে এক আলোচনার সময়ে তিনি বিজ্ঞান ও রাজনীতির মধ্যে সুদূরপ্রসারী সহযোগিতার আহ্বান জানান।[৫] অবশেষে ১৯৩৮-এর অক্টোবরে সুভাষচন্দ্র ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেন। ১৯ অক্টোবর ১৯৩৮ তিনি জওহরলাল নেহরুকে লেখেন, "আমি আশা করি পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতিত্ব তুমি গ্রহণ করবে; তাকে যদি সফল হতে হয়, তোমাকে সভাপতি হতেই হবে।"[৬] কমিটির কাজের উদ্বোধন করার সময় ১৯৩৮-এর ১৭ ডিসেম্বর এক ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন, বৃহৎ শিল্পের জন্যে পরিকল্পনা রচনা করা এবং কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন, এই দুইয়ের মধ্যে পরস্পরের ওপর নির্ভরতার সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব।

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র যে-সব কর্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তার তালিকায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতিসাধন। তাঁর দীর্ঘকালের বিশ্বাস ছিল, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য শুধুমাত্র যে সাম্রাজ্যবিরোধী সংগ্রামের জন্যে প্রয়োজন তাই নয়, স্বাধীন ভারতেও বিভিন্ন ধর্মীয় ও ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের সভাপতি এম. এ. জিন্নার সঙ্গে তিনি ১৯৩৮-এর ১৪ মে দেখা করতে যান, নতুন করে হিন্দু মুসলিম প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন। তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু আগেই সে-পথে কিছু বাধার সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পরে তিনি ঘোষণা করেন, ভারতবর্ষে দুটি মাত্র পক্ষ, ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস। জিন্নাকে বলা হল, "নেহরু দূরবিন দিয়ে দেখেও" হিন্দু-মুসলিম সমস্যা দেখতে পাননি। এই খণ্ডে সন্নিবেশিত 'বোস-জিন্না পত্রালাপ' থেকে দেখা যায় কংগ্রেস ও লিগ-এর মধ্যে যে কোনও আলাপ-আলোচনায় ভারতের মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসাবে মুসলিম লিগকে স্বীকার করে নিতে হবে, তাঁর এ দাবিতে জিন্না অনড় ছিলেন। এই দাবির যে তাৎপর্য, অর্থাৎ লিগ কেবলমাত্র একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন, তা মেনে নেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে কোনও ক্রমেই সম্ভব ছিল না। সুভাষচন্দ্র ২৫ জুলাই ১৯৩৮ জিন্নাকে প্রশ্ন করলেন, "এ কি যথেষ্ট নয় যে, লিগের সঙ্গে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করতে

---

৫. এই বইয়ের ৩৩-৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৬. এই বইয়ের ১৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মতো বহু বিতর্কিত প্রশ্নে সম্মানজনক একটি মীমাংসায় উপনীত হতে কংগ্রেস কেবলমাত্র ইচ্ছুক নয়, আগ্রহীও বটে?"[৭] ২ আগস্ট ১৯৩৮ জিন্না উত্তরে বললেন, মীমাংসার জন্যে লিগ যখন সমান আগ্রহী তখন অবশ্যই প্রয়োজন "কীসের উপর ভিত্তি করিয়া এই দুইটি সংগঠনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতে পারে তৎসম্পর্কে কংগ্রেসকে জানানো"[৮] তার কারণ নেহরু লিগের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। ১৯৩৮-এর মতামত বিনিময় ব্যর্থ হল, কারণ কংগ্রেস ও লিগ আলোচনার ভিত্তি সম্পর্কে একমত হতে পারল না।

সুভাষচন্দ্রের মনে হল, ব্রিটিশদের সামনে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় দাবি পেশ করবার জন্যে দুটি শর্তের মধ্যে অন্তত একটি পূরণ করতেই হবে; সর্বভারতীয় স্তরে মুসলিম লিগের সঙ্গে একটি মীমাংসা কিংবা সমস্ত না হলেও অধিকাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে জোট সরকার, কংগ্রেস যাতে যোগদান করবে, কিংবা যাকে সমর্থন করবে। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে, আসামে গোপীনাথ বরদলৈ-এর নেতৃত্বে জোট মন্ত্রিসভা স্থাপন এবং সিন্ধুতে আল্লা বক্স মন্ত্রিসভাকে সমর্থন দান, সুভাষচন্দ্রের জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। তাঁদের নিজেদের প্রদেশ বঙ্গদেশে সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বোসের জোট-সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কংগ্রেস এবং গান্ধী ব্যর্থ করে দেন। তাঁদের পিছনে জি. ডি. বিড়লা এবং নলিনী রঞ্জন সরকারের সন্দেহজনক ভূমিকাও ছিল।[৯] ১৯৩৭-এ মন্ত্রিত্ব গ্রহণে নীতিগতভাবে সুভাষচন্দ্রের আপত্তি ছিল, কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন হল না, এবং সাতটি প্রদেশের মন্ত্রিসভা গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল, তাঁর মনে হল অবশিষ্ট প্রদেশগুলিতেও জোট মন্ত্রিত্ব স্বীকার করে নিলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ২১ ডিসেম্বর ১৯৩৮ তিনি গান্ধীকে লিখলেন,

> অবশিষ্ট তিনটি প্রদেশে জোট-মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে যখন আমরা চেষ্টা করব, কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের মধ্যে আলাপ আলোচনা হলে যে সব হিন্দু-মুসলিম সমস্যা উত্থাপিত হত, সেগুলির বিষয়েও আমাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে আমরা বিলম্ব করব না। একই সঙ্গে বিভিন্ন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিবিধ অভিযোগের বিষয়েও আমরা অনুসন্ধান করব। এই দুটি পদক্ষেপের ফলে যুক্তিবোধসম্পন্ন মুসলিমদের বোঝানো সহজ হবে যে আমরা তাদের অভাব-অভিযোগ বুঝতে এবং মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব তার প্রতিকার করতে আগ্রহী।

একটি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার পথে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ভাষা-গোষ্ঠীর গোষ্ঠীগত আনুগত্য যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল, সে-বিষয়ে কংগ্রেসের অন্য অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের থেকে সুভাষচন্দ্রের মতামতের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এবং অনেক বেশি উদার ছিল।

ইউরোপে নির্বাসনের সময়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের আগ্রহ জন্মায় এবং ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সে আগ্রহ অক্ষুণ্ণ ছিল। জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতির প্রতীক হিসাবে তিনি চিন দেশে কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশন পাঠিয়েছিলেন, এবং ইউরোপের ঘটনাবলীর ওপরেও নজর রেখেছিলেন। বৎসরের শেষ নাগাদ—তাঁর মনে হল, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের পক্ষে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এখন অনুকূল।

---

৭. এই বইয়ের ৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৮. এই বইয়ের ৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৯. এই বইয়ের ৯০-৯২ পৃষ্ঠায় মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য।

সুভাষচন্দ্রের যে রাজনৈতিক কর্মসূচি, অর্থাৎ উপনিবেশবাদ-বিরোধী আপোসহীন সংগ্রাম এবং স্বাধীন ভারতের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, এই দুইই তাঁকে গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যের বিরোধিতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে তাঁরা কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তাঁর পুনর্নির্বাচনের প্রবল বিরোধিতা করলেন। মৌলানা আজাদের নির্বাচনে দাঁড়ানর অনিচ্ছার কারণে, ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, গান্ধীর সঙ্গে পরামর্শ করে হাই কমান্ডের আরেকজন সদস্য পট্টভি সীতারামাইয়াকে মনোনয়ন দিয়ে দাঁড় করালেন। সুভাষচন্দ্র জোর দিয়ে বললেন একজন বামপন্থীকে কংগ্রেস সভাপতি হতে হবে। যেহেতু সকলে একমত হয়ে যাঁকে নির্বাচিত করতে পারেন এমন আর কেউ ছিলেন না, তাই তিনি নিজেই দাঁড়াবেন ঠিক করলেন। বঙ্গদেশে জোট সরকারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে এবং ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অনুসারী আমূল পরিবর্তনকামী, এবং গান্ধীর প্রতি যাঁরা আনুগত্য প্রদর্শন করেন সেই দক্ষিণপন্থীদের মতবিরোধ ছিল। বিড়লা জোট সরকার গঠনের বিরোধিতা করেছিলেন। অন্তত একটি এমন অভিযোগ গান্ধীর কাছে করা হয়েছিল যে, সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জার্মানির সাহায্যলাভের চেষ্টা করেছিলেন। কে. এম. মুন্সি সে-অভিযোগ নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে দেখা যায় কয়েকজন জার্মান ব্যবসায়ীর সঙ্গে তিনি এক সাক্ষাৎকারে জার্মানির বিভিন্ন নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সেই সাক্ষাৎকেই বিকৃত করে 'ষড়যন্ত্রমূলক' বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে দু'সপ্তাহ ধরে সভাপতি নির্বাচন নিয়ে জোরদার বিতর্ক চলল সংবাদপত্রে বিবৃতি ও প্রতি-বিবৃতির মাধ্যমে। তাতে প্রধান দুটি বিষয় ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে মনোভাব, এবং কংগ্রেসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র।[১০]

১৯৩৮-এর ৯ জুলাই সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে লোকচক্ষুর আড়ালে কোনও বোঝাপড়া করা হলে "সেটা হবে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা।" নির্বাচনী বিতর্কের সময়ে তিনি যখন যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মধ্যে বোঝাপড়ার একটা সম্ভাবনা আছে, অনেকের এরকম একটা বিশ্বাসের কথা বলেছিলেন, তখন তাঁর নামে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, তিনি তাঁর সহকর্মীদের মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন। মহাফেজখানা থেকে প্রাপ্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে এখন কারও জানতে বাকি নেই যে, সুভাষচন্দ্র খুব ভুল বলেননি, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫-এর যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ক অংশের বিষয়ে সর্বোচ্চ ব্রিটিশ অফিসারদের সঙ্গে প্যাটেলের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন কংগ্রেস নেতার কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যেহেতু তেমন কোনও জোরালো প্রমাণ দিতে পারেননি, তাই 'অপবাদ'-এর অভিযোগটি নির্বাচনের পরে জিইয়ে রাখা হয়েছিল। দলের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের মত ছিল, "ওয়ার্কিং কমিটির একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর দ্বারা মনোনয়নের বদলে প্রতিনিধিদের দ্বারা যথার্থ নির্বাচন যদি করতে হয়, তাঁদের স্বাধীনভাবে নির্বাচনের ক্ষমতা থাকতেই হবে। এই স্বাধীনতা যদি প্রতিনিধিদের না দেওয়া হয়, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র তার গণতান্ত্রিক চরিত্র হারাবে।"

২৯ জানুয়ারি ১৯৩৯ প্রতিনিধিদের গণতান্ত্রিক রায় গেল সুভাষচন্দ্রের পক্ষে, দু'শোর বেশি ভোটের ব্যবধানে। ৩১ জানুয়ারি ১৯৩৯ মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করলেন, যেহেতু,

> "মৌলানা সাহেবের নাম প্রত্যাহারের পর ড. পট্টভি নাম প্রত্যাহার না করতে সম্মত হয়েছিলেন আমারই জন্য। এ-পরাজয় যতটা তাঁর তার চেয়ে বেশি আমার। আমি যদি

---

১০. এই বইয়ের ৫৬-৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সঠিক নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন করতে না পারি তবে আমার কোনও গুরুত্ব থাকে না। অতএব, স্পষ্ট দেখা গেল, আমার যে-সব মূলনীতি ও কর্মপন্থা, ডেলিগেটরা তার অনুমোদন করেন না। এই পরাজয়ে আমি আনন্দিত। আর যাই হোক, সুভাষবাবু তো দেশের শত্রু নন। দেশের জন্য তিনি দুঃখভোগ করেছেন।"

১৯৩৯-এর ৪ ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র এক খোলা বিবৃতিতে এর উত্তর দিলেন:

"কখনও কখনও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ভিন্নমত ব্যক্ত করতে আমি বাধ্য হয়েছি, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কারও চেয়ে কম নয়। সর্বদাই তাঁর আস্থা অর্জন করা আমার লক্ষ্য হবে। তার কারণ আর কিছুই নয়, আমি অন্যদের আস্থা পেলাম, আর ভারতের শ্রেষ্ঠ মানুষটির আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হলাম, এ অতি বেদনাদায়ক হবে।"

মনে হয়, সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিতর্ক পিছনে ফেলে রেখে গান্ধীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছন সম্ভব হবে। গান্ধীকে তিনি গান্ধীর সহকারীদের থেকে আলাদা করে দেখতেন। গান্ধীর মনোভাব সম্পর্কে এম. এন. রায়ের ধারণা আরও সঠিক ছিল। গান্ধীর বিবৃতি তিনি এই ভাবে ব্যাখ্যা করলেন—

আমার দৃষ্টিতে ওটি একটি যুদ্ধ ঘোষণা এবং যুদ্ধ চলবে প্রকৃত গান্ধীবাদী পথে, অর্থাৎ অসহযোগিতা দ্বারা। এখন কংগ্রেসে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক, তাতে অসহযোগিতার একটাই অর্থ হতে পারে, তোমাকে এবং তোমার সমর্থকদের হেয় করবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিসাধন। গান্ধীজির বিবৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের স্থানে তোমার এবং তোমার নির্বাচনের যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন, এই উভয়পক্ষেরই একসঙ্গে থাকা সম্ভব হবে না, এক পক্ষকে সরে যেতেই হবে। এই যে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত, তার যুক্তিসম্মত উপসংহার এই: গান্ধীজির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের ঐক্যের বেদীতে তোমাকে আত্মবলিদান দিতে হবে।[১১]

কংগ্রেসের সংকট ঘনীভূত হল, যখন ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগে সুভাষচন্দ্র গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন, এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ জওহরলাল নেহরু ও শরৎচন্দ্র বসু ব্যতীত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্য পদত্যাগ করলেন। ১৯৩৯-এর মার্চ মাসের প্রথম দিকে ত্রিপুরি কংগ্রেসে অসুস্থতার কারণে সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজের সভাপতির ভাষণ প্রদান করতে পারলেন না, তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু সেটি পাঠ করলেন। একটি অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণে (যা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক)[১২] সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসকে একটি চরমপত্রের আকারে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে জাতীয় দাবি পেশ করতে বললেন এবং সন্তোষজনক উত্তর না পেলে গণ আইনঅমান্য আন্দোলন আরম্ভ করতে বললেন। তিনি আরও বললেন, বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস যেন গণ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়, "সামগ্রিক ভাবে, নিয়মিত, এখানে-ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে নয়।" তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, "দেশের সমস্ত সাম্রাজ্য-বিরোধী সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন, বিশেষ করে কিষাণ আন্দোলন এবং শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে।"

---

১১. এম এন. রায়ের পত্র, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, এই বইয়ের ২০৮-২০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১২. এই বইয়ের ৬৫-৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ত্রিপুরি কংগ্রেসে দক্ষিণ-পন্থীরা সভাপতি নির্বাচনে তাঁদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হলেন একটি আঘাত হেনে। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ভোট দানে বিরত থাকায় গোবিন্দবল্লভ পন্থের উত্থাপিত একটি প্রস্তাব তাঁরা পাশ করিয়ে নিতে পারলেন এই মর্মে: "কংগ্রেস কার্যনির্বাহীর উচিত গান্ধীজির আস্থাভাজন হওয়া, এবং সভাপতিকে অনুরোধ তিনি গান্ধীজির ইচ্ছা অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করুন।"

সত্য ও অহিংসার পূজারিদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ত্রিপুরির আবহাওয়া এমন ভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে, "রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে" সুভাষচন্দ্র সে স্থান পরিত্যাগ করেন।

গান্ধী সেই সময়ে ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য রাজকোট-এর রাজনীতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকার কারণে ত্রিপুরিতে উপস্থিত থাকতে পারেননি। নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ—প্রথমত চিঠিপত্রের মাধ্যমে করতে হয়েছিল।[১৩] সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন একটি "মিশ্র" ক্যাবিনেট গঠন করতে যাতে জাতীয় রাজনীতির সবধারার প্রতিনিধিরাই থাকবেন, কিন্তু গান্ধী চেয়েছিলেন যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁদের নিয়েই গঠিত হোক একটি সমধর্মী ক্যাবিনেট। অসহযোগের এক 'ক্ল্যাসিক' উদাহরণ স্থাপন করে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদের জন্যে কোনও নাম প্রস্তাব করতে অস্বীকার করলেন, এবং সুভাষচন্দ্রকে তাঁর নিজের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করতে বললেন। সুভাষচন্দ্র তখন তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন যে, গান্ধী তা চাইতে পরেন, কিন্তু তাতে পন্থ-প্রস্তাবের দাবি অনুযায়ী এমন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে না, যার ওপরে গান্ধীর "পূর্ণ আস্থা" থাকবে।

গান্ধী উত্তরে বললেন, "পন্থের প্রস্তাব আমি যত খুঁটিয়ে দেখছি, ততই আমার সে প্রস্তাব অপছন্দ হচ্ছে।" যদিও সুভাষচন্দ্রের নিজের ইচ্ছা ছিল কংগ্রেসের দুটি পক্ষ থেকে ছ-জন করে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা, সংকট নিরসনের জন্যে তিনি গান্ধীকে ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ভাবলেন, গান্ধী যদি তাতে অসম্মত হন, তা হলে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচিত করতে পারেন কি না। মহাত্মা গান্ধীর কর্তৃত্বকেই যখন চ্যালেঞ্জ জানান হয়েছে, এবং তাতে সাফল্যও লাভ করা গেছে, তখন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অধিকতর গণতন্ত্র দাবি করলে তিনি যে খুব প্রসন্ন হবেন না, তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। ১৯৩৯-এর এপ্রিল মাসে কয়েকবার আলাপ-আলোচনা চলল, কিন্তু তাতে অচল অবস্থার অবসান হল না। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে ব্যর্থ হয়ে কলকাতায় ২৯ এপ্রিল ১৯৩৯-এর এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশনে, "সম্পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে" সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন।

জওহরলাল নেহরু তখন শরৎ বসুর বাড়িতে ছিলেন। তিনি এ. আই. সি. সি.-তে একটি প্রস্তাব আনলেন, যেন সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ স্বীকার করা না হয়, এবং সুভাষচন্দ্রকে অনুরোধ করা হয়, পুরনো ওয়ার্কিং কমিটিকেই আবার মনোনীত করতে এবং শূন্যপদ পূরণ করবার জন্যে নতুন দু'জন সদস্যকে মনোনীত করতে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র একটি অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক ওয়ার্কিং কমিটি দাবি করলেন। তখন নেহরু তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন, এবং সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ কার্যকর হল। সংকটের সময়ে আগাগোড়া নেহরু মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করে যান। প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সদস্যদের থেকে অন্তত একটু দূরত্ব তিনি বজায় রেখেই চলেন। দু'জনের মধ্যে যে দীর্ঘ পত্র বিনিময় হয়েছিল[১৪], তা থেকে কিন্তু দেখা যায়, নেহরুর শেষপর্যন্ত দু' নৌকোয় পা দিয়ে চলবার চেষ্টাকে সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রতি নেহরুর

---

১৩. এই বইয়ের ৯৩-১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৪. এই বইয়ের ১৪৩-১৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিশ্বাসঘাতকতা বলেই মনে করেছিলেন। নেহরুকে তিনি "বড় ভাইয়ের" মতো দেখতেন, মনে করতেন, নেহরু তাঁর প্রতিপক্ষের আক্রমণের ধার কমিয়ে আনবেন। নেহরুকে তিনি লিখলেন, "আমরা যে ঐক্যের জন্যে চেষ্টা করছি, যে ঐক্য বজায় রাখতে চেষ্টা করছি, সে ঐক্য হওয়া উচিত কাজ করার, হাত গুটিয়ে বসে থাকার ঐক্য নয়।" সুভাষচন্দ্র হয়তো এই সংকটকালে নেহরুর অব্যবস্থচিত্ততা সম্পর্কে একটু বেশি কঠোর মনোভাব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক বছর পরে টায়া জিনকিন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নেহরু স্বীকার করেন, ১৯৩৯ সালে তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একমত ছিলেন, কিন্তু তাঁর "বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করেননি"।

ত্রিপুরি এবং তার পরের ঘটনাবলীকে সুভাষচন্দ্রের পরাজয়ই বলা যায়। নিজের স্বভাবে এবং সংগঠনের দিক থেকেও, তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও, তাঁর ক্ষমতা ছিল না, রাজনৈতিক চাতুর্যে গান্ধী এবং তাঁর অনুসারীদের সমকক্ষ হওয়া। তবে এই সময়কার ঘটনাবলীর পরেও গান্ধীর ভাবমূর্তির ঔজ্জ্বল্য অক্ষুণ্ণই থাকল। হীরেন মুখার্জি বলেছেন, ভারতের মহত্তম ব্যক্তি এমন আচরণ করলেন, যাতে মনে হল তিনি "ছোট" হয়ে গেলেন, মনে হল, তিনি "বদমেজাজি"। পাশাপাশি সুভাষচন্দ্রের আচরণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের প্রশংসা অর্জন করেছিল। তিনি একটি বার্তা পাঠালেন এই বলে:[১৪ক]

> অসম্ভব উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে থেকেও তুমি আত্মমর্যাদা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছ। তোমার নেতৃত্বকে আমি অভিনন্দন জানাই, তাতে আমার আস্থা বাড়ল। ত্রুটিহীন এই শালীনতা বাংলাকে তার নিজস্ব আত্মসম্মানের জন্যেই বজায় রাখতে হবে এবং এই উপায়েই তোমার আপাত পরাজয় থেকে স্থায়ী জয়ের সূচনা দেখা দেবে।

সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতির পদটিও মহাত্মা গান্ধী কেড়ে নিলেন, কিন্তু তিনি খবর পাননি যে রবীন্দ্রনাথ তাকে "দেশনায়ক" উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন সুভাষ বসু আবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন, এবং ২১ জানুয়ারি ১৯৩৯ তিনি সুভাষচন্দ্রকে শান্তিনিকেতনে সংবর্ধনা দিলেন। ফেব্রুয়ারির প্রথমে এক কলকাতায় জন-সংবর্ধনায় তিনি সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রদানের জন্যে "দেশনায়ক" বক্তৃতা লিখেছিলেন। কিন্তু সে সংবর্ধনা মুলতুবি করতে হল। "বাংলার কবি" হিসাবে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

> বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।... এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে, বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই, অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসন স্থাপন করতে চাই— রাষ্ট্রধর্মে যিনি পৃথিবীতে নূতন যুগের উদ্বোধন করেছেন, ভারতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্যে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলন-যজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। তোমার সাধনায় বাংলাদেশের সেই

১৪ক. এই বইয়ের ৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আত্মাহুতি ষোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজস্বী হোক— তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।... বহুকাল পূর্বে একদিন আর-এক সভায় আমি বাঙালীসমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলাম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর-এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব— আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তার পরে আশীর্বাদ ক'রে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন ক'রে।

গুরুদেবের আশীর্বাদ ছাড়াও, সুভাষচন্দ্র "বহু সংখ্যক সাধারণ মানুষের আন্তরিক সহানুভূতি ও ভালবাসা" পেয়েছিলেন। "My Strange Illness"[১৫] শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, ওষুধপত্র, ফুল এবং তাবিজ-কবচ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন:

১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে আমি যেসব চিঠি, টেলিগ্রাম ইত্যাদি পেয়েছি, তা পড়বার আনন্দ ছাড়াও, সেগুলি একসঙ্গে জড়ো করলে রীতিমতো একটা বই হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিদিন তা আসছে—শুধু চিঠি বা টেলিগ্রাম নয়, নানা ধরনের ওষুধপত্র মাদুলি কবচ ভর্তি পার্সেল ও প্যাকেটও তাতে আছে। ধর্মমত অনুযায়ী লেখক ও প্রেরকদের আমি ভাগ করতে চেষ্টা করছিলাম, দেখলাম তাঁদের মধ্যে সব ধর্মমতই আছে। কেবলমাত্র সব ধর্মমতই নয়, সবরকমের চিকিৎসা শাস্ত্র (সব 'প্যাথি', কথাটা যদি ব্যবহার করতে পারা যায়) এবং নারীও আছে পুরুষও আছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পার্সি ইত্যাদি— অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, বৈদ্য, হাকিম, প্রাকৃতিক চিকিৎসক, গণৎকার ইত্যাদি— নারী পুরুষ— সকলে আমাকে লিখে চলেছেন, আমাকে উপদেশ দিয়ে এবং কখনও কখনও ওষুধের নমুনা ও কবচ সঙ্গে পাঠিয়ে।

ভালবাসা, ও তাঁকে নিয়ে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার এই জোয়ারই "ত্রিপুরির অরুচিকর আবহাওয়ার" পর আবার সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস তাঁকে ফিরিয়ে ছিল। তিনি বুঝতে পারলেন, "এই হল সেই ভারতবর্ষ, যার জন্যে আমরা দুঃখভোগ করি, পরিশ্রম করি। এই সেই ভারতবর্ষ যার জন্যে প্রাণ-পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া যায়। এই হল প্রকৃত ভারতবর্ষ, যার ওপরে অবিনশ্বর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, ত্রিপুরি যাই বলুক, যাই করুক।"

শিশিরকুমার বসু
সুগত বসু

---

১৫. এই বইয়ের ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থ সম্পাদনায় উপযুক্ত পরামর্শদানের জন্য অধ্যাপক কৃষ্ণা বসু এবং অধ্যাপক লিওনার্দ এ. গর্ডনকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। শ্রীকার্ত্তিক চক্রবর্তী, যিনি আমাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতি কর্মে সাহায্য করেছেন এবং শ্রীনগ সুন্দরম—যিনি নথিপত্র বিষয়ে সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাই। সুদক্ষ প্রকাশনার জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

শিশির কুমার বসু
সুগত বসু

সূচি

বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং বিবৃতি: জানুয়ারি ১৯৩৮ — এপ্রিল ১৯৩৯

১.	বিষয় কংগ্রেস এবং সংবিধান, ফ্যাসিজম ও কমিউনিজম: ২৪ জানুয়ারি ১৯৩৮, লন্ডনের 'ডেইলি ওয়ার্কার'-এ প্রকাশিত আর. পাম দত্ত-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদন	৩
২.	হরিপুরা অভিভাষণ: ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হরিপুরায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ	৪
৩.	পৌর সমাজতন্ত্র: বোম্বাই করপোরেশনে প্রদত্ত ভাষণ, ১০ মে ১৯৩৮	২৪
৪.	চিনে কংগ্রেসের চিকিৎসা মিশন প্রেরণ: সুভাষচন্দ্রের প্রকাশ্য বিবৃতি ও আবেদন, ২৮ জুন ১৯৩৮	২৭
৫.	যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রসঙ্গে	৩০
৬.	বিজ্ঞান এবং রাজনীতি: মেঘনাদ সাহা কর্তৃক উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর, ২১ আগস্ট ১৯৩৮	৩৩
৭.	সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের ভাল দিক ও মন্দ দিক	৩৬
৮.	ভারতের শিল্প-সমস্যা: ২ অক্টোবর ১৯৩৮, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত শিল্পমন্ত্রীগণের এক অধিবেশনে প্রদত্ত সম্পূর্ণ ভাষণ	৪৩
৯.	ছাত্র আন্দোলন: ২৯ অক্টোবর ১৯৩৮, এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত উত্তরপ্রদেশ ছাত্র অধিবেশনে প্রদত্ত বাণী	৪৭
১০.	আমাদের প্রয়োজন এবং আমাদের কর্তব্য: ন্যাশনাল ফ্রন্ট পত্রিকায় ১৯৩৮ সালের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ	৪৮
১১.	ইউরোপীয় সংকট— বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণ: ১৯৩৮ অক্টোবর সংখ্যায় দি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পত্রে প্রকাশিত স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ	৫০
১২.	কামাল আতাতুর্ক প্রসঙ্গে: ১৯৩৮-এর নভেম্বরে তুরস্কের নেতার মৃত্যুতে শ্রদ্ধার্ঘ	৫২
১৩.	জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি: ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৮, বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সারা ভারত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির প্রথম সভার প্রদত্ত উদ্বোধনী বক্তৃতা	৫৩
১৪.	সুনির্দিষ্ট ন্যূনতম কার্যক্রম: ১৭ জানুয়ারি ১৯৩৯, বোম্বাই থেকে প্রচারিত বিবৃতি	৫৫

১৫. ত্রিপুরির সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত বিতর্ক: বিবৃতি এবং প্রতি-বিবৃতি, ২১ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ ৫৬
১৬. ত্রিপুরি ভাষণ: মার্চ ১৯৩৯-এ ত্রিপুরিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ ৬৫
১৭. আমার অদ্ভুত অসুখ: ১৯৩৯-এর এপ্রিলে মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ ৬৮
১৮. কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগের বিবৃতি: ১৯৩৯-এর মে মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিংয়ে ৭৭

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পত্রাবলি

বসু-জিন্না পত্রালাপ (মে-ডিসেম্বর ১৯৩৮)

১. জিন্নাকে ১৪ মে ১৯৩৮ ৮১
২. জিন্নাকে ১৫ মে ১৯৩৮ ৮২
৩. জিন্নার পত্র ১৬ মে ১৯৩৮ ৮২
৪. জিন্নার পত্র ৬ জুন ১৯৩৮ ৮৩
৫. জিন্নাকে (তারবার্তা) ২১ জুন ১৯৩৮ ৮৪
৬. জিন্নাকে ২৭ জুন ১৯৩৮ ৮৪
৭. জিন্নাকে ২৫ জুলাই ১৯৩৮ ৮৪
৮. জিন্নার পত্র ২ আগস্ট ১৯৩৮ ৮৬
৯. জিন্নাকে ১৬ আগস্ট ১৯৩৮ ৮৮
১০. জিন্নাকে ২ অক্টোবর ১৯৩৮ ৮৮
১১. জিন্নার পত্র ৯ অক্টোবর ১৯৩৮ ৮৯
১২. জিন্নাকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৮ ৮৯

বসু-গান্ধী পত্রালাপ (ডিসেম্বর ১৯৩৮ — মে ১৯৩৯)

১৩. মহাত্মা গান্ধীকে, ২১ ডিসেম্বর ১৯৩৮ ৯০
১৪. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ২৪ মার্চ ১৯৩৯ ৯৩
১৫. বসুকে (তারবার্তা), ২৫ মার্চ ১৯৩৯ ৯৩
১৬. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ২৫ মার্চ ১৯৩৯ ৯৩
১৭. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ২৫ মার্চ ১৯৩৯ ৯৩
১৮. মহাত্মা গান্ধীকে, ২৫ মার্চ ১৯৩৯ ৯৪
১৯. মহাত্মা গান্ধীর পত্র, ২৪ মার্চ ১৯৩৯ ৯৬
২০. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ২৬ মার্চ ১৯৩৯ ৯৬
২১. বসুকে (তারবার্তা), ২৬ মার্চ ১৯৩৯ ৯৭
২২. মহাত্মা গান্ধীকে, ২৯ মার্চ ১৯৩৯ ৯৭
২৩. মহাত্মা গান্ধীকে, ২৯ মার্চ ১৯৩৯ ৯৮
২৪. মহাত্মা গান্ধীর পত্র, ৩০ মার্চ ১৯৩৯ ৯৯

২৫. বসুকে (তারবার্তা), ৩১ মার্চ ১৯৩৯ ১০০
২৬. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ৩১ মার্চ ১৯৩৯ ১০০
২৭. বসুকে (তারবার্তা), ১ এপ্রিল ১৯৩৯ ১০১
২৮. মহাত্মা গান্ধীকে, ৩১ মার্চ ১৯৩৯ ১০১
২৯. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ১ এপ্রিল ১৯৩৯ ১০৬
৩০. মহাত্মা গান্ধীর পত্র, ২ এপ্রিল ১৯৩৯ ১০৬
৩১. বসুকে (তারবার্তা), ২ এপ্রিল ১৯৩৯ ১০৮
৩২. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ৩ এপ্রিল ১৯৩৯ ১০৮
৩৩. বসুকে (তারবার্তা), ৪ এপ্রিল ১৯৩৯ ১০৯
৩৪. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ৫ এপ্রিল ১৯৩৯ ১০৯
৩৫. বসুকে (তারবার্তা), ৫ এপ্রিল ১৯৩৯ ১০৯
৩৬. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ৫ এপ্রিল ১৯৩৯ ১০৯
৩৭. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ৫ এপ্রিল ১৯৩৯ ১১০
৩৮. বসুকে (তারবার্তা), ৫ এপ্রিল ১৯৩৯ ১১০
৩৯. মহাত্মা গান্ধীকে, ৬ এপ্রিল ১৯৩৯ ১১০
৪০. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ৭ এপ্রিল ১৯৩৯ ১১৫
৪১. বসুকে (তারবার্তা), ৭ এপ্রিল ১৯৩৯ ১১৫
৪২. বসুকে (তারবার্তা), ৭ এপ্রিল ১৯৩৯ ১১৬
৪৩. মহাত্মা গান্ধীকে, ১০ এপ্রিল ১৯৩৯ ১১৬
৪৪. মহাত্মা গান্ধীর পত্র, ১০ এপ্রিল ১৯৩৯ ১২১
৪৫. মহাত্মা গান্ধীকে, ১৩ এপ্রিল ১৯৩৯ ১২২
৪৬. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ১৪ এপ্রিল ১৯৩৯ ১২৭
৪৭. বসুকে (তারবার্তা), ১৪ এপ্রিল ১৯৩৯ ১২৭
৪৮. বসুকে (তারবার্তা), ১৪ এপ্রিল ১৯৩৯ ১২৭
৪৯. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ১৫ এপ্রিল ১৯৩৯ ১২৮
৫০. মহাত্মা গান্ধীকে, ১৫ এপ্রিল ১৯৩৯ ১২৮
৫১. বসুকে (তারবার্তা), ১৭ এপ্রিল ১৯৩৯ ১৩০
৫২. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ১৮ এপ্রিল ১৯৩৯ ১৩০
৫৩. বসুকে (তারবার্তা), ১৮ এপ্রিল ১৯৩৯ ১৩০
৫৪. বসুকে (তারবার্তা), ১৯ এপ্রিল ১৯৩৯ ১৩১
৫৫. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ২০ এপ্রিল ১৯৩৯ ১৩১
৫৬. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ২০ এপ্রিল ১৯৩৯ ১৩২
৫৭. মহাত্মা গান্ধীকে, ২০ এপ্রিল ১৯৩৯ ১৩২
৫৮. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ২২ এপ্রিল ১৯৩৯ ১৩৪
৫৯. মহাত্মা গান্ধীর পত্র, ২৯ এপ্রিল ১৯৩৯ ১৩৪
৬০. মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা), ৫ মে ১৯৩৯ ১৩৫
৬১. বসুকে (তারবার্তা), ৬ মে ১৯৩৯ ১৩৫

বসু-নেহরু পত্রালাপ (এপ্রিল ১৯৩৮ — এপ্রিল ১৯৩৯)

৬২. জওহরলাল নেহরুর পত্র, ২৩ এপ্রিল ১৯৩৮ ১৩৫
৬৩. জওহরলাল নেহরুর প্রতি, ১৯ অক্টোবর ১৯৩৮ ১৩৬
৬৪. জওহরলাল নেহরুর পত্র, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ ১৩৭
৬৫. জওহরলাল নেহরুর প্রতি, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ ১৪১
৬৬. জওহরলাল নেহরুর পত্র, ১ মার্চ ১৯৩৯ ১৪১
৬৭. জওহরলাল নেহরুর পত্র, ১৬ মার্চ ১৯৩৯ ১৪২
৬৮. জওহরলাল নেহরুর পত্র, ২২ মার্চ ১৯৩৯ ১৪৩
৬৯. জওহরলাল নেহরুর প্রতি, ২৮ মার্চ ১৯৩৯ ১৪৩
৭০. জওহরলাল নেহরুর পত্র, ৩ এপ্রিল ১৯৩৯ ১৬০
৭১. জওহরলাল নেহরুর প্রতি, ১৫ এপ্রিল ১৯৩৯ ১৭২
৭২. জওহরলাল নেহরুর পত্র, ১৭ এপ্রিল ১৯৩৯ ১৭৩
৭৩. জওহরলাল নেহরুর প্রতি, ২০ এপ্রিল ১৯৩৯ ১৭৪

বসু-ঠাকুর পত্রালাপ (নভেম্বর ১৯৩৮ — মে ১৯৩৯)

৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, ২০ নভেম্বর ১৯৩৮ ১৭৫
৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৮ ১৭৫
৭৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, ২০ ডিসেম্বর ১৯৩৮ ১৭৬
৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৯ ১৭৬
৭৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, ১৯ জানুয়ারি ১৯৩৯ ১৭৬
৭৯. সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশে ভাষণ, ২১ জানুয়ারি ১৯৩৯ ১৭৭
৮০. বসু কর্তৃক প্রতিভাষণ, ২১ জানুয়ারি ১৯৩৯ ১৭৯
৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, ২৭ জানুয়ারি ১৯৩৯ ১৮২
৮২. সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ, জানুয়ারি ১৯৩৯ ১৮২
৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, ২ এপ্রিল ১৯৩৯ ১৮৫
৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, ২৭ মে ১৯৩৯ ১৮৬

অন্যান্য পত্রাবলি

৮৫. ই. উডসকে, ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ ১৮৬
৮৬. মিসেস ভেটারকে, ২১ জানুয়ারি ১৯৩৮ ১৮৭
৮৭. রাসবিহারী বোসের পত্র, ২৫ জানুয়ারি ১৯৩৮ ১৮৭
৮৮. বাসন্তীদেবীকে, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ ১৯০
৮৯. এইচ. ভি. কামাথকে, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ ১৯০
৯০. উইল রিখটারের পত্র, ৪ মার্চ ১৯৩৮ ১৯১
৯১. শ্রীমতী ধর্মবীরকে, ২২ মার্চ ১৯৩৮ ১৯২
৯২. সীতা ধর্মবীরকে, ২২ মার্চ ১৯৩৮ ১৯৩
৯৩. মিসেস নাওমি ভেটারকে, ২৬ মার্চ ১৯৩৮ ১৯৪

৯৪. মিসেস নাওমি ভেটারকে, ৯ এপ্রিল ১৯৩৮ ১৯৫
৯৫. সন্তোষ সেনকে (তারবার্তা), ২০ মে ১৯৩৮ ১৯৬
৯৬. সীতা ধর্মবীরকে, ২১ মে ১৯৩৮ ১৯৬
৯৭. অতুলচন্দ্র কুমারকে, ৩ জুন ১৯৩৮ ১৯৭
৯৮. সীতা ধর্মবীরকে, ২৩ জুন ১৯৩৮ ১৯৭
৯৯. বি. সি. রায়ের পত্র, ১৮ জুলাই ১৯৩৮ ১৯৮
১০০. বিশ্বনাথ দাসকে, ১৫ আগস্ট ১৯৩৮ ১৯৮
১০১. অপর্ণা দেবীর পত্র, ২৩ আগস্ট ১৯৩৮ ১৯৯
১০২. বি. সি. রায়কে, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ ১৯৯
১০৩. অমিতা পুরকায়স্থ (গুহ)-কে, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ ২০০
১০৪. বি. সি. রায়ের পত্র, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ ২০২
১০৫. সীতা সেনের প্রতি, ১০ অক্টোবর ১৯৩৮ ২০২
১০৬. (অস্পষ্ট)-র প্রতি, ২১ অক্টোবর ১৯৩৮ ২০৩
১০৭. এম. এন. রায়ের পত্র, ২২ অক্টোবর ১৯৩৮ ২০৪
১০৮. "দৈনিক দূরবীন"-এর প্রতি বার্তা, ২৩ অক্টোবর ১৯৩৮ ২০৭
১০৯. অমলা নন্দী (শঙ্কর)-কে, ১১ নভেম্বর ১৯৩৮ ২০৮
১১০. এম. এন. রায়ের পত্র, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ ২০৮
১১১. মুস্তাফা এল নাহাস পাশা-র প্রতি (তারবার্তা), ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ ২১১
১১২. এ. আই. সি. সি.-র অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের প্রতি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ ২১২
১১৩. এম. এন. রায়ের পত্র, ৫ মার্চ ১৯৩৯ ২১৩
১১৪. জেকব গুণনিধি বিশ্বাসকে, ১৪ এপ্রিল ১৯৩৯ ২১৪
১১৫. অমিয়নাথ বসুকে, ১৭ এপ্রিল ১৯৩৯ ২১৫
১১৬. এম. এন. রায়ের পত্র, ১৮ এপ্রিল ১৯৩৯ ২১৭
১১৭. এ. আই. সি. সি.-র অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের প্রতি, ১৮ এপ্রিল ১৯৩৯ ২১৮
১১৮. সীতা সেনকে, ১৯ এপ্রিল ১৯৩৯ ২১৮

নির্ঘণ্ট ২২১

বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং বিবৃতি
জানুয়ারি ১৯৩৮—এপ্রিল ১৯৩৯

বিষয় কংগ্রেস এবং সংবিধান, ফ্যাসিজম ও কমিউনিজম

২৪ জানুয়ারি ১৯৩৮, লন্ডনের 'ডেইলি ওয়ার্কার'-এ প্রকাশিত আর. পাম দত্ত-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদন।

প্রশ্ন: এখানে জাতীয় সরকারের প্রবক্তারা বলছেন যে ভারতে নতুন শাসনতন্ত্র বড় রকম সাফল্য বলে গণ্য হয়েছে, এবং এর প্রমাণ কংগ্রেসের সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ। এই বক্তব্য সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের অভিমত কী?

উত্তর: সরকার গঠনের দায়িত্বগ্রহণ থেকে প্রমাণ হয় না যে, কংগ্রেস সব সময়ে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কাজ করে চলবে। যথেষ্ট সংশয় নিয়েই কংগ্রেস সরকারি দায়িত্ব নিয়েছে।

কংগ্রেসের দিক থেকে তা নেওয়ার উদ্দেশ্য দু'রকম: প্রথমত, তার নিজস্ব অবস্থাকে সুসংহত করা; এবং দ্বিতীয়ত, বর্তমান শাসনতন্ত্রের বিধিনিয়মের মধ্যে থেকে যে সত্যিই বড় কিছু পাওয়া সম্ভবও নয় তা প্রতিপন্ন করা। যদি তা মিথ্যা প্রমাণ করে লাভজনক কিছু পাওয়া সম্ভবও হয়, তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামে তা জনসাধারণের সংগঠনকে শক্তিশালী করবে।

প্রশ্ন: শাসনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশকে কংগ্রেসের পক্ষে গ্রহণ করার কোনও সম্ভাবনা আছে কি?

উত্তর: কংগ্রেস যেমন প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে সেইরকম যে শাসনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশকেও মেনে নিয়ে কাজ করবে এবং এ বিষয়ে তার মনোভাব বদলাবে তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক অংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নেই।

প্রশ্ন: আপনার মতে জাতীয় সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায় কী? কৃষক অসন্তোষ ও শ্রমিক ধর্মঘটের আন্দোলন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ কথা কি সত্য?

উত্তর: জাতীয় সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায় হবে আরও দ্রুতগতিতে গণচেতনার বিকাশ। কংগ্রেসের পক্ষে সমস্যা হবে এই শক্তিকে সংহত করে ঠিক পথে চালিত করা।

অন্যভাবে বলতে গেলে সমস্যা দাঁড়াবে পার্টি সংগঠনকে ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের হিসেবে গড়ে তোলা। যদি আমরা তা পারি আমরা বুকে বল ও মনে আশা নিয়ে ভবিষ্যতে যে কোনও সংকটই আসুক না কেন সবার সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারব। কংগ্রেস পার্টি সরকার গঠন করার পর থেকে কিষাণ বিক্ষোভ ও শ্রমিক ধর্মঘটগুলির মধ্যে দিয়ে বর্ধিত গণচেতনাই প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন: আপনি কি সর্বাত্মক জাতীয় ফ্রন্ট রূপে জাতীয় কংগ্রেসের গণভিত্তিকে ব্যাপকতর করার জন্য শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলিকে সামূহিকভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্বন্ধ করার পক্ষে?

উত্তর: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন: ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ লেবার পার্টি বা ভবিষ্যৎ লেবার সরকার কোন নীতি অবলম্বন করলে আপনার মনঃপূত হয়?

উত্তর: আমরা চাই ব্রিটিশ লেবার পার্টি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য পুরোপুরি সমর্থন করুক।

প্রশ্ন: আপনার 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইয়ের শেষের দিকে ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। ফ্যাসিবাদের উপর আপনার অভিমত সম্পর্কে আপনি কি কোনও মন্তব্য করতে চান? ওই অংশেই কমিউনিজম সম্পর্কে আপনার সমালোচনা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। তার উপরেও কি কোনও মন্তব্য করতে চান?

উত্তর: তিন বছর আগে ওই বই লেখার পর থেকে আমার রাজনৈতিক ধারণা আরও পরিণতি লাভ করেছে।

আমি সত্যি যা বলতে চেয়েছিলাম তা এই যে, ভারতে আমরা চাই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা, এবং তা লাভ করার পর, সমাজতন্ত্রের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। "কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে সমন্বয়"-এর উল্লেখ করে এই কথাই আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম। সম্ভবত যে ভাষায় আমি তা প্রকাশ করেছি তা তেমন সন্তোষজনক হয়নি। তবে আমার দিক থেকে এ কথাও বলে রাখা উচিত যে, যখন আমি বইটি লিখছিলাম, ফ্যাসিবাদ তার সাম্রাজ্যবাদী অভিযান তখনও শুরু করেনি এবং আমার কাছে তা মনে হয়েছিল জাতীয়তাবাদেরই একটা উগ্র সংস্করণ।

এ কথাও আমার বলা দরকার যে, ভারতে যাঁরা কমিউনিস্টপন্থী বলে জাহির করতেন তাঁদের কার্যকলাপ থেকে আমার মনে হয়েছিল তাঁরা জাতীয়তাবিরোধী, এবং এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যখন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি বৈরী মনোভাব প্রকাশ করেন। আজ অবস্থা যে মূলত পালটিয়ে গেছে তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই।

আমি আরও একটি কথা বলতে চাই। মার্কস ও লেনিনের লেখা থেকে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নীতি সংক্রান্ত সরকারি বিবৃতি থেকে যে কমিউনিজমকে জানা যায়, আমার বরাবর ধারণা এবং আমি নিঃসন্দেহ যে, সেই কমিউনিজম জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং তা তার বিশ্ববীক্ষার অঙ্গাঙ্গী অংশ বলেই স্বীকৃত।

আজকের দিনে আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টে সংগঠিত করা উচিত এবং তার দুটি লক্ষ্য থাকবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

হরিপুরা অভিভাষণ

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হরিপুরায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

সভাপতি মহাশয় এবং বন্ধুগণ,

আগামী বৎসরের জন্য আমাকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি (প্রেসিডেন্ট) নির্বাচিত করে যে সম্মান আমাকে অর্পণ করেছেন আমি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছি। এই বিপুল সম্মান লাভের কোনও যোগ্যতা আমার আছে, মুহূর্তের জন্যও এমন চিন্তা করার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি মনে করি এই সম্মান আপনাদের মহত্ত্বের নিদর্শন এবং দেশের তরুণ

সমাজের কাছে আপনাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য; আমাদের জাতীয় সংগ্রামে তাঁদের দীর্ঘসঞ্চিত অবদান না থাকলে আজ আমরা যেখানে রয়েছি সেখানে থাকতাম না। শঙ্কিত দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে আমি এই মঞ্চে আরোহণ করছি, যে-মঞ্চ, এর আগে, আমাদের জন্মভূমির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা অলংকৃত করে গেছেন। আমি জানি আমার অক্ষমতা অসংখ্য, তাই আমি শুধু এইমাত্র আশা ও প্রার্থনা করি, যে উচ্চ আসনে আপনারা আমাকে আহ্বান করেছেন, আপনাদের সহানুভূতি ও সমর্থন সম্বল করে আমি যেন, সামান্য মাত্রায়ও সেই আসনের প্রতি সুবিচার করতে সক্ষম হই।

প্রারম্ভে, শ্রীমতী স্বরূপরাণী নেহরু, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে আমাদের গভীর মর্ম-বেদনার উল্লেখ করে আপনাদের মনোভাব ব্যক্ত করার অনুমতি চাইছি। শ্রীমতী স্বরূপরাণী নেহরু আমাদের কাছে কেবলমাত্র পণ্ডিত মতিলালের সুযোগ্যা সহধর্মিণী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর শ্রদ্ধেয়া জননীই ছিলেন না। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁর যে নিগ্রহভোগ, স্বার্থত্যাগ ও সেবা তাতে যে-কোনও ব্যক্তি গর্ববোধ করতে পারেন। স্বদেশবাসী হিসেবে আমরা তাঁর মৃত্যুতে শোকার্ত। পণ্ডিত নেহরুকে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের আর সকলকে আমাদের সহৃদয় সহানুভূতি জানাই।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে ভারত চিরদিন ঋণী থাকবে। তিনিই প্রথম আধুনিক বিজ্ঞান জগতে ভারতের জন্য সম্মানের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মনেপ্রাণে একজন জাতীয়তাবাদী আচার্য জগদীশ তাঁর জীবন শুধু বিজ্ঞানের সেবাতেই নয়, ভারতের সেবায়ও উৎসর্গ করেছিলেন। ভারত তা জানে এবং সেইজন্য কৃতজ্ঞও। শ্রীমতী বসুকে আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুতে ভারত তার সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বলতম একটি তারকাকে হারাল। বহু বৎসর ধরে বাংলার ঘরে ঘরে সুবিদিত তাঁর নাম ভারতের সাহিত্য জগতেও কম পরিচিত ছিল না। কিন্তু শরৎবাবু সাহিত্যিক হিসেবে যদি বড় হয়ে থাকেন, বোধ হয় দেশপ্রেমিক হিসেবে তিনি ছিলেন আরও বড়। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার কংগ্রেস আজ নিঃসন্দেহে দীনতর। আমরা তাঁর পরিবারের পরিজনদের কাছে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাই।

অন্য কিছু বলার আগে আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, যাঁরা ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনের পর থেকে গত এক বৎসরের মধ্যে দেশের সেবায় জীবন বলি দিয়েছেন। বিশেষ করে আমি তাঁদের কথা বলতে চাই, যাঁরা বন্দিদশায় বা অন্তরীণ অবস্থায় অথবা অন্তরীণ অবস্থা থেকে সদ্য মুক্ত হয়ে মারা যান। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের রাজনৈতিক বন্দি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র মুন্সির কথা বিশেষভাবে স্মরণ করি। এই সেদিন প্রায়োপবেশনে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। আমার হৃদয় এখনও ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। এ বিষয়ে বেশি কিছু বলার মতো অবস্থা আমার নেই। আমি কেবল আপনাদের ভেবে দেখতে বলব, যে-দেশে যতীন দাস, সর্দার মহাবীর সিং, রামকৃষ্ণ নামদাস, মোহিতমোহন মৈত্র, হরেন্দ্র মুন্সি ও তাঁদের মতো প্রতিশ্রুতিভরা আনন্দোজ্জ্বল সন্তানদের জীবনের প্রতি আসক্তি নেই, যাঁরা চান জীবনদীপ নিভিয়ে দিতে সে দেশে নিশ্চয় মারাত্মক কোনও গলদ রয়ে গেছে।

মানব-ইতিহাসের চলমান বিশ্বপটের দিকে একবার তাকালে প্রথমেই আমাদের নজরে পড়ে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন। কী প্রাচ্যে কী পাশ্চাত্ত্যে সাম্রাজ্যগুলি অনিবার্যভাবে এক সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছিয়েছে, তারপরে ধীরে ধীরে নগণ্য অবস্থায় সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে, হয়তো বা কখনও একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। এই নিয়মের জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত প্রাচীন যুগের রোমক সাম্রাজ্য এবং আধুনিক কালের তুর্কি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য। ভারতের সাম্রাজ্যগুলিও—যেমন মৌর্য, গুপ্ত, মোগল সাম্রাজ্য—এই নিয়মের

ব্যতিক্রম নয়। ইতিহাসের এই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কার এমন দুঃসাহস যে বলতে পারে, বিধির বিধান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রকার হবে? ওই সাম্রাজ্য আজ ইতিহাসের এক পথসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আছে। হয় তাকে অন্যান্য সাম্রাজ্যের পথে বিদায় নিতে হবে, নয়তো স্বাধীন জাতিপুঞ্জের এক যুক্তরাষ্ট্রে তাকে রূপান্তরিত হতে হবে। দু'দিকই তার কাছে খোলা আছে। জার সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ১৯১৭ সালে, কিন্তু তারই ভগ্নস্তূপ থেকে জেগে ওঠে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন। রুশ ইতিহাস থেকে গ্রেট ব্রিটেনের এখনও শিক্ষা নেবার সময় আছে। সেই শিক্ষা কি তারা নেবে?

রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিজাতীয় এক সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। এ এক বিচিত্র সমবায়, এর মধ্যে আছে স্বায়ত্তশাসিত দেশ, আছে আংশিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য ও স্বৈরশাসিত উপনিবেশ। শাসনতান্ত্রিক কারসাজি ও মানুষের কূটবুদ্ধি ওই জোড়াতালিকে কিছুকাল টিকিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু চিরদিন পারবে না। আভ্যন্তরিক অসঙ্গতিগুলোকে সময় থাকতে যদি দূর করা না হয়, তাহলে বাইরে থেকে চাপ না এলেও নিজেরই দুঃসহ চাপে এই সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে বাধ্য। কিন্তু নির্ভীক নিশ্চিত এক পদক্ষেপে স্বাধীন জাতিপুঞ্জের এক যুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে কি সম্ভব? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব ব্রিটিশ জনগণের। একটা কথা কিন্তু ঠিক। এই রূপান্তর একমাত্র তখনই সম্ভব যদি ব্রিটিশ জনগণ তাদের স্বদেশে স্বাধীন হয়— যদি গ্রেট ব্রিটেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়। গ্রেট ব্রিটেনের পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীদের সঙ্গে বাইরের উপনিবেশগুলির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়ে গেছে। লেনিন অনেক আগে বলে গেছেন, "কয়েকটি জাতির দাসত্ব গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়াকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করছে।" ব্রিটেনের অভিজাত ও বুর্জোয়াশ্রেণি যে টিকে আছে তার প্রধান কারণ শোষণ করার জন্য উপনিবেশগুলি ও সাগর পারের অধীনস্থ রাজ্যগুলি রয়েছে। নিঃসন্দেহে এদের মুক্তি গ্রেট ব্রিটেনের পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীর অস্তিত্বের মূলে আঘাত হানবে এবং তার পরিণতিতে সেদেশে কায়েম হবে সমাজতন্ত্রী সরকার। অতএব এ বিষয়ে যেন ধারণা স্পষ্ট থাকে যে, ঔপনিবেশিকতা বিলুপ্ত না হলে গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পৌঁছনো অসম্ভব, এবং আমরা, যারা ভারতের সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়ত্তাধীন অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি, পরোক্ষভাবে আমরা ব্রিটিশ জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যেও সংগ্রাম করে চলেছি।

সাম্রাজ্য মাত্রই যে 'বিভেদ ও শাসন' নীতির উপর নির্ভর করে— এ সত্য সর্বজনবিদিত। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় গ্রেট ব্রিটেনের মতো এমন দক্ষতার সঙ্গে, এমন নিয়মিতভাবে ও কঠোর হাতে আর কোনও সাম্রাজ্য এই নীতি অনুসরণ করেছে কিনা। এই নীতি অনুযায়ী আইরিশ জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে আলস্টারকে অবশিষ্ট আয়ারল্যান্ড থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে প্যালেস্টিনিয়ানদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগে আরবদের থেকে ইহুদিদের পৃথক করে দেওয়া হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরকে অকার্যকর করার জন্য আভ্যন্তরিক বিভাগটা প্রয়োজন। এই বিভাজন নীতিই ভিন্নরূপে নতুন ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দেখা যাচ্ছে। এখানে আমরা দেখছি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার এবং প্রতিটি সম্প্রদায়কে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখার প্রয়াস। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় একই সঙ্গে অবস্থান করছে স্বৈরতান্ত্রিক রাজন্যবর্গ এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিরা। নতুন শাসনতন্ত্র যদি শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হয়, তা ব্রিটিশ ভারতের বিরোধিতার ফলেই হোক কিংবা রাজন্যবর্গের যোগদানে অসম্মতির দরুনই হোক, আমার কিন্তু সন্দেহ নেই, তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ কূটবুদ্ধি ভারত বিভাগ করতে এবং এই উপায়ে ভারতবাসীর কাছে হস্তান্তরিত ক্ষমতা অকার্যকর করতে শাসনতান্ত্রিক অন্য কোনও কৌশল আবিষ্কার করবেই। অতএব

হোয়াইটহলের ছাপ মারা ভারতের যে কোনও শাসনতন্ত্রকে যথেষ্ট সাবধানতা ও সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

'বিভেদ ও শাসন' নীতির আপাত কিছু সুবিধা থাকলেও শাসকশক্তির কাছে কোনওক্রমেই তা অবিমিশ্র সুখের হেতু হয় না। বস্তুতপক্ষে তা নতুন নতুন সমস্যা ও বিভ্রাট সৃষ্টি করে। মনে হয় গ্রেট ব্রিটেন তার 'বিভেদ ও শাসন' নীতি-সঞ্জাত রাজনৈতিক দ্বৈততার জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে। তা কি ভারতের মুসলমানদের খুশি রাখবে, না, হিন্দুদের? তা কি প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের, না, আরবদের অনুগৃহীত করবে?—ইরাকের আরবদের, না, কুর্দদের? তা কি মিশরের ওয়াফদ-এর পক্ষ নেবে, না, রাজাকে সমর্থন করবে? সাম্রাজ্যের বাইরেও একই দ্বৈতনীতি লক্ষণীয়। স্পেনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজনীতিকরা ফ্রাঙ্কো ও আইনসঙ্গত সরকার, এই দুইয়ের মধ্যে কাকে সমর্থন করবে তাই নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। অনুরূপভাবে ইউরোপীয় রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যেও তারা দ্বিধাগ্রস্ত। ব্রিটেনের পররাষ্ট্র নীতিতে এই যে বিরোধ ও অসঙ্গতি তা তার সাম্রাজ্যের বিষম গঠনের প্রত্যক্ষ পরিণাম। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ইহুদিদের খুশি না করে পারে না, যেহেতু ইহুদিদের আর্থিক প্রতিপত্তিকে অগ্রাহ্য করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। অপরপক্ষে ইণ্ডিয়া অফিস ও পররাষ্ট্র দপ্তর আরবদের হাতে রাখতে চায়, তার কারণ নিকট-প্রাচ্যে ও ভারতে সাম্রাজ্যিক স্বার্থ। এই ধরনের বিরোধ ও অসঙ্গতির হাত থেকে গ্রেট ব্রিটেন একটিমাত্র উপায়ে পরিত্রাণ পেতে পারে, সেই উপায়—তার সাম্রাজ্যকে স্বাধীন জাতিপুঞ্জের যুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা। যদি তারা তা করতে পারে তাহলে ইতিহাসে অভূতপূর্ব এক দৃষ্টান্ত রেখে যাবে। যদি অপারগ হয়, তাহলে তাদের মেনে নিতে হবে, যে-বিশাল সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, সেই সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে একে একে খসে পড়বে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের পরিণামের কথা ব্রিটিশ জনগণ যেন ভুলে না যায়।

বর্তমান মুহূর্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কয়েকটি স্থানে বেশিরকম চাপ পড়ছে। সাম্রাজ্যের আওতার মধ্যে পশ্চিমপ্রান্তে আছে আয়ারল্যান্ড এবং পূর্বপ্রান্তে ভারত। পাশাপাশি দেশ ইরাক ও মিশরকে নিয়ে মধ্যে রয়েছে প্যালেস্টাইন। সাম্রাজ্যের বাইরে ইতালি চাপ দিয়ে চলেছে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এবং জাপান দূর প্রাচ্যে। এই দুটো দেশই আগ্রাসী, সাম্রাজ্যবাদী ও জঙ্গিভাবাপন্ন। এই অস্থির পটভূমিকার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সোভিয়েত রাশিয়া, যার নিছক অস্তিত্ব প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কতদিন চারদিকের এই সম্মিলিত চাপ ও টানাটানি সইতে পারবে?

নিজেকে "সাতসাগরের রানি" বলার মতো অবস্থা ব্রিটেনের আজ নেই বললেই হয়। আঠারো ও উনিশ শতকে তার অত্যাশ্চর্য উন্নতি তার নৌশক্তির ফলেই সম্ভব হয়েছিল। বিশ শতকে যদি তার সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটে তবে তা ঘটবে বিশ্ব-ইতিহাসে নতুন এক শক্তির আবির্ভাবের ফলে, তা বিমানবল। এই নব্যশক্তি, এই বিমানবল ছিল বলে উদ্ধত ইতালি ভূমধ্যসাগরে সুসজ্জিত ব্রিটিশ নৌবহরকে সাফল্যের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছিল। স্থলে, জলে, আকাশে ব্রিটেন তার সাধ্যমতো অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হতে পারে, আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে যুদ্ধজাহাজ এখনও টিকে যেতে পারে। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের শক্তিশালী অঙ্গ হিসেবে বিমানবলের স্থায়িত্বকে মেনে নিতেই হবে। দূরত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে, এবং আত্মরক্ষার জন্য সর্বপ্রকার বিমান-বিধ্বংসী ব্যবস্থা সত্ত্বেও ইউরোপীয় মহাদেশের যে কোনও স্থান থেকে লন্ডনের উপর বোমা নিক্ষেপ করে যাওয়া যে কোনও বোমারু-বহরের ইচ্ছাসাপেক্ষ। এককথায়, বিমানবল আধুনিক রণকৌশলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, গ্রেট ব্রিটেনের বিচ্ছিন্নতা লোপ করেছে এবং বিশ্ব-রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের দারুণ বিপর্যয় ঘটিয়েছে। বিশাল সাম্রাজ্যের গোড়াকার গলদ আজ যেমন প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে এর আগে কখনও তেমন দেখা দেয়নি।

বিশ্বশক্তিগুলির এই ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে ভারত আগের থেকে বহুগুণ শক্তিশালী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ৩৫ কোটি লোকের বাসভূমি আমাদের এই দেশ বিরাট দেশ। আয়তনে ও জনসংখ্যায় আমাদের বিশালত্ব এতদিন পর্যন্ত আমাদের দুর্বলতার অন্যতম কারণ ছিল। আজ তাই আমাদের শক্তির উৎস, শুধু যদি আমরা মিলিত হয়ে সাহসে ভর করে আমাদের শাসকদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি। ভারতের ঐক্যের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, ব্রিটিশ ভারত এবং ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে যে বিভাগ তা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম। ভারত এক এবং ব্রিটিশ ভারতের ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের আশা-আকাঙ্ক্ষাও একই প্রকার। আমাদের লক্ষ্য স্বাধীন ভারত, এবং আমার মতে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনো যেতে পারে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে, প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় যে প্রজাতন্ত্রের অংশীদার হবে। যাকে বলা হয় "ভারতীয়" ভারত, সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশীয় রাজ্যের প্রজারা যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস বারে বারে সেই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি ও নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে। হতে পারে, বর্তমান মুহূর্তে আমরা নানা ব্যাপার নিয়ে এতই জড়িয়ে আছি যে, রাজ্যগুলিতে আমাদের স্বদেশবাসীদের জন্য কংগ্রেস বেশি কিছু করে উঠতে পারছে না। কিন্তু আজও ব্যক্তিগতভাবে কোনও কংগ্রেস সভ্য যদি দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আদর্শকে সক্রিয় সমর্থন জানান এবং তাদের সংগ্রামে যোগ দেন, তাঁকে বাধা দেবার মতো কিছু নেই। কংগ্রেসের মধ্যে আমার মতো এমন অনেকেই আছেন যাঁরা চান কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আন্দোলনে আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করুক। ব্যক্তিগতভাবে আমি আশা করি, দেশীয় রাজ্যগুলিতে যাঁরা আমাদের সহযোদ্ধা রয়েছেন তাঁদের সাহায্যের জন্য অদূর ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এগিয়ে আসা সম্ভব হবে। আমরা যেন না ভুলি আমাদের সাহায্য ও সহানুভূতি তাঁদের একান্ত প্রয়োজন।

ভারতের ঐক্য প্রসঙ্গে এর পরেই যে সমস্যার কথা আসে তা সংখ্যালঘু সমস্যা। এই প্রশ্নে কংগ্রেস মাঝে মাঝে তার নীতি ঘোষণা করেছে। ১৯৩৭-এর অক্টোবরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা থেকে একেবারে সাম্প্রতিক ও প্রামাণিক ঘোষণা প্রচার করা হয়। ঘোষণাটি এইরূপ:

> ভারতে সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে কংগ্রেস যথেষ্ট গুরুত্বের সহিত বারে বারে তাহার নীতি ঘোষণা করিয়া আসিতেছে এবং তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এই সকল অধিকার রক্ষা করা এবং এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যাহাতে বিকাশ লাভ করিতে পারে এবং জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সম্পূর্ণরূপ অংশ গ্রহণ করিতে পারে সেইজন্য সম্ভবমতো সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিত করা কংগ্রেস তাহার কর্তব্য বলিয়া মনে করে। কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারত, যে ভারতে কোনও শ্রেণি বা গোষ্ঠী বা সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজের স্বার্থে অপরকে শোষণ করিবে না, এবং যেখানে ভারতীয় জনগণের সামগ্রিক মঙ্গল ও অগ্রগতির জন্য জাতির সকলে সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করিবে। সার্বজনিক স্বাধীনতায় ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার এই লক্ষ্য কোনওমতেই ভারতীয় জীবনচর্যায় বহুল বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক রূপভেদের অবদমন বুঝাইবে না। যাহাতে প্রতিটি ব্যক্তি তথা প্রতিটি গোষ্ঠী তাহার সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী অবাধে বিকাশ লাভের সুযোগ ও স্বাধীনতা পাইতে পারে সেইজন্য ওই বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক রূপভেদ রক্ষা করিতেই হইবে।
>
> এই বিষয়ে যেহেতু কংগ্রেসের নীতিকে অপব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই নীতি পুনরায় দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে। নিম্নলিখিত

বিষয়গুলি কংগ্রেস তাহার মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে:

(১) ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার, স্বাধীনভাবে সংঘবদ্ধ হইবার ও সমবায় গঠনের এবং আইন ও নীতিবিরুদ্ধ নয় এইরূপ কোনও উদ্দেশ্যে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হইবার অধিকার থাকিবে;

(২) প্রত্যেক নাগরিকের বিবেকের স্বাধীনতা থাকিবে, এবং সাধারণ শৃঙ্খলা ও সুনীতি সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে তাহার নিজস্ব ধর্ম প্রচার ও পালন করিবার অধিকার থাকিবে;

(৩) বিভিন্ন ভাষাঞ্চলের এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ভাষা ও লিপি সংরক্ষিত থাকিবে;

(৪) ধর্ম, জাতি, বিশ্বাসনিরপেক্ষ এবং নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান বলিয়া গণ্য হইবে;

(৫) ধর্ম, জাতি, বিশ্বাস বা নারী-পুরুষভেদের দরুন সরকারি কোনও চাকুরিতে, সম্মান বা ক্ষমতান্বিত কোনও পদে এবং কোনও ব্যবসায় বা বৃত্তি অনুসরণে কোনও নাগরিক অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা হইবে না।

(৬) জনসাধারণের ব্যবহারার্থে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক উৎসর্গীকৃত অথবা রাজ্য হইতে বা স্থানিক কোনও তহবিল হইতে পরিপোষিত কোনও কূপ, পুষ্করিণী, রাস্তা, বিদ্যালয় এবং সাধারণের গমনাগমনের স্থানে সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকিবে;

(৭) রাষ্ট্র সকল ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকিবে;

(৮) সার্বজনিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে ভোট গ্রহণ করা হইবে;

(৯) প্রত্যেক নাগরিক ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে গমনাগমন করিতে, তাহার যে কোনও অংশে থাকিতে বা বসবাস করিতে, সম্পত্তি অর্জন করিতে এবং যে কোনও ব্যবসায় বা বৃত্তি অনুসরণ করিতে পারিবে এবং ভারতের সকল অংশে ফৌজদারি মামলার ব্যাপারে এবং আইনের আশ্রয়ের প্রশ্নে প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি সমান আচরণ করা হইবে।

মৌলিক অধিকারের এই প্রকরণগুলি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিবেক, ধর্ম কিংবা সংস্কৃতির ব্যাপারে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ সমুচিত হইবে না, এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে কেহ তাহার ব্যক্তিগত আইনকে বজায় রাখিতে পারিবে এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সেই বিষয়ে কোনও পরিবর্তন আরোপ করিতে পারিবে না।

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিষয়ে কংগ্রেসের বক্তব্য পর পর অনেক প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে এবং চূড়ান্তভাবে ব্যক্ত হইয়াছে গত বৎসরে প্রচারিত নির্বাচনী ইস্তাহারে। কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তের বিরোধী যেহেতু তাহা জাতীয়তাবিরোধী, গণতন্ত্র-বিরোধী এবং ভারতের স্বাধীনতার ও ভারতীয় একতার বিকাশে প্রতিবন্ধক। এতৎসত্ত্বেও কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের কোনও পরিবর্তন কিংবা তাহা লঙ্ঘন কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সম্মতি লইয়াই করিতে হইবে। পারস্পরিক মতৈক্য দ্বারা এইপ্রকার পরিবর্তন সাধনের যে কোনও সুযোগকে কংগ্রেস সর্বদা স্বাগত জানাইয়াছে এবং তাহা গ্রহণ করিতে সর্বদা প্রস্তুত আছে।

ভারতের সংখ্যালঘুদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারে কংগ্রেস ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা ও উন্নতিসাধনের সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য সার্বজনিক এক উদ্যোগে তাহাদের সহযোগিতায় ও শুভেচ্ছা লইয়া অগ্রসর হইতে চায়।

এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য নবোদ্যমে চেষ্টা করার উপযুক্ত সময় এসেছে। আমার

বিশ্বাস আমি সকল কংগ্রেস সদস্যের মনের ভাব প্রকাশ করছি, যদি এ কথা বলি যে, জাতীয়তাবাদের মৌলিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সর্বসম্মত একটি সমাধানে পৌঁছতে আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যেতে আগ্রহী। কোন কোন প্রণালীতে সমাধান করা উচিত হবে সে সম্পর্কে আমার বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আগেকার সম্মেলনে এবং আলাপ-আলোচনায় প্রয়োজনীয় অনেক দিক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। আমি শুধু এইটুকু যোগ করতে চাই যে, অর্থনীতিতে বা রাজনীতিতে আমাদের যা সাধারণ স্বার্থ কেবলমাত্র তার উপর জোর দিয়েই আমরা সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিরোধকে এড়িয়ে যেতে পারি। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ধর্মীয় ব্যাপারে 'বাঁচো ও বাঁচতে দাও' নীতি গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে একটা বোঝাপড়ায় আসা। যখনই আমরা সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করি, তখন, যদিও মুসলমানদের সমস্যাই বড় হয়ে দেখা দেয় এবং এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য আমরা সকলেই উদগ্রীব, তবুও আমাকে এ কথা বলতেই হবে যে, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতি বিশেষত তথাকথিত যে সব অনুন্নত শ্রেণি সংখ্যায় অত্যন্ত বিরাট, তাদের প্রতিও সুবিচার করতে কংগ্রেস সমানভাবে আগ্রহী। ভারতে যে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত সকলকে আমি নিস্পৃহভাবে বিবেচনা করে দেখতে বলছি, কংগ্রেসের কর্মসূচিকে কার্যকর করা হলে তাঁদের আশঙ্কার কোনও কারণ থাকবে কিনা। সমগ্রভাবে ভারতের জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্যই কংগ্রেস। যদি কংগ্রেস তার কর্মসূচি রূপায়িত করতে পারে, ভারতীয় জনগণের যে কোনও অংশের মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিও উপকৃত হবে। এর উপরে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর যদি সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পুনর্গঠন চলে— তাই যে চলবে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ— তাহলে যারা "বিত্তবান" দলভুক্ত তারা "বিত্তহীন" দলভুক্তদের ভাঙিয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাবে এবং ভারতের জনসাধারণকে "বিত্তহীন" শ্রেণিভুক্ত বলে ধরতে হবে। একটি প্রশ্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে থাকতে পারে, তা ধর্ম এবং সংস্কৃতির সেই দিক যার ভিত্তি ধর্মের উপর। এই প্রশ্নে কংগ্রেসের নীতি 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও'—বিবেক, ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে কোনওপ্রকার হস্তক্ষেপ না করার নীতি, সেইসঙ্গে বিভিন্ন ভাষাঞ্চলের জন্য সাংস্কৃতিক স্বয়ং-শাসনের নীতি। ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে মুসলমানদের তাই আশঙ্কার কোনও কারণ নেই, অপরপক্ষে তাদের লাভবান হবার যথেষ্ট কারণ আছে। তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণিগুলি যে সব সামাজিক ও ধর্মীয় শৃঙ্খলে পঙ্গু সেই সব শৃঙ্খল মোচন করতে কংগ্রেস যে বিগত সতেরো বছর ধরে চেষ্টার ত্রুটি করেনি তা সুবিদিত, এবং আমার কোনও সন্দেহ নেই, সেদিন সুদূর নয় যখন এই সব শৃঙ্খল অতীতের ঘটনা বলে পরিগণিত হবে।

আগামী দিনে কংগ্রেস কী পদ্ধতি অবলম্বন করবে, সেই সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামে তার কী ভূমিকা হবে সেই সম্পর্কে এখন আমি আলোচনা করতে চাই। আমি আগের থেকেও এখন আরও বেশি বিশ্বাস করি যে সেই পদ্ধতি হবে সত্যাগ্রহ অথবা ব্যাপকতম অর্থে অহিংস অসহযোগ, এবং তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে আইন অমান্য আন্দোলন। আমাদের পদ্ধতিকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আখ্যা দেওয়া ঠিক হবে না। সত্যাগ্রহ, আমি যতটা বুঝি, কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়, তা সক্রিয় প্রতিরোধও, যদিও সেই সক্রিয়তাকে অবশ্যই অহিংস হতে হবে। আমার দেশবাসীকে এ কথা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন আছে যে, সত্যাগ্রহ বা অহিংস অসহযোগের পন্থা আবার আমাদের নিতে হতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে প্রাদেশিক শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমরা যেন মনে না করি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকলাপ নিছক নিয়মতান্ত্রিকতায় সীমাবদ্ধ থাকবে। জোর করে যুক্তরাষ্ট্র চাপিয়ে দেওয়ার তীব্র বিরোধিতায় আমাদের আরেকটি বিরাট আইন অমান্য আন্দোলনে নামতে হতে পারে, এমন সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের দুটি পন্থার যে কোনও একটি নিতে হতে পারে। যতদিন পর্যন্ত আমরা পূর্ণ স্বরাজ না পাই ততদিন লড়াই চালিয়ে যাওয়া এবং লড়াই চলাকালে আমাদের হাতে যে ক্ষমতা আসবে তা ব্যবহার করতে রাজি না হওয়া। অপর পন্থা, পূর্ণ স্বরাজের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যেতে নিজেদের অবস্থা ক্রমে মজবুত করে তোলা। নীতির দিক থেকে উভয় পন্থাই সমান গ্রহণযোগ্য এবং আমাদের দিক থেকে এ ব্যাপারে আগে থেকে ভাবিত হবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রত্যেক পর্যায়ে আমাদের সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে হবে, আমাদের জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে কোন পন্থা অধিকতর উপযোগী হবে। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের অগ্রগতির চরম লক্ষ্য হবে ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা। যখন সেই বিচ্ছেদ ঘটবে এবং ব্রিটিশ আধিপত্যের চিহ্নমাত্রও থাকবে না, তখনই আমরা সেই অবস্থায় আসব যখন উভয়পক্ষের স্বেচ্ছাকৃত এক মৈত্রীচুক্তি মারফত গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক আমরা নির্ণয় করতে পারব। গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কী রকম হবে বা হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে এখনও কিছু বলার সময় হয়নি। তা খুব বেশিমাত্রায় নির্ভর করে ব্রিটিশ জনসাধারণের মনোভঙ্গির উপর। এই বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার মনোভাব আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের মতো আমিও বলতে চাই, ব্রিটিশ জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। আমরা লড়াই করছি গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে এবং তার সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কী হবে তা নির্ণয় করার পুরো স্বাধিকার আমরা চাই। কিন্তু একবার সত্যকার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার পেলে, ব্রিটিশ জনগণের সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক না হওয়ার কোনও কারণ নেই।

আমার আশঙ্কা হয়, কংগ্রেসের অনেক সদস্যের কাছে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেসের ভূমিকা কী সে সম্পর্কে ধারণা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। আমি জানি এমন অনেক বন্ধু আছেন, যাঁরা মনে করেন, কংগ্রেস স্বাধীনতা অর্জন করলে পর, যেহেতু কংগ্রেস পার্টি তার লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে গিয়েছে সেইজন্য কংগ্রেস পার্টির টিকে থাকার আর প্রয়োজন নেই। এই প্রকার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যে পার্টি ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করবে সেই পার্টিই যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠনের সম্পূর্ণ কার্যসূচি বাস্তবে রূপায়িত করবে। ক্ষমতা যারা জয় করে আনতে পেরেছে একমাত্র তারাই সেই ক্ষমতার সমুচিত ব্যবহার করতে পারে। যদি এমন লোকদের ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়, যাদের সেই আসন জয় করায় কোনওই অবদান নেই, বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের কাজে যে শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও আদর্শবাদ অপরিহার্য তাদের মধ্যে সে সবের অভাব দেখা যাবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অত্যন্ত সংকীর্ণ ক্ষেত্রে কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কাজের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা গিয়েছে তার কারণও এই।

না, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস পার্টির অস্তিত্ব লোপ পাবে, এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে না। অপরপক্ষে, এই পার্টিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তার পুনর্গঠনের কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। একমাত্র তখনই পার্টি তার ভূমিকা পুরোপুরি পালন করবে। যদি পার্টি জোর করে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে তাহলে মহা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। যুদ্ধপরবর্তী ইউরোপের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই কেবলমাত্র সেইসব দেশই সুশৃঙ্খলভাবে অব্যাহত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পেরেছে যেখানে যে-পার্টি ক্ষমতা দখল করেছে সেই পার্টিই পুনর্গঠনের কাজ হাতে নিয়েছে।

আমি জানি, কথা উঠতে পারে, রাষ্ট্রের পিছনে এইরকম অবস্থার মধ্যে পার্টির অস্তিত্বকে বজায় রাখলে সেই রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে; আমি কিন্তু এই অভিযোগ স্বীকার করি না। রাষ্ট্র একদলীয় তখনই হতে পারে যখন একটিমাত্র পার্টির অস্তিত্ব থাকে—যেমন রাশিয়া, জার্মানি বা ইতালিতে হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সব পার্টি কেন নিষিদ্ধ হবে তার

কোনও যুক্তি নেই। তা ছাড়া এই পার্টির নিজস্ব একটা গণতান্ত্রিক ভিত্তি থাকবে, যার বিপরীত, বলা যেতে পারে, "একনায়ক নীতি"র উপর প্রতিষ্ঠিত নাৎসি পার্টি। ভবিষ্যৎ ভারতীয় রাষ্ট্রকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত হতে দেবে না একাধিক রাজনৈতিক দল এবং কংগ্রেস পার্টির গণতান্ত্রিক ভিত্তি। তা ছাড়া, নেতাদের যে জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না, তাদের নীচে থেকে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে, পার্টির গণতান্ত্রিক ভিত্তিই তা সুনিশ্চিত করবে।

যদিও পুনর্গঠনের বিশদ পরিকল্পনা পেশ করার সময় এখনও আসেনি, ভবিষ্যতে সামাজিক পুনর্গঠনে যে সকল নীতি অনুসৃত হবে তার কোনও কোনও নীতি নিয়ে আমরা আপাতত বিবেচনা করতে পারি। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি দূর করা সম্পর্কে, সেইসঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে আমাদের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলিকে সমাজতান্ত্রিক উপায়েই যে কার্যত সমাধান করা যেতে পারে এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় সরকারের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে পুনর্গঠনের ব্যাপক এক পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা। এই পরিকল্পনার দুটি অংশ থাকবে—একটি অব্যবহিত কার্যসূচি এবং একটি দীর্ঘমেয়াদি কার্যসূচি। প্রথম অংশটি তৈরি করার সময় তিনটি আশু লক্ষ্যের দিকে নজর রাখতে হবে—প্রথমত দেশকে আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করা; দ্বিতীয়ত ভারতকে একতাবদ্ধ করা; এবং তৃতীয়ত স্থানিক ও সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দেওয়া। দ্বিতীয় ও তৃতীয় লক্ষ্য দুটি পরস্পরবিরোধী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা নয়। জাতি হিসেবে আমাদের যা কিছু রাজনৈতিক মনীষা বা প্রতিভা, এই দুই লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনে তার প্রয়োগ করতে হবে। দেশকে আমাদের একতাবদ্ধ করতে হবে যাতে বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করে ভারত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার মারফত দেশকে একতাবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশগুলি, সেইসঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যাতে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে সেজন্য সাংস্কৃতিক ও সরকারি ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে। বিদেশি আধিপত্যের বোঝা যখন অপসারিত হবে, তখন আমাদের জনগণকে একসঙ্গে ধরে রাখার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার দরকার হবে, কারণ বিজাতীয় শাসন আমাদের কিছু পরিমাণে নীতিচ্যুত ও বিশৃঙ্খল করেছে। জাতীয় একতা যাতে বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে আমাদের সর্বজনগ্রাহ্য একটি ভাষা ও একটি লিপি গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া এরোপ্লেন, টেলিফোন, রেডিও, ফিল্ম, টেলিভিশনের মতো আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রকৌশলের সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ করতে হবে, এইসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে এক সাধারণ নীতি অনুসরণ করে ভারতের আপামর জনসাধারণের মধ্যে একই মনোভাব আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। আমাদের জাতীয় ভাষা প্রসঙ্গে আমার মনে হয় হিন্দি ও উর্দুর মধ্যে যে পার্থক্য তা নেহাতই কৃত্রিম। আমাদের পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক জাতীয় ভাষা হবে এই দুই ভাষার মিশ্রণ। বাস্তবিকপক্ষে দেশের ব্যাপক অঞ্চলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সেই ভাষাই চলে, এবং এই সাধারণব্যবহার্য ভাষা নাগরি বা উর্দু যে কোনও লিপিতে লেখা যেতে পারে। আমি জানি ভারতে এমন অনেকে আছেন যাঁরা এই লিপি দুটির একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি গ্রহণের পক্ষে উগ্র মত পোষণ করেন। আমাদের নীতি কিন্তু বর্জনের নীতি হবে না। দুই লিপির যে কোনও লিপি ব্যবহার করতে আমরা পুরোপুরি প্রশ্রয় দেব। একই সঙ্গে, আমার এ কথাও মনে হচ্ছে, এ সম্পর্কে শেষ সমাধান, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান এমন একপ্রকার লিপি গ্রহণের মধ্যে সম্ভব হবে যা আমাদের বাকি দুনিয়ার সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত করবে। হতে পারে, আমাদের কোনও কোনও দেশবাসী আতঙ্কে শিউরে উঠবেন যখন তাঁরা রোমান লিপি গ্রহণের কথা শুনবেন, কিন্তু আমি তাঁদের সানুনয়ে আবেদন করব, তাঁরা যেন সমস্যাটিকে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করে দেখেন। যদি আমরা তা করি, আমরা তখনই বুঝতে পারব লিপিকে পরম পবিত্র

বলে গণ্য করার মতো কিছু নেই। যে নাগরি লিপিকে আমরা দেখেছি তা বিবর্তনের বেশ কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে আজ এই হয়েছে। তা ছাড়া ভারতের প্রধান প্রধান প্রদেশগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই নিজস্ব লিপি আছে। এর উপর উর্দু লিপি ব্যবহার করে থাকে ভারতের উর্দুভাষী জনসাধারণ এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মতো প্রদেশের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা। এতরকম বিভিন্নতা আছে বলেই সারা ভারতের জন্য একই রকম লিপি স্থির করতে হলে তা করা উচিত পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে যাতে কোনও রকম পক্ষপাত না থাকে। আমি স্বীকার করছি একসময়ে আমি ভাবতাম বিদেশি লিপি গ্রহণ করা হবে জাতীয়তাবিরোধী। কিন্তু ১৯৩৪ সালে তুরস্ক দেশে যাবার ফলে আমার মত বদলিয়ে যায়। তখন আমি প্রথম বুঝতে পারলাম বাকি দুনিয়া যে লিপি নিয়েছে সেই লিপি গ্রহণ করায় কী দারুণ সুবিধা! আমাদের দেশে জনসাধারণের দিক থেকে ভেবে দেখলে, যেহেতু শতকরা ৯০ ভাগের বেশি নিরক্ষর এবং কোনও লিপির সঙ্গেই তাদের পরিচয় নেই, তাদের শিক্ষিত করার সময় যে কোনও লিপি আমরা প্রবর্তন করি তাতে তাদের কিছু এসে যায় না। এ ছাড়াও রোমান লিপি জানা থাকলে ইউরোপীয় ভাষা শেখা তাদের পক্ষে সহজ হবে। আমার দেশে রোমান লিপি এখনই চালাতে গেলে জনমত কী পরিমাণ বিক্ষুব্ধ হবে সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট সচেতন। তা সত্ত্বেও আমার দেশবাসীর কাছে আমার নিবেদন, শেষ পর্যন্ত যে সমাধান সব দিক থেকে বিজ্ঞজনোচিত, সে সম্পর্কে তাঁরা যেন বিচার করে দেখেন।

স্বাধীন ভারতের দীর্ঘমেয়াদি কার্যসূচি সম্পর্কে প্রথম যে সমস্যা নিয়ে বোঝাপড়া দরকার তা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। ভারতের জনসংখ্যা অত্যধিক কি না তত্ত্বগত এই প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। আমি শুধু একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যে-দেশের সর্বত্র দারিদ্র্য, অনাহার ও ব্যাধি সে-দেশে এক দশকে যদি জনসংখ্যা তিন কোটি বেড়ে যায় তাহলে আমাদের পক্ষে তা সামলানো সম্ভব নয়। জনসংখ্যা যদি দ্রুতহারে বাড়তে থাকে, কিছুকাল থেকে যা দেখা যাচ্ছে, তাহলে আমাদের যাবতীয় পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেতে পারে। অতএব যতদিন পর্যন্ত যারা বেঁচে আছে তাদের খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা যোগান দিতে না পারি ততদিন আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাই সমুচিত। আপাতত জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি রোধ করার জন্য কী কী পদ্ধতি গ্রহণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেবার আবশ্যকতা নেই, তবুও আমার অনুরোধ এ বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি যেন আকর্ষণ করা হয়।

পুনর্গঠন বিষয়ে আমাদের প্রধান সমস্যা হবে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা। তার জন্য ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কার, সেই সঙ্গে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ আবশ্যক। কৃষিক্ষেত্রে স্থায়ী ঋণগ্রস্ত পরিস্থিতির অবসান দরকার এবং গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য সামান্য সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উৎপাদক ও ক্রেতাদের সুবিধার জন্য সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। ভূমিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষির উন্নতিসাধনই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে শিল্পোন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা অপরিহার্য। দেশে বিজাতীয় শাসন এবং বিদেশে ব্যাপক হারে শিল্পোৎপাদনের ফলে প্রাচীন যে শিল্পব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে তার স্থলে নতুন এক শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্ল্যানিং কমিশনকে সযত্নে বিবেচনা করে স্থির করতে হবে, আধুনিক কল-কারখানার প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও কোন কোন কুটির শিল্পের পুনরুদ্ধার সম্ভব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বৃহৎ উৎপাদন-শিল্পকে উৎসাহদান করা উচিত। আধুনিক শিল্পায়নকে আমরা যতই অপছন্দ করি না কেন এবং সেই সূত্রে যে সব কুফল দেখা দেয় তার নিন্দা করি, আমাদের ইচ্ছা থাকলেও আমরা আর শিল্পপূর্ব যুগে ফিরে যেতে পারব না। অতএব আমাদের

পক্ষে শিল্পযোজন মেনে নেওয়াই ভাল, অবশ্য দেখতে হবে যাতে তার কুফল কমিয়ে আনা যায়। কলকারখানার অনিবার্য প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যে সব কুটির শিল্পের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব, তাদের যাতে বাঁচিয়ে তোলা যায়, একই সঙ্গে সেই দিকেও প্রয়াস চালাতে হবে। ভারতের মতো দেশে কুটির শিল্পের অফুরন্ত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, বিশেষত যে সব শিল্পের সঙ্গে কৃষির যোগ আছে,—যেমন চরকা ও তাঁত।

পরিশেষে প্ল্যানিং কমিশনের উপদেশ অনুযায়ী উৎপাদন ও উপযোজনের ক্ষেত্রে সমগ্র কৃষি ও শিল্পব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে সামাজিকীকরণের জন্য সর্বাত্মক এক পরিকল্পনা রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করতে হবে, তা আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ঋণ মারফত হোক কিংবা মুদ্রাস্ফীতি দ্বারাই হোক।

শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক অংশকে বাধা দেওয়া বা বিরোধিতা করা এখন প্রায় অসম্ভব, যেহেতু কংগ্রেস পার্টি এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এর ফলে এখন একমাত্র যা সম্ভব তা হল, কংগ্রেসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং শক্তিশালী করা। আমি তাদের একজন যারা কংগ্রেসের সরকার গঠনের পক্ষে ছিল না, তার কারণ এই নয় যে তা মূলত অন্যায়। এও নয় যে, এই নীতির ফলে ভাল কিছুই হবে না। তার কারণ ছিল এই আশঙ্কা যে, সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের কুফল তার সুফলকে ছাড়িয়ে যাবে। আজ আমি কেবল এইটুকু আশা করতে পারি যে আমার আশঙ্কা যেন অমূলক হয়।

আমাদের মন্ত্রীরা যখন সরকারি ক্ষমতায় রয়েছেন তখন আমাদের পক্ষে কি করে কংগ্রেসকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করা সম্ভব? প্রথম কর্তব্য হবে আমলাতন্ত্রের গঠন ও চরিত্রকে বদলানো। এ কাজ যদি না করা হয় তাহলে কংগ্রেস পার্টির বরাতে অনেক দুঃখ আছে। প্রত্যেক দেশেই মন্ত্রীরা আসে যায় কিন্তু পরিকল্পনা ও প্রয়োগের মাধ্যম যে স্থায়ী পরিকাঠামো তার কোনও পরিবর্তন হয় না। যদি আমলাতন্ত্রের গঠন ও চরিত্রকে বদলানো না যায় তাহলে সরকার-গঠনকারী পার্টি এবং তাদের মন্ত্রিসভা তাদের নীতি কার্যকর করতে গিয়ে সম্ভবত ব্যর্থই হবে। যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে সোশ্যাল ডেমক্রেটিক পার্টির ক্ষেত্রে এমনই ঘটেছিল এবং সম্ভবত ১৯২৪ ও ১৯২৯ সালে গ্রেট ব্রিটেনে লেবার পার্টির ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। যে কোনও দেশে আমলাতন্ত্রের স্থায়ী কর্মচারীগণই সত্যকার শাসন চালিয়ে যায়। ভারতে এইসব পদ ব্রিটিশের সৃষ্টি এবং উচ্চপদগুলি প্রধানত ব্রিটিশরাই অধিকার করে রেখেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব না ভারতীয়, না জাতীয় এবং যতদিন পর্যন্ত স্থায়ী আমলাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব জাতীয় না হচ্ছে ততদিন জাতীয় নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে না। অবশ্য এ বিষয়ে মুশকিল আছে। স্থায়ী চাকরির মধ্যে উচ্চতর পদগুলি আইনবলে সরাসরি ভারত-সচিবের (সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া) অধীনে, তাদের উপরে প্রাদেশিক সরকারের কোনও এক্তিয়ার নেই। এই অবস্থায় এইসব পদের গঠন পরিবর্তন করা সহজসাধ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসি মন্ত্রীরা বিভিন্ন প্রদেশে অধিষ্ঠিত থাকাকালে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাদকবর্জন, কারাসংস্কার, সেচব্যবস্থা, শিল্প, ভূমিসংস্কার, শ্রমিক-কল্যাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা প্রবর্তন করবেন, এইটিই কাম্য। এই বিষয়ে যথাসাধ্য প্রয়াস করতে হবে যাতে সারা ভারতের ক্ষেত্রে একটিমাত্র নীতি অনুসরণ করা হয়। নীতিগত এই সমতা দুটি উপায়ের যে কোনও একটির দ্বারা সম্ভব। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসি মন্ত্রীরা নিজেরাই এক জায়গায় এসে জড়ো হয়ে—যেমন ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে কলকাতায় শ্রমমন্ত্রীরা জড়ো হয়েছিলেন—সর্বসম্মত এক কার্যসূচি প্রণয়ন করতে পারেন। এ ছাড়াও কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বসম্পন্ন সংস্থা, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, তার নিজস্ব বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে যেমন যেমন পরামর্শ পাবে তার

পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রিত প্রাদেশিক সরকারগুলির বিভিন্ন বিভাগগুলিকে যথোচিত নির্দেশ দিয়েও সাহায্য করতে পারে। এর ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা জানতে পারবেন প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস সরকার কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাঁরা প্রশাসনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবেন, তা কাম্য নয়। যেটুকু প্রয়োজন তা এই যে, তাঁরা যেন বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থাকেন যাতে মোটামুটি নীতিগুলি তাঁরা স্থির করে দিতে পারেন। এই বিষয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এতদিন পর্যন্ত যা করে এসেছে তার থেকে অনেক বেশি কিছু করতে পারে, এবং যদি তা না পারে, আমি বুঝি না কি করে এই সংস্থা বিভিন্ন কংগ্রেস মন্ত্রিসভার উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারবে।

এখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে আমি আরও কিছু বলতে চাই। আমার বিবেচনায় এই কমিটি জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর কেবল চালকশক্তিই নয়, তা স্বাধীন ভারতের ছায়া-মন্ত্রিসভাও বটে এবং সেইভাবেই তার কাজ করে যাওয়া উচিত। এ কথা আমার নিজের মনগড়া নয়। অন্যান্য দেশে অনুরূপ যে সব সংস্থা জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে তাদের জন্যও এই ভূমিকা ধার্য হয়েছে। আমি তাদের একজন যারা স্বাধীন ভারতকে সামনে রেখে চিন্তা করে, যারা আমাদের জীবনের সীমিত পরমায়ুর মধ্যেই দেশে জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা দেখে যাবার আশা করে। অতএব ওয়ার্কিং কমিটি স্বাধীন ভারতের ছায়া-মন্ত্রিসভা হিসেবে কাজ করুক এবং সেই দায়িত্ব বোধ করুক— সেই আবেদন করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার প্রজাতন্ত্রী সরকারও এভাবেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যেতে সম্মুখগামী হয়েছিল। সরকারে অধিষ্ঠিত হবার আগে মিশরের ওয়াফদ পার্টি এইভাবেই চলেছিল। দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের সঙ্গে সঙ্গে, ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিগ্রহণের পর কী ধরনের সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে, তার বিষয়েও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের ওয়াকিবহাল হতে হবে।

কংগ্রেস সরকারগুলি ঠিকমতো কাজ চালিয়ে যেতে পারছে কিনা তার চেয়ে অনেক গুরুতর প্রশ্ন শাসনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত অংশের প্রবর্তনের বিরোধিতা করা যায় কী করে। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে কংগ্রেসের যা মনোভাব তা ১৯৩৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধাতে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং বিবেচিত হয়, যে প্রস্তাব এই কংগ্রেসের সামনে উপস্থাপিত করা হবে।

প্রস্তাবটিতে বলা আছে:

> কংগ্রেস নতুন শাসনতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং ঘোষণা করিয়াছে যে, জনসাধারণ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য ভারতের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি কেবলমাত্র স্বাধীনতাই হইতে পারে এবং তাহা বৈদেশিক শক্তির বিনা হস্তক্ষেপে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্ব্লির সহায়তায় কেবলমাত্র জনগণই রচনা করিতে পারে। প্রত্যাখ্যানের এই নীতিকে স্বীকার করিয়াও কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি প্রদান করিয়াছে যাহাতে তদ্দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতিকে শক্তিশালী করা যায়। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সাময়িকভাবে বা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যও এইপ্রকার কোনও বিবেচনার কথা উঠে না, এবং এই যুক্তরাষ্ট্র আরোপ করা হইলে তাহা ভারতের সমূহ ক্ষতিসাধন করিবে এবং সাম্রাজ্যিক আধিপত্যের অধীনে যে বন্ধনে ভারত আবদ্ধ রহিয়াছে তাহা দৃঢ়তর হইবে। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সরকারের অপরিহার্য কর্মাধিকারকে দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্র হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।
>
> কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের ধারণার বিরোধী নয় কিন্তু দায়িত্বের প্রশ্ন বাদ দিলেও যথার্থ

যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় স্বাধীন অঙ্গরাজ্যদিগকে লইয়া, যাহারা কম-বেশি একই পরিমাণ স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব ভোগ করে। যে সকল দেশীয় রাজ্য এই যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইবে, প্রতিনিধিমূলক সংস্থার প্রতিষ্ঠায়, দায়িত্বশীল সরকার গঠনে, নাগরিক স্বাধীনতার ব্যাপারে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় নির্বাচনের পদ্ধতিতে, এইসকল বিষয়ে তাহাদের প্রদেশগুলিকে অনুসরণ করা উচিত হইবে। অন্যথায় যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এখন যাহা চিন্তা করা হইতেছে তাহা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে বিভেদের প্রবণতাকেই জাগাইয়া তুলিবে এবং রাজ্যগুলিকে আভ্যন্তরিক ও বাহ্য সংঘাতে লিপ্ত করিবে।

অতএব কংগ্রেস প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি তাহার ধিক্কার পুনরায় জ্ঞাপন করিতেছে এবং প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলিকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে সেইসঙ্গে প্রাদেশিক সরকার ও মন্ত্রিমণ্ডলীকে ইহার প্রবর্তন প্রতিহত করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে।

জনসাধারণের বিঘোষিত অভিপ্রায় সত্ত্বেও ইহা চাপাইয়া দিবার প্রচেষ্টা করা হইলে এইপ্রকার প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে প্রতিহত করা হইবে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি ও মন্ত্রিসভাগুলি তাহার সহিত সহযোগিতা করিতে অবশ্যই অস্বীকার করিবে।

এইপ্রকার অবস্থার উদ্ভব হইলে, এমতাবস্থায় কী কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর অধিকার ন্যস্ত করা হইতেছে এবং কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আমাদের আপসহীন বৈরী মনোভাব কেন, তা ব্যাখ্যা করার জন্য আমি আরও কয়েকটি কথা বলতে চাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অত্যন্ত আপত্তিকর দিকগুলির মধ্যে অন্যতম নতুন শাসনতন্ত্রে বাণিজ্যিক ও আর্থিক রক্ষাকবচ সম্পর্কিত দিকটি। দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে জনসাধারণকে ক্ষমতাহীন করেই শুধু রাখা হবে না, ব্যয়বরাদ্দ খাতের অধিকাংশ থাকবে সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ১৯৩৭-৩৮ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট অনুযায়ী সামরিক খাতে খরচ হয়েছে ৪৪.৬১ কোটি টাকা (৩.৩৪৬ কোটি পাউন্ড), যেখানে মোট খরচের পরিমাণ ৭৭.৯০ কোটি টাকা (৫.৮৪২ কোটি পাউন্ড)—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের শতকার ৫৭ ভাগ। দেখা যাচ্ছে, গভর্নর জেনারেল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের যে সংরক্ষিত দিকটি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন সেই খাতে ব্যয় হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ। তা ছাড়া, এরই মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ফেডারেল রেলওয়েজ অথরিটির মতো সংস্থা গঠন করা হয়েছে এবং পরে আরও হবে, যারা স্বয়ংস্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করে যাবে এবং তাদের উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভার কোনওরূপ নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। রেলওয়ে নীতি সম্পর্কে নির্দেশ দিতে এবং তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে বর্তমানে বিধানসভার যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা থেকে বিধানসভা বঞ্চিত হবে, এবং দেশের মুদ্রা ও মুদ্রাবিনিময় নীতির সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকলেও সেই নীতি নির্ধারণে বিধানসভার কোনও হাত থাকবে না।

বহির্দেশীয় ব্যাপার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে সংরক্ষিত বিষয় বলে গণ্য হবে; এর ফলে ভারতীয় বিধানসভার বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে এবং কার্যত রাজস্ব সংক্রান্ত স্বয়ং-নির্ভরতা গুরুতরভাবে সংকুচিত হবে। ভারতীয় আইনসভার কাছে এখন যেমন ইন্দো-ব্রিটিশ বাণিজ্যচুক্তি উপস্থাপিত করার কোনও প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে না, তেমনই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারেরও এইরকম বাণিজ্যচুক্তি অনুমোদনের জন্য বিধানসভার কাছে উপস্থাপনের

শাসনতান্ত্রিক কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না। তথাকথিত রাজস্ববিষয়ক স্বয়ং-নির্ভরতার প্রথাগত নিয়মের কোনও অর্থই থাকবে না যদি এইরকম শর্ত না থাকে যে, ভারতের পক্ষে যে কোনও বাণিজ্যচুক্তিতে ভারতীয় আইনসভার বিনা অনুমোদনে কোনও পক্ষই স্বাক্ষর করতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, ভারতের পক্ষে জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সেইসব দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি করা উচিত, যাদের সঙ্গে তার অতীতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভার সেই ক্ষমতা থাকবে না যাতে তা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে এই ধরনের বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করতে পারে।

আইনে বাণিজ্যসংক্রান্ত অন্যায় ও অন্যায্য যে রক্ষাকবচগুলি রাখা হয়েছে তা ভারতীয় জাতীয় শিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য কার্যকর যে কোনও প্রচেষ্টা ব্যাহত করবে, বিশেষত প্রায়শই যেমন হয়ে থাকে, যে ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক ও শিল্পসংক্রান্ত স্বার্থের সঙ্গে তার বিরোধ থাকবে। পক্ষপাতিত্বমূলক আইনের বিধানগুলি যাতে যথাযথভাবে পালন করা হয় সেই বিষয়ে গভর্নর-জেনারেলের বিশেষ দায়িত্বের উপরে আরও একটি কর্তব্য থাকছে, ভারতে আমদানি করা ব্রিটিশ পণ্যের উপর যাতে কোনওপ্রকার প্রভেদাত্মক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা। এইসব কড়া ও ব্যাপক বিধানগুলি গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখলে বোঝা যাবে যে, ভারত ব্রিটিশ প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে এমন কোনও পন্থাই অবলম্বন করতে পারে না যা গভর্নর-জেনারেল বিধানিক ক্ষেত্রে বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কার্যত নাকচ বা অগ্রাহ্য করতে না পারেন। এ দেশে এ-দেশীয়দের সঙ্গে বিদেশীয়দের সমান সমান শর্তে প্রতিযোগিতা চালিয়ে যেতে দেওয়া চরম অযৌক্তিক ব্যাপার এবং সত্যকার স্বরাজ বলে কিছুই হবে না যদি ভারতকে তার জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি নির্ণয় ও গ্রহণ করার ক্ষমতা, সেইসঙ্গে তার স্বার্থের দিক থেকে যদি প্রয়োজন হয়, জাতীয় ও বিজাতীয়দের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করার অধিকার দেওয়া না হয়। ১৯৩১ সালের গান্ধী-আরউইন চুক্তির অব্যবহিত পরে লেখা 'দ্য জায়েন্ট অ্যান্ড দ্য ডোয়ার্ফ' শিরোনামে 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-য় প্রকাশিত বিখ্যাত প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "ভারতীয় স্বার্থ এবং ইংরেজ বা ইউরোপীয় স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করা হবে না, এ কথা বলা মানে ভারতীয় দাসত্বকে চিরস্থায়ী করা। একটা দানবের ও একটা বামনের একই রকম অধিকার বলতে কী বোঝায়?" ভারতীয় মালিকানাধীন বা ভারতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন জাহাজের জন্য ভারতীয় উপকূল-বাণিজ্য সংরক্ষিত রাখার জন্য আইন প্রণয়নের যে সামান্য ক্ষমতা বর্তমানে কেন্দ্রীয় আইনসভার এক্তিয়ারে আছে, তথাকথিত সংস্কৃত শাসনতন্ত্র তাও কেড়ে নিয়েছে। দেশরক্ষা এবং বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে জাহাজশিল্প অত্যন্ত অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই মৌল শিল্পটিকে প্রচলিত ও ন্যায়সঙ্গত কোনও পদ্ধতিতেই, এমনকী যে সকল পদ্ধতি বিভিন্ন ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন অনুসরণ করেছে, সেই সব পদ্ধতিতেও বিকশিত করা এখন থেকে ভারতের পক্ষে অসাধ্য করা হয়েছে। "ব্যতিহার" ও "অংশীদারি"র যুক্তিতে আমাদের সার্বভৌমত্বের এরকম সীমানির্দেশকে যথোচিত প্রতিপন্ন করা, আঘাত করার পর অপমানের সামিল। ভারতীয় স্বার্থে যখনই প্রয়োজন হবে, জাতীয় ও বিজাতীয়দের মধ্যে প্রভেদ করা ও পার্থক্য রক্ষা করার অক্ষুণ্ণ অধিকার ভবিষ্যৎ ভারতীয় পার্লামেন্টের থাকা উচিত এবং আমরা কোনওক্রমেই এই অধিকার ছেড়ে দিতে পারি না। এই প্রসঙ্গে আয়ারল্যান্ডের অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। কতকগুলি বিষয়, যেমন, নির্বাচনপদ্ধতি, জনকল্যাণমূলক কাজে যোগদান, বাণিজ্যপোত আইন, বিমান, সেইসঙ্গে আরও বিশেষ যে সকল সুবিধা আইরিশ জাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রাখা বিবেচিত হয়েছে, যেমন আইরিশ শিল্পের সহায়তার জন্য বিশেষ পন্থা মারফত সুবিধানদান, এই সকল ক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের আইরিশ ন্যাশনালিটি অ্যান্ড

সিটিজেনশিপ অ্যাক্টে বিশেষ ধরনের আইরিশ নাগরিকতার বিধান আছে। আইরিশ নাগরিক অধিকার, এককথায় বলতে গেলে, ব্রিটিশ নাগরিক অধিকার থেকে স্বতন্ত্র। আয়ার রাষ্ট্রে (বা আয়ারল্যান্ডে) ব্রিটিশ নাগরিকতার ভিত্তিতে সমান অধিকার দাবি করতে পারে না। ব্রিটিশ নাগরিক অধিকার আয়ারল্যান্ডে স্বীকৃতও নয়। আমি বোধ করি ভারতেরও উচিত অনুরূপভাবে তার নিজস্ব বিশিষ্ট জাতীয় সত্তা গড়ে তোলার প্রয়াস করা এবং নিজস্ব নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

রাজস্ব সংক্রান্ত স্বয়ংশাসন ও বাণিজ্যিক রক্ষাকবচের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে, আমি সংক্ষেপে ভারতের পক্ষে সক্রিয় একটি বাণিজ্য-নীতির প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করতে চাই। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যকে অনিয়মিত ও খাপছাড়াভাবে দেখা উচিত নয়। ব্রিটিশ শিল্পকে প্রয়োজনমতো বা সাময়িক সুবিধার যোগান দেবার জন্য প্রায়ই তা করা হয়। এই বৈদেশিক বাণিজ্যকে দেখা উচিত সর্বাত্মকভাবে যাতে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে একদিকে তার বহির্বাণিজ্যের, অপরদিকে বাহিরিক বাধ্যবাধকতার যোগ থাকে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতিই এমন যে সেই দিক থেকে তার একটি জিনিস একান্ত আবশ্যক। ইংল্যান্ডের সঙ্গে তার এমন কোনও সীমানিয়ন্ত্রক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া উচিত হবে না, যাতে সাম্রাজ্যবহির্ভূত বিভিন্ন দেশ, যারা নানা দিক থেকে তার শ্রেষ্ঠ ক্রেতা, তাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে, অথবা যাতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সরাসরি দরদস্তুর করার ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ইন্দো-ব্রিটিশ বাণিজ্যচুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা রক্ষার জন্য এখনও কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এবং অটোয়া চুক্তির নোটিসের মেয়াদ পার হয়ে যাওয়ার পরও এবং আইনসভা এই চুক্তিকে আর চালু না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তা চালু রাখা হয়েছে। ব্রিটিশ ইস্পাত ও বস্ত্রের ওপর পার্থক্যমূলক শুল্ক আরোপ করা ছাড়াও ওই অটোয়া চুক্তি ব্রিটিশ শিল্পের জন্য প্রচলিত সুবিধাগুলি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি মাত্রই যে অসম হতে বাধ্য এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ আমাদের এখনকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ এমনই যাতে ইংল্যান্ডের স্বার্থের দিক বেশি করে দেখা হবে। ব্রিটিশ পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা যে মূলত রাজনৈতিক এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই এবং বাণিজ্যচুক্তির আওতায় এ দেশে কোনও অভারতীয় লগ্নি-স্বার্থকে সংহত বা প্রতিষ্ঠিত হতে দেবার আগে তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও অর্থনৈতিক ফলাফল আমাদের ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। আমার বিশ্বাস, বর্তমানে ইন্দো-ব্রিটিশ বাণিজ্যচুক্তির যে আলোচনা চলছে তা, যখনই সম্ভব, অন্যান্য দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের পথে অন্তরায় হয়ে উঠবে না, এবং ভারতীয় আইনসভা অনুমোদন না করা পর্যন্ত এইপ্রকার কোনও বাণিজ্যচুক্তিতে ভারত সরকার স্বাক্ষর করবে না।

উল্লিখিত অংশ থেকে এ কথা নিশ্চয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর ক্ষমতার সঙ্গে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভার ক্ষমতার কোনও মিল নেই। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার গঠনও কিছু পরিমাণে প্রতিক্রিয়াশীল। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মোট জনসংখ্যা সারা ভারতের জনসংখ্যার মোটামুটি শতকরা ২৪ ভাগ। তৎসত্ত্বেও এইসব রাজ্যের রাজন্যবর্গকে, তাদের প্রজাদের নয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার নিম্নতর সভায় মোট আসনের শতকরা ৩৩ ভাগ আসন এবং উচ্চতর সভায় ৪০ ভাগ আসন দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায়, আমার মতে, কংগ্রেসের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে তাদের মনোভাব বদলানোর সম্ভাবনা কখনই নেই। ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করার উপরে আমাদের অব্যবহিত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রস্তাবকে সর্বপ্রকার শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে আমাদের বিরোধিতা করতেই

হবে— কেবলমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পথেই আমরা চলব এমন কথা নয়— শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতে যে চরম উপায় আছে, সর্বাত্মক সেই আইন অমান্যের পথও আমাদের নিতে হতে পারে। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কমই আছে যে, ভবিষ্যতে যদি এরকম আন্দোলন শুরু হয়, তা ব্রিটিশ ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়বে।

নিকট ভবিষ্যতে সার্থক সংগ্রাম করতে হলে নিজেদের দিকটা আগে ঠিক করে নেওয়া দরকার। গত কয়েক বছরে জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা এমন বিপুল হয়ে উঠেছে যে আমাদের পার্টি সংগঠন সম্পর্কে নতুন এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। আজকালকার সভায় পঞ্চাশ হাজার নরনারীর সমাবেশ নিতান্ত মামুলি ঘটনা। কখনও কখনও দেখা যায় এইসব সভা বা শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথেষ্ট সাংগঠনিক শক্তি আমাদের নেই। এইসব সাময়িক জনসমাবেশের কথা বাদ দিলেও, আরও বড় এক সমস্যা থেকে যায়, অভূতপূর্ব এই গণশক্তি ও উদ্দীপনাকে সুসংহত করা এবং সঠিক পথে তাদের চালিত করা। কিন্তু এই কাজ করার মতো সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কি আমাদের আছে? জাতীয় সেবার জন্য কি আমাদের অফিসারদল আছে? সদ্য যারা নেতা হয়ে উঠছে, যে তরুণ কর্মীদের মধ্যে সম্ভাবনা আছে, তাদের প্রশিক্ষণের জন্য আমরা কি কোনও ব্যবস্থা করেছি? এই প্রশ্নগুলির জবাব এতই স্পষ্ট যে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। আধুনিক রাজনৈতিক দলের এইসব চাহিদা আমরা এখনও পুরণ করতে পারিনি। এখনই আমাদের তা করা দরকার। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসারদের দিয়ে গঠিত সুশৃঙ্খল এক স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী অত্যন্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া আমাদের রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে ভবিষ্যতে আমরা আরও সুযোগ্য নেতা পেতে পারি। ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি গ্রীষ্মকালীন স্কুল ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান মারফত এইপ্রকার প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করে। একদলীয় রাষ্ট্রগুলির বৈশিষ্ট্যই এই। আমাদের কর্মীরা, যাঁরা আমাদের সংগ্রামে গৌরবজনক অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েও আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের পার্টিতে আরও প্রতিভাস্ফুরণের ক্ষেত্র আছে। এই ত্রুটি অংশত দূর করা যেতে পারে, যে সকল তরুণের মধ্যে সম্ভাবনা আছে তাদের দলভুক্ত করে এবং অংশত যাঁদের আমরা আগেই পেয়েছি তাঁদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রত্যেকেই নিশ্চয় লক্ষ করে দেখেছেন কিছু কিছু ইউরোপীয় দেশ এই সমস্যার কি ভাবে সমাধান করছে। যদিও আমাদের আদর্শ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তবু সব দিক থেকে বিবেচনা করলে এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিজ্ঞানসম্মত সর্বাত্মক প্রশিক্ষণ আমাদের কর্মীদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু নাৎসীদের লেবার সার্ভিস কোরের মতো প্রতিষ্ঠানকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। প্রয়োজনমতো রদবদল করে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ভারতের পক্ষেও হিতকর হতে পারে।

আমাদের নিজেদের পার্টির মধ্যে নিয়মনিষ্ঠা প্রবর্তনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটি সমস্যা বিবেচনা করতে হবে যে সমস্যা আমাদের অনেকেরই দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। আমি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কিষাণসভার মতো প্রতিষ্ঠানের এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা বলছি। এই প্রশ্নে বিরুদ্ধে চিন্তার দুটি দল আছে— যাঁরা কংগ্রেসের বাইরেকার যাবতীয় প্রতিষ্ঠানকে নস্যাৎ করে থাকেন এবং যাঁরা তাদের সমর্থন করেন। আমার নিজস্ব মত, অগ্রাহ্য করে বা ধিক্কার দিয়ে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে আমরা বিলোপ করতে পারব না। তারা রয়েছে বাস্তব সত্য, এবং যেহেতু তারা অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং বিলীন হয়ে যাবার কোনও লক্ষণই তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না, তাদের পিছনে যে একটা ঐতিহাসিক আবশ্যকতা আছে সেইটেই প্রণিধানযোগ্য। এ ছাড়া, অন্যান্য দেশেও এই ধরনের সংগঠন দেখা যায়। আমরা চাই বা না চাই, এদের অস্তিত্বের সঙ্গে

আমাদের বোঝাপড়া করে নিতেই হবে। একমাত্র প্রশ্ন, কংগ্রেস এদের সঙ্গে কি প্রকার আচরণ করবে। স্পষ্টতই এইসব সংগঠন—যে কংগ্রেস রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য গণসংগ্রামের মুখপাত্র—সেই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেবে না। অতএব তাদের উচিত কংগ্রেস আদর্শে ও পদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করা। যাতে তা সম্ভব হয়, বহুসংখ্যক কংগ্রেস কর্মীর ট্রেড ইউনিয়নে ও কৃষক সংগঠনগুলিতে যোগ দেওয়া উচিত। ট্রেড ইউনিয়নের কাজে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়, সহজেই এ কাজ করা যেতে পারে, এবং তার জন্য কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতির মধ্যে পড়তে হবে না। কংগ্রেসের সঙ্গে অপর দুটি সংগঠনের সহযোগিতা সুগম করা যেতে পারে যদি শেষোক্ত সংগঠনগুলি শ্রমিক ও কৃষকদের মুখ্যত অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে লিপ্ত থাকে এবং যারাই দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়াসী তাদের সবাকার সাধারণ মঞ্চ হিসেবে কংগ্রেসকে মেনে নেয়।

এর থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে শ্রমিক কৃষক সংগঠনগুলিকে সামূহিকভাবে সম্বন্ধ করার বিতর্কিত প্রশ্নে আসতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এমন একদিন আসবে যখন কংগ্রেসের প্রভাবে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে যাতে সমস্ত প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনগুলিকে একত্রিত করা যায়, সেইজন্য সম্বন্ধ করার অনুমতি আমাদের দিতে হবে। কি পদ্ধতিতে এবং কতখানি এই সম্বন্ধীকরণ অনুমোদন করা যেতে পারে সে বিষয়ে অবশ্যই মতপার্থক্য থাকবে। অনুমোদন করার আগে এই ধরনের সংগঠনের চরিত্র ও স্থায়িত্ব পরীক্ষা করে দেখতে হবে। রাশিয়ায় শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সোভিয়েত যুক্তফ্রন্ট অক্টোবর বিপ্লবে প্রধান অংশ গ্রহণ করে— কিন্তু, বিপরীতপক্ষে, গ্রেট ব্রিটেনে দেখি লেবার পার্টির ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভের উপর ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রভাব নিতান্তই পরিমিত। ভারতের ক্ষেত্রে আমাদের ভালভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং কিষাণসভার মতো সংগঠনগুলি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উপর কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে এবং আমরা এ কথা যেন ভুলে না যাই যে, প্রথমোক্ত সংগঠনগুলির প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগ যদি জড়িত না থাকে তাহলে তাদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকারই সম্ভাবনা। যাই হোক না কেন, সামূহিকভাবে সম্বন্ধ করার প্রশ্ন বাদ দিলেও, জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা বিধেয় এবং এই লক্ষ্য সুগম হবে যদি শেষোক্ত সংগঠনগুলি প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানের নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করে।

কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির মতো একটি পার্টি গঠনের প্রশ্নে বহু বিতর্ক হয়ে গেছে। আমি কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির হয়ে কিছু বলছি না। আমি ওই পার্টির সদস্যও নই। তা সত্ত্বেও আমাকে বলতেই হবে যে, ওই পার্টির সাধারণ তত্ত্ব ও নীতির সঙ্গে গোড়া থেকেই আমি একমত। প্রথমত, একটি পার্টির মধ্যে বামপন্থীদের সংহত হওয়া সত্যই কাম্য। দ্বিতীয়ত, বামপন্থী একটা ব্লক থাকার সার্থকতা তখনই, যখন তার প্রকৃতি হয় সমাজতান্ত্রিক। অনেক বন্ধু এইরকম ব্লককে পার্টি বলাতে আপত্তি করছেন, তবে আমার মনে হয় ওই ব্লককে গ্রুপ লিগ বা পার্টি, যাই বলা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে যে সীমা নির্দিষ্ট আছে তার মধ্যে একটি বামপন্থী ব্লকের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করা খুবই সম্ভব, সেক্ষেত্রে তাকে গ্রুপ লিগ বা পার্টি নিশ্চয় বলা যেতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বা ওই ধরনের অন্য যে কোনও পার্টির ভূমিকা হওয়া উচিত বামপন্থী উপদলের মতো। আমাদের আপাতত সমস্যা সমাজতন্ত্র নয়— তা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশকে সমাজতন্ত্রের জন্যে প্রস্তুত হতে সমাজতান্ত্রিক প্রচারের প্রয়োজন আছে। এবং সেইমতো

প্রচারের কাজ চালাতে পারে কেবলমাত্র কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির মতো সংগঠন, যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সমাজতন্ত্রের জন্য কৃতসংকল্প।

একটি সমস্যা আছে, যে সম্পর্কে কয়েক বৎসর ধরে ব্যক্তিগতভাবে আমি গভীর আগ্রহী এবং সে সম্পর্কে আমি কিছু নিবেদন করতে চাই। আমার বক্তব্য ভারতের বৈদেশিক নীতির ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে। আমি এই কাজের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করি কারণ আমার বিশ্বাস আগামী কয়েক বৎসরে আন্তর্জাতিক পরিণতি ভারতে আমাদের সংগ্রামকে সহায়তা করবে। কিন্তু প্রতিটি পর্যায়ে বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে এবং কিভাবে তার সুযোগ নেওয়া যায় তাও আমাদের জানতে হবে। দৃষ্টান্তরূপে আমাদের সামনে রয়েছে মিশরের শিক্ষা। মিশর বিনা অস্ত্রে গ্রেট ব্রিটেনকে মৈত্রী সন্ধিতে আবদ্ধ করতে পারল, যেহেতু তার জানা ছিল, কি করে ভূমধ্যসাগরে ইঙ্গ-ইতালীয় মনকষাকষির সুযোগ নিতে হয়।

আমাদের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে প্রথমে যে পরামর্শ আমি দিতে চাই তা এই যে, কোনও দেশের আভ্যন্তরিক রাজনীতি দ্বারা বা তার রাষ্ট্রের কী রূপ তার দ্বারা আমরা যেন প্রভাবিত না হই। সব দেশেই এমন নরনারী আমরা দেখতে পাব যাদের নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক, তারা ভারতের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিশীল। এই বিষয়ে সোভিয়েত কূটনীতির কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। সোভিয়েত রাশিয়া যদিও কমিউনিস্ট রাষ্ট্র, অসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে তার কূটনীতিবিদরা দ্বিধা করেনি এবং সহানুভূতি বা সমর্থন, যেখান থেকেই আসুক না কেন, ফিরিয়ে দেয়নি। অতএব আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত যেন প্রতিটি দেশে ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নরনারীদের নিয়ে চক্র গঠন করা হয়। এই ধরনের চক্র গঠন ও তার বিকাশ সাধন করতে বৈদেশিক পত্রপত্রিকা, ভারতের চলচ্চিত্র ও শিল্প-প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রচার বিশেষ সহায়ক হবে। যেমন চিনেরা তাদের শিল্প প্রদর্শনী মারফত ইউরোপে নিজেদের দারুণ জনপ্রিয় করে তুলেছে। সবার উপরে, ব্যক্তিগত সংযোগেরও দরকার। ব্যক্তিগত সংযোগ না থাকলে অন্যান্য দেশে ভারতকে জনপ্রিয় করে তোলা কঠিন হবে। এই কাজে বিদেশে যে সকল ভারতীয় ছাত্র আছে তারা সাহায্য করতে পারে, অবশ্য ভারতে থেকে আমরা যদি তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনের দিকে নজর রাখি। বাইরের ভারতীয় ছাত্ররা এবং দেশের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা উচিত। ভারতে তোলা সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র আমরা যদি বাইরে পাঠাতে পারতাম, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি বাইরের লোকেরা ভারতকে ও তার সংস্কৃতিকে জানতে পারত এবং জেনে সমাদর করত। অন্যান্য দেশে যে সকল ভারতীয় ছাত্র ও বসবাসকারী ভারতীয় আছে এবং যারা এখন আমাদের বেসরকারি দূতের মতো, এই ধরনের চলচ্চিত্র তাদের খুবই কাজে লাগবে।

প্রচার কথাটা আমার পছন্দ হয় না—কথাটায় একটা মিথ্যাভাব জড়িত আছে। কিন্তু আমি বিশেষভাবে বলতে চাই, ভারতকে ও তার সংস্কৃতিকে যাতে সারা দুনিয়া জানতে পারে সেদিকে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। আমি এ কথা বলছি, তার কারণ আমি জানি, এরকম প্রচেষ্টাকে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক দেশ স্বাগত জানাবে। এই কাজে যদি আমরা অগ্রসর হই, তাহলে বিভিন্ন দেশে আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রদূতাবাস ও বৈদেশিক প্রতিনিধির জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করতে পারব। গ্রেট ব্রিটেনকে অবহেলা করা আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না। এমনকী ও দেশেও স্বল্পসংখ্যক অথচ প্রভাবশালী একদল নরনারী আছেন যাঁরা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি যথার্থই সহানুভূতিশীল। যে তরুণ সমাজ সদ্য জাগছে তাদের মধ্যে এবং বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ এবং ভারতের প্রতি সহানুভূতি দ্রুত বাড়ছে। গ্রেট

ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একবার ঘুরে দেখলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে।

এই কাজ সার্থকভাবে চালিয়ে যেতে হলে ইউরোপে এশিয়ায়, আফ্রিকায় এবং উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি থাকা দরকার। দুঃখের কথা যে আমরা এতাবৎকাল মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাকে অবহেলা করে এসেছি অথচ ভারত সম্পর্কে তারা গভীর আগ্রহী। আন্তর্জাতিক সংযোগ বর্ধনের কাজে কংগ্রেসের সহায়তা করতে পারে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজ করছে এমন সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপৃত ভারতীয় বণিক সভা (ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স)। এ ছাড়া ভারতীয়দের অবশ্যকর্তব্য হবে প্রতিটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেস বা সম্মেলনে যোগদান করা; এই সব সম্মেলনে অংশগ্রহণের ফলে ভারতের পক্ষে যে প্রচার হয় তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সুস্থ।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমার উচিত কারও কারও মনে যে সন্দেহ জাগতে পারে তা দূর করা। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা মানে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা নয়। আমাদের এইরূপ ষড়যন্ত্র করার কোনও দরকার নেই, কারণ আমাদের যা কিছু কার্যপদ্ধতি সবই প্রকাশ্য। পৃথিবীব্যাপী ভারতের বিরুদ্ধে যে প্রচার চলে আসছে তার সারমর্ম এই যে, ভারতবর্ষ একটি অসভ্য দেশ, এবং তাই থেকেই ধরে নেওয়া হয়, আমাদের সভ্য করার জন্যে ব্রিটিশের থাকা দরকার। এর জবাবে আমাদের দিক থেকে দুনিয়াকে জানানো দরকার, আমরা কী এবং আমাদের সংস্কৃতি কি রকম। আমরা যদি তা করতে পারি, আমাদের সপক্ষে আন্তর্জাতিক সহানুভূতি এত বিপুল পরিমাণে আমরা গড়ে তুলতে পারব যে, দুনিয়ার দরবারে ভারতের দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে।

এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে— বিশেষত জাঞ্জিবর, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয় ও সিংহলে— আমাদের দেশবাসীকে যে সকল সমস্যা, দুর্ভোগ ও দুর্বিপাকের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সে সম্পর্কে উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অনুচিত। কংগ্রেস তাঁদের বিষয়ে সর্বদাই গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেখাবে। আমরা যদি তাঁদের জন্যে আরও বেশি কিছু না করে থাকি, তার কারণ আমরা স্বদেশে এখনও গোলাম হয়ে রয়েছি। স্বাধীন ভারত বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি সুস্থ ও প্রবল শক্তিরূপে দেখা দেবে এবং তখনই তা বিদেশে তার দেশবাসীদের স্বার্থ তদারক করতে সমর্থ হবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে, যেমন পারস্য, আফগানিস্তান, নেপাল, চিন, বর্মা, শ্যাম, মালয় যুক্তরাষ্ট্র, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও সিংহলের সঙ্গে নিকটতর সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ গড়ে তোলা যে প্রয়োজন ও অভিপ্রেত সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করছি। তাঁরা যদি আমাদের আরও বেশি জানেন এবং আমরা যদি তাঁদের আরও বেশি করে জানি, আমাদের উভয়েরই তাতে ভাল। বিশেষ করে বর্মা ও সিংহলের সঙ্গে যুগযুগব্যাপী আমাদের যে পারস্পরিক সম্বন্ধ চলে এসেছে সেই কথা স্মরণ করে তাঁদের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত।

বন্ধুগণ, আমি দুঃখিত, প্রথমে আমি যতখানি সময় নেব ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি আপনাদের সময় নিয়ে ফেলেছি, তবে আমি আমার ভাষণের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনও আছে যার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই— এটি রাজনৈতিক কয়েদি ও রাজবন্দিদের মুক্তির প্রশ্ন। সাম্প্রতিক অনশন ধর্মঘটের ফলে এই প্রশ্ন প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জনসাধারণের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। আমার বিশ্বাস, যখন আমি বলছি এঁদের মুক্তি ত্বরান্বিত করতে মানুষের সাধ্যায়ত্ত যা কিছু সম্ভব সব করা হবে, তখন আমি কংগ্রেসের অন্তত সাধারণ কর্মীদের মনের কথাই বলছি। কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী সম্পর্কে এ কথা বলে রাখা ভাল যে, তাঁদের মধ্যে কারও কারও কাজের রেকর্ড সাধারণের

আশানুরূপ হয়নি। তাঁরা যত শীঘ্র সাধারণের দাবি পূরণ করতে পারবেন, কংগ্রেসের পক্ষে এবং যে সকল প্রদেশের শাসনভার অকংগ্রেসি মন্ত্রিসভার উপরে, সেখানকার জনসাধারণের পক্ষে তত ভাল হবে। আমার পক্ষে এই প্রসঙ্গে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন এবং আমি মনেপ্রাণে আশা করি যে, নিকট ভবিষ্যতে এই বিষয়ে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির কার্যকলাপ সম্পর্কে জনসাধারণের অনুযোগের কিছু থাকবে না।

জেলে ও অন্তরীণ অবস্থায় যে সকল রাজবন্দি ও রাজনৈতিক কয়েদিরা আছেন কেবলমাত্র তাঁদেরই কাহিনী দুঃখের নয়। যাঁরা ছাড়া পেয়েছেন তাঁদের ভাগ্যও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেশি আশাপ্রদ নয়। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে, যক্ষ্মার মতো মারাত্মক রোগাক্রান্ত হয়ে প্রায়ই তাঁরা ঘরে ফিরে আসেন। তাঁদের সামনে নির্মম অনাহারের বিভীষিকা, যারা তাঁদের আপনার জন, যারা প্রিয়জন, তারা হাসিমুখে তাঁদের অভ্যর্থনা করে না, অভ্যর্থনা করে চোখের জল দিয়ে। যাঁরা দেশের সেবায় তাঁদের সর্বস্ব উৎসর্গ করছেন এবং বিনিময়ে দারিদ্র্য ও দুঃখ ছাড়া কিছুই পাননি তাঁদের প্রতি আমাদের কি কোনওই কর্তব্য নেই? অতএব যাঁরা দেশকে ভালবাসার অপরাধে নিগৃহীত হয়েছেন, আসুন, তাঁদের সকলের প্রতি আমরা আমাদের সহৃদয় সহানুভূতি জানাই এবং তাঁদের দুর্দশা লাঘবের জন্য আমরা সবাই সাধ্যমতো সাহায্য করি।

বন্ধুগণ, আরেকটি কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আজ আমরা দারুণ এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। কংগ্রেসের ভিতরে বাম ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তা অগ্রাহ্য করে লাভ নেই। বাইরে রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হুমকি, যার মোকাবিলা আমাদেরই করতে হবে। এই সংকটে আমাদের করণীয় কী? এ কথা বলার কি দরকার আছে যে, আমাদের পক্ষে ঝড়ঝঞ্ঝা যাই আসুক সবকিছুর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে এবং আমাদের শাসকদের যত কিছু কূটচাল সব আমাদের উপেক্ষা করতে হবে? কংগ্রেস আজ গণসংগ্রামের একমাত্র মোক্ষম হাতিয়ার। এতে দক্ষিণপন্থী ব্লক, বামপন্থী ব্লক থাকতে পারে— তা সত্ত্বেও ভারতের মুক্তিপ্রয়াসী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যত সংগঠন আছে তাদের সবার সাধারণ মঞ্চ কংগ্রেসই থাকবে। অতএব, আসুন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে সারা দেশকে সমবেত করি। বিশেষ করে আমি দেশের বামপন্থী দলগুলির কাছে আবেদন জানাতে চাই, কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে এবং ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভিত্তিতে পুনঃসংগঠিত করতে তাঁরা যেন যথাশক্তি ও যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করেন। এই আবেদন করার সময় আমি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মনোভাবে অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করছি। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁদের পার্টির সাধারণ নীতির সঙ্গে, আমার মনে হয়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নীতির সঙ্গতি আছে।

পরিশেষে, আপনাদের মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করে বলতে চাই, সারা ভারত মনেপ্রাণে আশা করে ও প্রার্থনা করে, আমাদের জাতির কাছে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতি আগামী আরও অনেক অনেক বৎসর স্থায়ী হোক। ভারত তাঁকে এখন হারাতে পারে না, এই মুহূর্তে তো কিছুতেই না। আমাদের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্যে আমাদের তাঁকে দরকার। আমাদের সংগ্রামকে ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখার জন্য আমাদের তাঁকে দরকার। ভারতের স্বাধীনতার মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আমাদের তাঁকে দরকার। এর চেয়েও বড় কথা— মানবতার আদর্শের জন্য আমাদের তাঁকে দরকার। আমাদের যে সংগ্রাম তা কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই নয়, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও, যার প্রধান স্তম্ভ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। আমরা তাই একমাত্র ভারতের জন্যই সংগ্রাম করছি না, বিশ্বমানবতার জন্যও আমাদের সংগ্রাম। বিমুক্ত ভারত অর্থ মানবজাতির মুক্তি।

বন্দে মাতরম।

পৌর সমাজতন্ত্র

বোম্বাই করপোরেশনে প্রদত্ত ভাষণ, ১০ মে ১৯৩৮

মেয়র মহোদয়, করপোরেশনের সদস্যগণ এবং বন্ধুগণ,

আজকের এই অপরাহ্ণে আপনারা আমাকে যে বিরাট সম্মানে অভিনন্দিত করেছেন তার জন্য অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এতটা দাম্ভিক নই যাতে এই বিরাট সম্মানের যোগ্য বলে নিজেকে মনে করতে পারি। অপরপক্ষে আমি মনে করি, আমার সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও আজকের এই অপরাহ্ণে নিছক একটি প্রতীকরূপে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়েছি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এবং ভারতের জনসাধারণের সেবকরূপে আমি এখানে এসেছি।

মেয়র মহাশয়, আপনার সহৃদয় বাণী আপনার অন্তঃকরণের মহানুভবতা ও উদারতার পরিচায়ক। আমি ধরে নিচ্ছি অন্তঃকরণের এই মহানুভবতা ও উদারতা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি এবং সেই আন্দোলনের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সবার প্রতি আপনার প্রকৃত মনোভাব জ্ঞাপন করছে। আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্যে রয়েছি। আপনি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির কথাও উল্লেখ করেছেন। সেদিন আর নেই যখন ভারত বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দেশ ছিল। আজকের দিনে, বৈজ্ঞানিক অবদানে এবং আমাদের জ্ঞানগত ও নীতিগত উন্নতির ফলে, সারা পৃথিবী একটি অপৃথক সত্তায় পরিণত হয়েছে। আজকের দুনিয়ার দূরতম প্রান্তে যা ঘটে, সারা পৃথিবীময় তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অতএব ভারতের একটি শহরে আমরা যা সম্ভব করি, তার গুরুত্ব কেবলমাত্র সেই শহরেই আবদ্ধ থাকে না, তাই বা কেন, কেবলমাত্র সেই দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না, আমার মনে হয়, সমস্ত মানবজাতির কাছে তার গুরুত্ব থাকে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক ব্যাপারেই নয়, পৌর ব্যাপারেও তা সত্য। আমার মনে পড়ে, ইউরোপে যে কয়েক বছর আমার থাকার সুযোগ হয়েছিল, সে সময় সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তুগুলির মধ্যে অন্যতম যা আমার নজরে পড়েছিল তা ভিয়েনার সমাজতান্ত্রিক পুরসভার কীর্তি। আমার বিশ্বাস ওই পুরসভার কিছু কার্যকলাপ দেখার যাঁরা সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা যে জাতির হোন না কেন, তাঁদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি এই দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে ফিরে যাননি যে, এখানে যা সম্ভব করে তোলা হয়েছে তার তাৎপর্য ও গুরুত্ব পৌরকল্যাণে আগ্রহী যে কোনও মানুষের কাছে খুবই বেশি। ভিয়েনা পুরসভা বারো বছরের মধ্যে কমপক্ষে ২,০০,০০০ লোকের বাসস্থানের সংস্থান করে এবং ২,০০,০০০ লোকের এই বাসের সংস্থান করতে অতিরিক্ত কর আরোপ করতে হয়নি এবং কর্জও করতে হয়নি। সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেছে রাজস্ব এবং সেই রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে আমোদ-প্রমোদের উপর কর ধার্য করে। আমরা জানি এদেশেও আমোদ-প্রমোদের উপর কর আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শহরগুলি সেই কর থেকে কোনওভাবেই উপকৃত হয় না। আমাকে যা সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে তা এই ঘটনা, একটি শহরে এত বড় একটা ব্যাপার করা যেতে পারে অতিরিক্ত করের বোঝা না চাপিয়ে বা কর্জ না করে। এই জন্যেই আমি বলতে চেয়েছিলাম, একটি শহরে আপনারা যদি কিছু সম্ভবপর করে তুলতে পারেন, সারা দুনিয়ার কাছে তার তাৎপর্য ও গুরুত্ব থেকে যাবে।

খুবই আনন্দের কথা যে, বোম্বাইয়ে আপনারা সীমিত ভোটাধিকার বিলোপ করেছেন, বয়স্কদের ভোটাধিকার দিতে চলেছেন এবং মনোনয়ন মারফত নির্বাচনকে বাতিল করেছেন। আবার আমি বলছি, এর তাৎপর্য কেবলমাত্র বোম্বাই শহরের কাছেই নেই, সারা ভারতের

কাছেও আছে এবং সম্ভবত ভারতের মতো অবস্থাধীন অন্যান্য দেশের কাছেও আছে। আমি মনে করি, এই পরিবর্তন সূচনা করার জন্যে বর্তমান বোম্বাই সরকারকে আমাদের অভিনন্দন জানানো উচিত। আমরা সবাই আশা করি, অন্যান্য শহর, বিশেষত ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলি এই বিষয়ে বোম্বাইয়ের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং মনোনয়ন ব্যবস্থা বাতিল করে বয়স্ক-ভোটাধিকার প্রবর্তন করবে।

মেয়র মহাশয়, সমুদ্র-পরিবৃত বোম্বাই শহরের অবস্থান চমৎকার। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝখানে এই শহর অবস্থিত এবং বোম্বাইয়ের রাস্তাঘাট, ইমারত— অন্ততপক্ষে সচ্ছল ও বর্ধিষ্ণু অংশের রাস্তাঘাট, ইমারত— পৃথিবীর যে কোনও শহরের সমগোত্রীয় হিসেবে তুলনীয়; কিন্তু তা এর একটিমাত্র দিক। আমরা ভুলতে পারি না এই শহরের দারিদ্র্যের কথা এবং যে সব বস্তিতে আমাদের গরিব দেশবাসীদের বাস করতে হয় তার কথা। অতএব, আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে যে অংশ দরিদ্রতর এবং কম ভাগ্যবান তাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান দেশবন্ধু সি. আর. দাশ একদা বলেছিলেন, পৌর প্রতিষ্ঠানের আদর্শ হওয়া উচিত সেই প্রতিষ্ঠানকে গরিবের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং কলকাতার মেয়ররূপে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় তিনি দরিদ্রসেবার এক কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। অনেক দিক থেকে কর্মসূচিটি আদর্শ কর্মসূচি ছিল এবং কলকাতা করপোরেশনকে ও পরোক্ষভাবে অন্যান্য পৌরসংস্থাকেও তা অনুপ্রাণিত করে। আমি মনে করি, আমাদের পৌরসংস্থাগুলিকে প্রকৃতপক্ষে গরিবের প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করতে হলে আমাদের এখনও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। বহু কাজ করার আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে দরকার দরিদ্রসেবার প্রেরণা, উৎসাহ ও অনুরাগ। এই উৎসাহ ও অনুরাগ চালিকাশক্তি হয়ে আমাদের সেবার পথে নিয়ে যাবে এবং পৌরসংস্থাগুলিকে দরিদ্রের প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত করতে আমাদের সহায়ক হবে। মহাশয়, এই বোম্বাই শহরে আপনারা অনেক বিষয়ে, বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, অনেক কিছু করেছেন। শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আপনারা যা করেছেন তা বোম্বাই শহরবাসীদের অশেষ উপকার সাধন করেছে এবং অন্যত্র যাঁদের উপর পৌর প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব আছে তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছে। আমি আশা করি, আপনারা এরই মধ্যে যা করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবেন না এবং আপনাদের পৌর প্রতিষ্ঠানকে আদর্শ সংস্থায় পরিণত করার জন্য আপনারা দ্রুত সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবেন।

পৃথিবীর সর্বত্র পৌর প্রগতি যে লক্ষ্যের দিকে চলেছে তাকে বলা যেতে পারে মিউনিসিপাল বা পৌর সমাজতন্ত্র। "সমাজতন্ত্র" এমন একটি কথা যা অনেকের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করে, কিন্তু আমার বিশ্বাস সমাজতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে কী করতে চায়, এবং বিশেষ করে পৌর সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য কী তা যদি আমরা বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করি তা হলে কথাটা থেকে দূরে থাকার কোনও কারণ থাকে না। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা পৌর সমাজতন্ত্রের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি। আজকের দিনে একালের প্রত্যেক পুরসভা এমন অনেক দায়িত্ব বহন করছে, বিশ বা ত্রিশ বৎসর আগে যা চিন্তার অতীত ছিল। বলা যেতে পারে, এই সব সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্বের ক্ষেত্র দিনে দিনে প্রসার লাভ করছে। আজকালকার পুরসভা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট, আলো ইত্যাদির ব্যবস্থাই করে না, তাকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়, জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় এবং শিশুমৃত্যু ও প্রসূতিসমস্যা, জলনিকাশ ও অনুরূপ যে সকল সমস্যার দায় তার উপর থাকে সে সব সম্পর্কে কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত পুরসভাগুলিকে চিন্তা করতে হত না। ভবিষ্যতে কোথায় যে সীমারেখা টানবেন বলা দুষ্কর। আপনারা হয়তো জানেন বার্মিংহাম পুরসভার একটি পৌর ব্যাঙ্ক আছে এবং পাশ্চাত্ত্য দেশে এমন পৌর প্রতিষ্ঠান আছে আছে যারা যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে, কয়েক দশক আগে

তা কেউ শোনেনি এবং চিন্তার অতীত ছিল। এই কারণেই আমি বলছি আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পৌর সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। পৌর সমাজতন্ত্র সমগ্র সম্প্রদায়ের সেবার জন্য সামগ্রিক প্রয়াস ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের এই লক্ষ্য স্থির রেখে আমরা যদি করণীয় কাজে আত্মবিনিয়োগ করি এবং সন্তোষজনকভাবে কর্তব্য পালন করি তা হলে আমরা কেবল আমাদের শহরগুলির সেবাই করব না, মানবতার আদর্শকেও সেবা করব। আমরা, যারা পৌর বিষয়ে আগ্রহী, আমরা কেবল নিজেদের পুরসভাগুলি থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করি না। আমরা ইউরোপে, আমেরিকায়, সুদূর প্রাচ্যের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে সেখানকার পৌর সমস্যা সম্পর্কিত সংবাদ আহরণ করি ও বইপত্র পাঠ করি যাতে আমরা আরও দক্ষতার সঙ্গে ও সন্তোষজনকভাবে আমাদের শহরগুলিতে কাজ করে যেতে পারি। এই কারণেই আমি বিশেষভাবে বলেছি যে, আপনারা বোম্বাই শহরে যা করতে পেরেছেন তা কেবলমাত্র আপনাদের নাগরিক ভ্রাতাদের জন্যই করেননি, তার আরও ব্যাপক তাৎপর্য আছে।

পৌর সংস্থাগুলিতে যোগদান করে আমরা যে সকল সুযোগ পাই, যেমন পৌর সেবার সুযোগ, তা ছাড়াও এই সংস্রবের ফলে আমরা সুনিশ্চিতভাবে একদিক থেকে লাভবান হতে পারি। তা এই, এই সংস্থাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমাদের কাজ জনজীবনের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপকতর কর্তব্য পালনের জন্য যোগ্য করে তোলে। যতদূর মনে হয় ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের অন্যতম ব্রাইস বলেছিলেন, গণতন্ত্রের প্রকৃত শিক্ষালয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। প্রফেসার ল্যাস্কি ও আরও অনেকে একই কথা বলেছেন। যাঁরা রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করেন এবং পৌর বিষয়ে যাঁরা ছাত্র, আজ তাঁরা বোধ করেছেন যে গণতন্ত্রের প্রকৃত শিক্ষালয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। অতএব স্থানীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে আমরা দু' রকমের সুবিধা অর্জন করি।

একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। বিদেশিদের কাছ থেকে প্রায়শই আমরা শুনতে পাই, এদেশে সামাজিক অগ্রগতির অন্যান্য প্রয়াসের মতো পৌর উন্নয়নও পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের ফল এবং ইউরোপের সঙ্গে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে আমাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রব হবার আগে পৌর-জীবনের অগ্রগতির দিকে যা হয়েছিল তা যৎসামান্য। মহাশয়, এই অভিযোগ যে একেবারে মিথ্যা, এই সুযোগে আমি তা বলতে চাই। পৌর-প্রগতির ক্ষেত্রে আমরা শূন্য থেকে কিছু তৈরি করছি না, আমরা গড়ে তুলছি সুপ্রাচীন এক ভিত্তির উপর। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রেও আমরা যেমন অতি প্রাচীন ভিত্তির উপর নতুন বনিয়াদ গড়ে তুলছি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রেও আমরা একই কাজ করে চলেছি। মহেঞ্জোদারোর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে যে কেউ বুঝতে পারবেন এই প্রাচীন দেশে আমাদের পূর্বপুরুষরা পৌর-জীবনের কোন উচ্চ স্তরে উপনীত হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন। এবং মহেঞ্জোদারো যুগের পরে যদি আপনারা মৌর্য সাম্রাজ্যে আসেন এবং সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রের বর্ণনা ও পুঁথিপত্র পাঠ করেন, আপনারা তা হলে দেখতে পাবেন, শহর পাটলিপুত্র কেবলমাত্র উন্নতির পরাকাষ্ঠায় পৌঁছয়নি, শহরের পৌর-শাসনের উপর ছিল অনেক দায়িত্বভার, যার সঙ্গে আধুনিক যে কোনও পুরসভার দায়িত্বের ভালমতো তুলনা করা যেতে পারে। মেয়র এবং অন্যান্য আধুনিক পৌরবিষয়ক পরিভাষার মতো প্রতিশব্দ আপনারা আমাদের প্রাচীন ভাষায় পাবেন। এককালে সেগুলির চল ছিল। তারপরে এল ভারত-ইতিহাসে যাকে বলা যেতে পারে অন্ধকার যুগ। এই অন্ধকার যুগে কেবলমাত্র পৌর-প্রগতিই প্রতিহত হল না, জাতীয় জীবনের অন্যান্য বিভাগও পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু এই অন্ধকার যুগের জন্য এই সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না যে, তার পূর্বে আমরা পৌর-বিষয়ে কোনও উন্নতি লাভ করিনি। আমাদের দেশবাসীকে এই সব কথা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে,

যেহেতু দুর্ভাগ্যবশত যুগ যুগ ব্যাপী দাসত্বের ফলে আমরা আমাদের নিজেদের অতীতের কথা ভুলে গেছি। আমাদের নিজেদের পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণ অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে গবেষণা করে আমাদের কাছে আমাদের নিজেদের যে বিস্মৃত অতীতকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন, কেবলমাত্র তারই কল্যাণে আমরা এখন জানতে পারছি আমাদের পূর্বপুরুষেরা পৌর-জীবনের ক্ষেত্রে এককালে কী উন্নতিসাধন করেছিলেন। অতএব এ কথা আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে পৌর-প্রগতির দিক থেকে আমরা প্রাচীন ভিত্তির উপরেই নতুন বনিয়াদ গড়ে তুলছি। এই তথ্য, আশা করি, বর্তমানের ও ভবিষ্যতের সমস্যা সম্পর্কে আমাদের আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

মহাশয়, আমার উত্তর সংক্ষিপ্ত হবে বলে ভেবেছিলাম। ভয় হচ্ছে, তা একটা দীর্ঘ উপদেশের আকার নিয়েছে। উপদেশবাণী দেবার ইচ্ছা মোটেই আমার ছিল না। আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম একটিমাত্র ইচ্ছা নিয়ে, আপনারা আমাকে যে বিপুল সম্মানে ভূষিত করেছেন, যে সম্মান, আমি মেনে নিচ্ছি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরই প্রাপ্য, যার আমি সামান্য সেবক মাত্র, সেই সম্মানের জন্য আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে প্রথমত আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে। সর্বান্তঃকরণে আমি আশা করব আপনার এই শহর দিনে দিনে পৌর-জীবনের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করুক এবং এদেশের ও বিদেশের অন্যান্য পৌরসংস্থার কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে দুরূহ দায়িত্ব পালনে আপনি এবং আপনার পুর প্রতিষ্ঠান সাফল্য লাভ করুন, এই কামনা করি। অন্তরের অন্তস্তল থেকে আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

চিনে কংগ্রেসের চিকিৎসা মিশন প্রেরণ

সুভাষচন্দ্রের প্রকাশ্য বিবৃতি ও আবেদন

২৮ জুন ১৯৩৮

ভারতে চিনা দূতাবাস আমাকে জানিয়েছে যে চিন সরকার চিনদেশে একটি অ্যাম্বুলেন্স দল পাঠাবার যে প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি করেছে তাতে সম্মতি জানিয়েছে। এখন আমাদের কাজ আমাদের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসা মিশন প্রেরণ করা।

১২ জুন সারা দেশে নিখিল ভারত চিনা দিবস সফলভাবে পালিত হয়েছে। সেদিন জনসাধারণের চমৎকার সাড়ার জন্যে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তবে, দুঃখের বিষয় সময়ের স্বল্পতার কারণে সে-উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ সন্তোষজনক হয়নি। দেশের বিভিন্ন অংশে বন্ধুরা প্রস্তাব করেছেন, জুলাই মাসের কোনও একটি কিংবা একাধিক দিন শুধুমাত্র আমাদের চিকিৎসা মিশনের জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই নির্দিষ্ট করা হোক।

অতি প্রয়োজনীয় অর্থভাণ্ডার

প্রস্তাবটি আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি এবং ৭, ৮, এবং ৯ জুলাই চিনের জন্যে 'অর্থভাণ্ডার দিবস' হিসাবে নির্ধারিত করেছি। ৭, ৮ এবং ৯ জুলাই চিনা জাতির পক্ষে অতিশয় ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ তারিখ। আমি সমগ্র দেশে কংগ্রেস সংগঠন সমূহের প্রতি অনুরোধ জানাই, এই দিনগুলিতে অর্থ সংগ্রহের জন্যে তাঁরা প্রবল অভিযান চালান। সংগৃহীত সমস্ত অর্থ এলাহাবাদে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া উচিৎ। আমরা যেন মনে রাখি, সেই উপলক্ষে আমাদের ২২,০০০ টাকা সংগ্রহ করতে হবে।

ওই দিনগুলিতে যদি আমরা ছোট ছোট চিনা পতাকা বিক্রয় করি তাতে চিনা জাতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার পরিচয় দেওয়া হবে, এবং অর্থ সংগ্রহেও যথেষ্ট সহায়তা হবে। বড় শহরে এতে ভাল কাজ হবে, এবং আমার আশা যেখানেই হোক না কেন, দিন তিনটি চায়না ফ্ল্যাগ ডে রূপে পালিত হবে।

যে-সব জায়গায় চায়না সাব কমিটির সদস্যেরা বাস করেন, তাঁরা স্থানীয় কংগ্রেস সংগঠনের সহযোগিতায় অর্থ সংগ্রহের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। বিশেষত বোম্বাইয়ে চায়না সাব কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত জি. পি. হাতিসিং-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করতে।

আমার আশা আমাদের সংগৃহীত অর্থ অন্তত এক বৎসর চিকিৎসা মিশনের কাজ চালাবার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির জন্য অর্ডার

পরিশেষে আমি সর্বসাধারণকে অবগত করতে চাই, ফোর্ড কোম্পানিকে সম্পূর্ণ সজ্জিত একটি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে। সেটিকে সোজা হংকং-এ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মহান চিনা জাতির এই ঘোর অন্ধকারতম দুর্দিনে তাদের প্রতি ভারতের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার এক চলমান প্রতীক হবে চিকিৎসা দল সহ এই অ্যাম্বুলেন্স। আমার ঐকান্তিক আশা ও বিশ্বাস জনসাধারণ যে-ভাবে সাড়া দেবেন সেটা কংগ্রেস এবং ভারতীয় জাতির যোগ্য হবে।

১২ অগাস্ট ১৯৩৮, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল-এ সুভাষচন্দ্রের ভাষণ*

ভারতে আমাদেরও নানা রকম অসুবিধা আছে। আমরা এই বেদনাদায়ক সত্যটির বিষয়ে অবহিত, যে চিনকে তার এই বর্তমান দুর্দিনে আমরা সামান্যই সাহায্য করতে সক্ষম। কিন্তু অন্তরে আমরা তাদের ব্যথার সাথী এবং আমাদের সহানুভূতির প্রতীক স্বরূপ একটি ছোট চিকিৎসা-মিশন আমরা চিনে পাঠাচ্ছি।

চিনে প্রেরিত এই চিকিৎসা-মিশনের কার্যকর মূল্য কী সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু এর একটি নৈতিক মূল্য আছে, কারণ মিশনটি যাচ্ছে চিনদেশে আমাদের ভ্রাতা-ভগ্নীদের প্রতি আমাদের সহানুভূতির একটি প্রতীক হিসাবে।

---

* পিপলস এডুকেশনের প্রধান এবং পলিটিক্যাল কাউন্সিল অব চায়নার সদস্য অধ্যাপক তাই-চি তাও-এর অভ্যর্থনা সভায় সুভাষ চন্দ্র বোস এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

আমার বিশ্বাস অধ্যাপক তাও এবং তাঁর স্বদেশবাসীরা জানেন কী আগ্রহ ও সহানুভূতি সহকারে ভারতে আমরা চিন দেশের সংঘর্ষের ঘটনাবলী অনুধাবন করে যাচ্ছি। চিনা জাতি এখন, যাকে বলা যায় তার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা অন্ধকার, দুঃসময়গুলির একটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান মুহূর্তে আমরা এবং বিশ্ববাসী যাই প্রত্যক্ষ করি না কেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, যে শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রামে চিনা জাতি জয়লাভ করবে, কারণ আমরা জানি চিনা সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীনতম এবং অতীতে চিনারা নানারকম বিপদ-আপদ অতিক্রম করে এসেছে। সে-সব ঝড়-ঝাপটা, মানবেতিহাসের উত্থান-পতন সত্ত্বেও চিনা জাতি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে সমগ্র মানবজাতির একটি লক্ষ্যের অভিমুখে। চিনা জাতির ঐতিহ্য এবং আজ আধুনিক চিনের যে শক্তি ও চরিত্র, তার জন্যেই চিন-জাপানের এই সংঘর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস এত দৃঢ়।

চিনে প্রেরিত কংগ্রেস চিকিৎসা মিশনের প্রতি সুভাষচন্দ্রের বিদায়বাণী

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস-সংগঠিত চিকিৎসা-মিশনের চিনযাত্রা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। স্বভাবতই আমাদের মন সেই অতীতের দিকে ধাবিত হয় যখন প্রথম বিদেশি কোনও জাতির সঙ্গে ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। চিনদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চিরকালই ঘনিষ্ঠ ও সৌহর্দ্যপূর্ণ। আমরা দুই জাতিই শান্তিপ্রিয়, এবং আমাদের দর্শন ও সংস্কৃতি পরস্পরের সগোত্র। অতীতের ভারতীয় ধর্মপ্রচারকদের মতো আমাদের চিকিৎসক দল এখন চিনে যাচ্ছেন, সেবার সদিচ্ছা ও প্রেমের প্রতিভূ রূপে। আমরা দুঃখিত অন্তঃকরণে এ বিষয়ে সচেতন এই চরম দুঃসময়ে চিনে প্রেরিত আমাদের উপঢৌকন যৎসামান্য ছাড়া কিছু নয়। তা হলেও, এই সামান্য উপঢৌকনের পিছনে আছে ভারতের মানুষের আত্মা। আমি নিশ্চিত, টেলিগ্রাফ যোগে আমি যে বার্তা আমাদের চিকিৎসা-মিশনের কাছে পাঠাচ্ছি, তাতে আমার সমগ্র দেশের অন্তরের বাণীই প্রতিধ্বনিত হবে। এ বড় সামান্য কথা নয়, যে আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত সাম্রাজ্যবাদ, স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং গভীর প্রোথিত শয়তানির শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। অতএব আসুন আমরা চিনে প্রেরিত আমাদের বেসরকারি রাষ্ট্রদূতদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাই, তাঁদের শুভযাত্রা কামনা করি, এবং প্রার্থনা করি তাঁদের মহান মিশনের সাফল্য।

ড. অটলের প্রতি বার্তা

চিনের ইতিহাসের এক মহাসংকটের সময়ে, যখন সে তার জীবন ও স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধে করছে, আপনাকে ও আপনার সহযোগীদের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পাঠাচ্ছে মহান চিনা জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত ভারতের শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ। আগামীকালের যাত্রায় অনেক অসুবিধা আপনাদের সহ্য করতে হবে। অনেক বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হবে। আপনাদের সাগ্রহ ন্যায়পরায়ণতায় প্রাচীন কালের ধর্মপ্রচারকগণের উদ্দীপনার সৌরভ বিদ্যমান। প্রার্থনা করি, আপনাদের কাজে আপনাদের দেশ গৌরবান্বিত হোক, এবং অন্য নিপীড়িত জাতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সহায়ক হোক। আপনাদের মহান দায়িত্ব পালন কর্মে সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি, কারণ তাতে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি পাবে। বন্দে মাতরম।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রসঙ্গে*

১

৯ জুলাই ১৯৩৮

মাঝে মাঝে ব্রিটিশ সংবাদপত্রে বিবৃতি বা বক্রোক্তি প্রকাশিত হচ্ছে যার মর্ম এই যে, কংগ্রেসের কিছু কিছু প্রভাবশালী নেতা ভারত সরকার আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উল্লেখ আছে তাই নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। আমার বিশ্বাস, শেষ যে বিবৃতিটি আমার চোখে পড়ে তা ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েনের এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। যখন কোনও প্রমাণ নেই, আমি বিশ্বাস করি না এবং বিশ্বাস করতেও পারি না যে, কোনও প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা কংগ্রেসের পশ্চাতে আপসে পৌঁছবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

একথা আমি বলতে চাই যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে কোনও মিল নেই এবং প্রদেশগুলিতে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণকে কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করার পক্ষে পদক্ষেপ বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। আমার মনে কোনওই সন্দেহ নেই, কংগ্রেসের উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো চাপিয়ে দেবার যে কোনও প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তা সফল হয়, তার ফলে কংগ্রেস ভেঙে যাবে, কারণ আমি বুঝি না কি করে যারা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী তারা তা মাথা নত করে মেনে নেবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ভারতের ইতিহাসের এই গুরুতর মুহূর্তে কংগ্রেস বা কংগ্রেসের কোনও অংশ যদি দুর্বলতা প্রদর্শন করে, তা হলে তা ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের বিশ্বাসঘাতকতা বলে পরিগণিত হবে। আজ সবদিক থেকে এমন সুবিধাজনক অবস্থায় আমরা রয়েছি যে আমরা যদি কেবল মিলিত হয়ে সমস্বরে নিজেদের কথা বলতে পারি তা হলে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আমাদের জাতীয় দাবির সবটাই আদায় করে নিতে সক্ষম হব। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে আমাদের মনোভাবে সামান্যতম দুর্বলতা দেখা দিলে আমাদের তা দুর্বল করতে ও ব্রিটিশ সরকারকে সবল করতে বাধ্য।

আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি, যদি সেই অভাবনীয় অবস্থা দেখা দেয় যখন কংগ্রেসের সংখ্যাধিক সদস্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে মেনে নেবে, সম্ভবত তখন আমার কর্তব্য হবে পদাধিকারের দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করা, যাতে আমি আমার মতে দেশের যা সর্বাধিক স্বার্থসংগত, যথা, উৎকট যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর খোলাখুলি, আপসহীন, ক্ষান্তিহীন বিরোধিতা—তার জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করে যেতে পারি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর নেতাজির প্রথম বিবৃতি দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে তুমুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিবৃতি প্রদান করা হয় ওই বিষয়ে তাঁর মূল বক্তব্যের সপক্ষে।

১৫ জুলাই ১৯৩৮

এই বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রের বাদপ্রতিবাদে অংশ নেওয়া আমার ইচ্ছাও নয়, কর্তব্যও নয়। যা করা আমি কর্তব্য বোধ করেছি আমি তাই করেছি, যথা, ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলা আছে তার প্রতি কংগ্রেসের যা মনোভাব সেই বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ৯ জুলাই আমি যে বিবৃতি প্রচার করি তা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেসের যা অভিমত তার দৃঢ় পুনরুক্তি ছাড়া কিছুই নয়। ১৯৩৭-এর অক্টোবরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সুস্পষ্টভাবে সেই অভিমতই ব্যক্ত করে এবং পরে গত ফেব্রুয়ারিতে, হরিপুরা কংগ্রেস সেই অভিমতকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবটি ছিল এইরূপ:

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে তাহাদের যৎপরোনাস্তি ধিক্কার ও সম্পূর্ণ বিরোধিতা পুনরায় জ্ঞাপন করিতেছে এবং তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর যাবতীয় উপায় অবলম্বন করিয়া ইহাকে প্রতিরোধ করার সংকল্পও ব্যক্ত করিতেছে। সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত জাতির অভিপ্রায় সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা প্রবর্তনের কোনও প্রয়াস ভারতের জনগণের নিকট যুদ্ধ আহ্বানের সামিল হইবে। অতএব কমিটি প্রাদেশিক স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলিকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, তৎসহ প্রাদেশিক সরকারগুলিকে ও তাহাদের মন্ত্রিমণ্ডলীকে আহ্বান জানাইতেছে, তাঁহারা যেন এই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা, যাহা ভারতের সমূহ ক্ষতিসাধন করিবে এবং যাহা সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও প্রতিক্রিয়ার অধীনে ভারতকে আবদ্ধ রাখিবার বন্ধন দৃঢ়তর করিবে, তাহা প্রবর্তনে বাধাদান করেন। কমিটি এই অভিমত পোষণ করে যে, প্রাদেশিক সরকারগুলি যেন তাহাদের আইনসভাগুলিকে আবেদন করে, তাহারা যেন প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি এই বিরোধিতা আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্ত করে এবং স্ব স্ব প্রদেশে তাহা প্রবর্তন না করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে যেন জানাইয়া দেয়।

অতএব কংগ্রেস প্রস্তাবিত যুক্ত কাঠামোর প্রতি তাহার ধিক্কার পুনরায় জ্ঞাপন করিতেছে এবং প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলিকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, সেইসঙ্গে প্রাদেশিক সরকার ও মন্ত্রিমণ্ডলীকে ইহার প্রবর্তন প্রতিহত করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে। জনসাধারণের বিঘোষিত অভিপ্রায় সত্ত্বেও ইহা চাপাইয়া দিবার প্রচেষ্টা করা হইলে, এইপ্রকার প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে প্রতিহত করা হইবে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি ও মন্ত্রিসভাগুলি তাহার সহিত সহযোগিতা করিতে অবশ্যই অস্বীকার করিবে। এইপ্রকার অবস্থার উদ্ভব হইলে, এমতাবস্থায় কী কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর অধিকার ন্যস্ত করা হইতেছে এবং কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

৯ জুলাই তারিখে আমার বিবৃতিটি প্রচার করবার আগে আমার কাছে সংবাদ আসে যে, ব্রিটিশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অনুকূলে কংগ্রেস সদস্যদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের জন্য চেষ্টা করছে। অতএব হরিপুরা কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী এই কূট অপপ্রয়াসকে যতশীঘ্র সম্ভব বাধা দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল। যদি আমি তা না করতাম, আমি আমার পদের যথার্থ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হতাম।

আমি বৈধভাবে দাবি করতে পারি, আমার বিবৃতির মূলে ছিল হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যবোধ। যদি আমি কঠিন ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করে থাকি, অংশতঃ তার কারণ ওই প্রশ্নে আমার মনোভাবও কঠিন এবং অংশতঃ কারণ যেহেতু কংগ্রেসের নিজস্ব মনোভাবও কঠিন, যথা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে "সম্পূর্ণ বিরোধিতা" এবং "সর্বাত্মক ধিক্কারে"র মনোভাব। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে একথা বলে রাখা দরকার যে, হরিপুরায় সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাতে দ্ব্যর্থবোধের কোনও ক্ষেত্র নেই এবং কোনও কংগ্রেস সদস্যের পক্ষে, যত উচ্চ পদেই তিনি অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, এই বিষয়ে কংগ্রেসের আপসহীন মনোভাবকে তুচ্ছ করা ও কংগ্রেসের অধিকারকে খর্ব করা তার এক্তিয়ার বহির্ভূত। হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনের পর থেকে এমন কিছুই ঘটেনি যার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের বিন্দুমাত্র সংশোধন আবশ্যক হতে পারে।

বিপরীতপক্ষে, এমন একটা অনুকূল দিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিণতি ঘটেছে যাতে হরিপুরায় আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তাতে অটল থাকা আমাদের আরও বেশি কর্তব্য।

এইরকম বিবৃতি প্রচার করার আবশ্যকতা সম্পর্কে যদি কোনও সন্দেহ থেকে থাকে, এই বিবৃতি প্রকাশের পরবর্তী ঘটনাবলী থেকেই সে সন্দেহ সমূলে দূর হওয়া উচিত। এবং কিছুকাল যদি আমরা ধৈর্য ধরে থাকতে পারি, আমার বিশ্বাস, আমার বিবৃতি যে একদিনও আগে প্রচার করা হয়নি তা শীঘ্রই আমরা বুঝতে পারব।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো জোর করে আমাদের গলাধঃকরণের চেষ্টার সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে, যদিও এ কথা চিন্তাতীত যে কংগ্রেস তার পূর্ববর্তী মনোভাব কখনও অস্বীকার করবে, তবুও সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের পক্ষে আগে থেকে বুঝে রাখা ভাল, কোনওপ্রকার অঘটনের ফলে অভাবিত এই অবস্থার যদি উদ্ভব হয় তখন কী হবে। কংগ্রেসের বর্তমান মতিগতির কথা বিবেচনা করলে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকে না যে, কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করলে ওই সংস্থায় অনিবার্যভাবে গুরুতর একটা ভাঙন দেখা দেবে। আমরা যদি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ হই, পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ পরিণতির দিকে আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না এবং আমরা এই আশাতেও নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে পারি না যে, সংখ্যাধিক সদস্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মেনে নিয়েছে বলে বিরুদ্ধমতাবলম্বী সংখ্যালঘু বিনা প্রতিবাদে তা স্বীকার করে নেবে।

আমার বিবৃতির উপর যা সমালোচনা হয়েছে তার কিছু কিছু আমাকে অবাক ও মর্মাহত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেসের অভিমত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করা ছাড়া যাতে আর কিছুই নেই তাকে শাসানি বলে অভিহিত করা নিতান্তই অযৌক্তিক। আমার সম্পর্কে একথা বলাও সমান অযৌক্তিক যে, কংগ্রেস যদি তার পূর্ববর্তী মনোভাব বদলায় আমি তা হলে ওই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে আসব। যে কংগ্রেস আমার প্রাণবায়ুর মতো, কোনও কিছু কখনওই আমাকে সেই কংগ্রেস ত্যাগ করাতে পারবে না। আমার বিবৃতি সম্পর্কে শেষ ও সমান অযৌক্তিক সমালোচনা এই যে, যদি আমি দেখি যে সংখ্যাধিক সদস্যরা এমন পদক্ষেপ নিতে চলেছে যা জাতীয় "হারাকিরি"র সামিল, সেই অবস্থাতেও পদত্যাগ করার স্বাধীনতা আমার থাকবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে কংগ্রেস যদি গ্রহণ করে, তা রাজনৈতিক আত্মহত্যা থেকে কোনও অংশে কম হবে না এবং যদি অভাবনীয় এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে সংখ্যাধিক সদস্যরা তা মেনে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই আত্মনিধন যজ্ঞে আমিও যে যোগ দেব, যুক্তিসংগতভাবে এমন আশা কি করা যায়? পরিশেষে, আমার আশা, বিশ্বাস এবং কামনা, কংগ্রেস সদস্যদের দিক থেকে আমাদের জাতীয় দাবিকে হেয় করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটুক। দিল্লি ও হোয়াইট হলের দরবারে অবাঞ্ছিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কিত সংশোধন পেশ করে

আমরা যেন নিজেদের সংসদসর্বস্ব ব্যস্তবাগীশদের পর্যায়ে নামিয়ে না আনি। বিপরীতপক্ষে, আসুন আমরা নিজেদের মধ্যেকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াই এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসে যেন অটল থাকি যে, ঐক্যবদ্ধ ও নবজাগ্রত ভারতের জাতীয় দাবিকে অগ্রাহ্য করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আর সম্ভবপর হবে না।

বিজ্ঞান এবং রাজনীতি*

মেঘনাদ সাহা কর্তৃক উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর, ২১ আগস্ট ১৯৩৮

প্রশ্ন: আমার জিজ্ঞাস্য ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ কি গ্রাম্য জীবনের গোরুর গাড়ির দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত করে, তার দ্বারা দাস্য মনোভাবকে জিইয়ে রাখবে, না তার সমূহ জাতীয় সম্পদের বিকাশ ঘটিয়ে আধুনিক শিল্পোন্নত জাতিতে পরিণত হবে এবং দারিদ্র্য অজ্ঞতা ও দেশরক্ষার সব সমস্যার সমাধান করবে এবং বিশ্বজাতিসভায় সম্মানের আসন অধিকার করে সভ্যতার এক নতুন চক্রগতির সূত্রপাত করবে?

কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃমণ্ডলী যদি শিল্পোযোজন নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন, তাঁরা কি শিল্পোযোজনের যুক্তিসংগত পরিকল্পনা রচনা করে একটি জাতীয় গবেষণা সংস্থা গঠন করবেন এবং দেশের বিজ্ঞানীসমাজকে সেই উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ করবেন? আমি এই প্রশ্ন করছি, তার প্রথম কারণ কংগ্রেস কয়েকটি প্রদেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, দ্বিতীয় কারণ, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শিল্পোযোজন সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তিকর ধারণা রয়েছে।

উত্তর: ভারতীয় মুক্তি আন্দোলন এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছিয়েছে যখন স্বরাজ শুধু আর স্বপ্ন নয়—শুধু সুদূর ভবিষ্যতের একটা আদর্শমাত্র নয়। বিপরীতপক্ষে, ক্ষমতাদখল আমাদের নাগালের মধ্যে প্রায় এসে গেছে—ব্রিটিশ ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশ এখন কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর অধীন। এই সকল সরকারের ক্ষমতা যদিও সীমিত, তবুও তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের পুনর্গঠনের সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। এইসব সমস্যা আমরা কি করে সমাধান করব? সর্বাগ্রে এবং সর্বপ্রথমে আমরা এই দায়িত্বপালনে বিজ্ঞানের সাহায্য চাই।

কংগ্রেস এবং জাতীয় পুনর্গঠনের দায়িত্ব: আমি সবসময় এই মত পোষণ করে এসেছি এবং হরিপুরা কংগ্রেসে আমার সভাপতির অভিভাষণেও আমি এই কথা বলি যে, যে-পার্টি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, ক্ষমতা দখল করার পর সেই পার্টি নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে না। যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠনের দায়িত্বও সেই পার্টিরই নেওয়া উচিত। অতএব, আজকের যাঁরা কংগ্রেস সদস্য তাঁদের কেবল স্বাধীনতার জন্য প্রয়াসী হলেই চলবে না, তাঁদের চিন্তা ও সামর্থ্যের কিছুটা অংশ জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যাতেও ব্যাপৃত রাখতে হবে। এবং জাতীয় পুনর্গঠন সম্ভব হবে কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিয়েই।

---

* ২১ আগস্ট ১৯৩৮-এ অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য এই অ্যাসোসিয়েশন তখনকার কংগ্রেস সভাপতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে আমন্ত্রণ জানায়। সভায় অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা নেতাজিকে কিছু প্রশ্ন করেন। এখানে সভার প্রাথমিক কিছু বিবরণ উদ্ধৃত হল।

আপনি যদি অনুমতি করেন জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যা সম্পর্কে আমার নিজস্ব কিছু ধারণা আপনার কাছে উপস্থাপিত করতে চাই। এদেশে শিল্পীয় পুনরুদ্ধার সম্ভব করার জন্য আজকাল অনেক পরিকল্পনার কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। এই প্রদেশের একজন অফিসার সম্প্রতি বাংলাদেশের শিল্পীয় পুনরুদ্ধারের উপর প্রকাণ্ড এক বই লিখেছেন। আমাদের সামনে যে সমস্যা তা শিল্পীয় পুনরুদ্ধার নয়, তা শিল্পযোজন। ভারতবর্ষ এখনও বিবর্তনধারায় প্রাকশিল্পীয় স্তরে রয়ে গেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি কখনই সম্ভব হবে না যতদিন পর্যন্ত আমরা শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক যন্ত্রণাকে অতিক্রম না করি। আমরা চাই বা না চাই, এ সত্যের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করতেই হবে যে, আধুনিক ইতিহাসের বর্তমান যুগ শিল্পীয় যুগ। শিল্পবিপ্লব থেকে কিছুতেই পার পাওয়া যাবে না। বড়জোর আমরা স্থির করতে পারি এই বিপ্লব, অর্থাৎ শিল্পযোজন, তুলনায় ধীরগতিতে হবে, যেমন গ্রেট ব্রিটেনে হয়েছে অথবা জোর কদমে তাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হবে, যেমন হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ায়। আমার কিন্তু মনে হয়, এদেশে জোর কদমেই ঠেলে নিয়ে যেতে হবে।

আমার কোনওই সন্দেহ নেই, সারা দেশে আমাদের যখন জাতীয় সরকার হবে, সর্বপ্রথমে আমাদের যে কাজগুলি করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হবে সারা দেশের জন্য একটি জাতীয় প্ল্যানিং কমিশন গঠন। বস্তুতপক্ষে সাতটি প্রদেশে আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলী এরই মধ্যে একই ধরনের শিল্পীয় নীতি ও কর্মপদ্ধতির প্রয়োজন বোধ করছেন। এই বিষয়ের কথা পূর্বাহ্নে চিন্তা করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক বছর আগে, কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হবার পরে পরেই, এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, শিল্পসংক্রান্ত বিষয়ে কংগ্রেস সরকারগুলিকে উপদেশ দেবার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই অভিমত ১৯৩৮-এর মে মাসে বোম্বাইয়ে আমার সভাপতিত্বে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীদের যে অধিবেশন হয়, সেখানে সমর্থিত হয়। সেই থেকে বিশেষজ্ঞদের কমিটি নিয়োগের বিষয়টি ওয়ার্কিং কমিটির বিবেচনাধীন আছে এবং জুলাই মাসে কমিটির শেষ যে মিটিং হয়েছে তাতে কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে আমি কংগ্রেসশাসিত সাতটি প্রদেশের শিল্পসংক্রান্ত মন্ত্রীদের একটি সম্মেলনে আহ্বান করব। আমরা পূর্ণ স্বরাজ লাভের জন্য অপেক্ষা না করে যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে অগ্রসর হচ্ছি তা বোঝাবার জন্য আমি এইসব ঘটনার কথা বলছি।

যদিও কুটীর শিল্পকে আমি বাদ দিচ্ছি না, যদিও আমি মনে করি কুটীর শিল্পকে রক্ষা করার জন্য এবং যেখানে সম্ভব তা পুনরুদ্ধারের জন্য সবরকমের চেষ্টা করা উচিত, আমার কিন্তু অভিমত এই যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে বোঝাবে প্রধানত ভারতের শিল্পযোজনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা। এবং আপনারাও নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, স্যার জন এন্ডারসন আমাদের যতই বোঝাতে চান, ছাতার বাঁট ও কাঁসার থালা শিল্পের উন্নয়নই শিল্পযোজনা নয়।

আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি, আপনার পত্রিকা সায়েন্স অ্যান্ড কালচার শিল্পযোজনার সমস্যার দিকে এদেশের বিদগ্ধ চিন্তাকে আকৃষ্ট করতে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন সংখ্যায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, নদীবিষয়ক পদার্থবিদ্যা, জাতীয় গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ।

জাতীয় পরিকল্পনা নীতির উপরে আমি কয়েকটি মন্তব্য করতে চাই:

(১) শিল্পীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও পৃথিবীটা এক, তা সত্ত্বেও বিশেষ করে আমাদের প্রধান প্রধান চাহিদা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় স্বয়ম্ভরতার দিকে লক্ষ রাখতে হবে;

(২) আমাদের এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে যার লক্ষ্য হবে মূল শিল্পগুলির বিকাশ ও উন্নয়ন, যেমন, শক্তি সরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্র ও কারখানার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত, অপরিহার্য

রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত, পরিবহণ ও যোগাযোগ সংক্রান্ত শিল্প, ইত্যাদি।

(৩) টেকনিকাল শিক্ষা ও টেকনিকাল গবেষণার যে সমস্যা আছে তাও আমাদের সমাধান করতে হবে। টেকনিকাল শিক্ষা বিষয়ে জাপানি ছাত্রদের মতো আমাদের ছাত্রদেরও নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদেশে ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠাতে হবে যাতে তারা দেশে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলার কাজে সরাসরি লেগে যেতে পারে।

টেকনিকাল গবেষণার বিষয়ে আমরা সবাই একমত হব যে তা সর্বপ্রকার সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবে। একমাত্র এই হতভাগ্য দেশেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভার মোটা মাইনের সরকারি চাকুরেদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং আমাদের সবার ভালমতো জানা আছে তাতে কী ফললাভ হয়েছে।

(৪) স্থায়ী একটি জাতীয় গবেষণা কাউন্সিল থাকবে;

(৫) পরিশেষে, জাতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে বর্তমান শিল্পীয় পরিস্থিতির উপর একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষা করতে হবে যাতে জাতীয় প্ল্যানিং কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

শিল্পযোজনা ও জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যা সম্পর্কে আমার যা ধারণা তার কিছু অংশ সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম এবং আমার বিশ্বাস, এদেশের বিজ্ঞানী নারীপুরুষ সকলেরই এতে সায় আছে। আমরা, যারা বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ, আমরা আমাদের ধারণাগুলিকে রূপ দিতে আপনাদের, বিজ্ঞানীদের সাহায্য চাই। আমরা আমাদের দিক থেকে এইসব ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করতে পারি এবং যখন ক্ষমতার দুর্গ চূড়ান্তভাবে আমাদের করায়ত্ত হবে, এইসব ধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত করতেও সাহায্য করতে পারি। যা একান্ত প্রয়োজন তা হচ্ছে বিজ্ঞান ও রাজনীতির মধ্যে সুদূরপ্রসারী সহযোগিতা।

অধ্যাপক সাহা তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেবার সময় জানতে চেয়েছেন, শিল্পযোজনার সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব কী। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, এই প্রশ্নে সব কংগ্রেস সদস্যের মত এক নয়। তা সত্ত্বেও কোনওপ্রকার অতিরঞ্জন না করে আমি একথা বলতে পারি যারা তরুণ তারা শিল্পযোজনার সপক্ষে এবং তা কয়েকটি কারণে। প্রথমত, বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পযোজনার প্রয়োজন। যদিও বিজ্ঞানসম্মত কৃষি ভূমির উৎপাদন বৃদ্ধি করবে, তবু প্রতিটি নরনারীর জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হলে জনসংখ্যার ভালমতো একটি অংশকে ভূমি থেকে সরিয়ে শিল্পে নিয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তরুণরা জাতীয় পুনর্গঠনের ভিত্তি হিসেবে সমাজতন্ত্রের কথা চিন্তা করছে এবং শিল্পযোজনা হবার পরেই আসে সমাজতন্ত্র। তৃতীয়ত, আমাদের যদি বৈদেশিক শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়, শিল্পযোজনা একান্ত দরকার।

পরিশেষে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য শিল্পযোজনা প্রয়োজন।

অধ্যাপক সাহা আরেকটি প্রশ্ন করেছেন, ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে ভারত কি একটি জাতিতে পরিণত হবে? এর উত্তরে আমি বলতে চাই, আমরা যারা কংগ্রেসের, আমরা ভারতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। আমরা চিনের পথ অনুসরণ করতে চাই না, তুরস্কের পথে যেতে চাই। কিন্তু একথাও ঠিক, স্বাধীন হবার পর আমরা যদি নিজেদের একতাবদ্ধ রাখতে চাই, আমাদের কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। জাতীয় একতা ও সংহতি বৃদ্ধির জন্য অনেক জিনিসের দরকার, যেমন, এক ভাষা, এক সাজ, এক খাদ্য ইত্যাদি। আপনারা জানেন কংগ্রেস এদেশের সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা হিসেবে হিন্দুস্থানীর কথা বলে আসছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বৈদেশিক আধিপত্য যখন লোপ পাবে তখন সবচেয়ে বেশি করে যা দরকার তা হচ্ছে একটি জাতি হবার এবং একটি জাতিরূপে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ রাখার

আকাঙ্ক্ষা। সেই কারণে, আমার মনে হয়, একতার সমস্যাটা প্রধানত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হবে, তাদের নিয়মিতভাবে চালিত করতে হবে, যাতে তারা বোধ করে তারা এক জাতি। ভাষা, সাজ, খাদ্য ইত্যাদি ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু একতা গড়ে তুলতে পারে না। জাতিগত এই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জাতীয় একতা ও সংহতি বজায় রাখতে আরও যা দরকার তা হচ্ছে সর্বভারতীয় একটি পার্টি। কংগ্রেস সেই পার্টি। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, প্রতিটি দেশ সেই দেশের জনসাধারণকে একতাবদ্ধ করার জন্য একটি পার্টির জন্ম দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি, জার্মানিতে নাৎসি পার্টি, ইতালিতে ফ্যাসিস্ট পার্টি এবং তুরস্কে কামালের পার্টি। ওই পার্টিগুলি তাদের নিজ নিজ দেশে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, ভারতে কংগ্রেস পার্টিও সেই ভূমিকা গ্রহণ করবে।

সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের ভাল দিক ও মন্দ দিক*

যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল প্রদেশে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পরিচালকমণ্ডলী এবার যখন কংগ্রেসের সদস্যদের অনুমতিদানের সিদ্ধান্ত করেছেন, তখন আমাদের সামনে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকা আমাদের কর্তব্য। যদিও ব্রিটিশ-ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে কেবলমাত্র ছ'টিতে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী হতে চলেছে (যুক্তপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি), সারা ভারতের কংগ্রেস সদস্যদের ও সাধারণভাবে জনগণের মনোযোগ আগামী কিছুদিনের মতো মন্ত্রিসভাগুলির ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির কার্যকলাপের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। নিয়মতান্ত্রিক কার্যকলাপই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াবে এবং আইন অমান্যের মতো অনিয়মতান্ত্রিক যে পদ্ধতিগুলি এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের হাতে প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে ছিল, সেগুলি নেপথ্যে অপসৃত হবে। জনগণের মানসিকতায় মনস্তাত্ত্বিক একটা পরিবর্তন স্বভাবতই দেখা দেবে এবং অনেক কংগ্রেস সদস্যের মনে সরকারি পদাধিকারসূত্রে নানা সুযোগ-সুবিধা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগবে। যে "বিদ্রোহী মানসিকতা"কে কংগ্রেস বহু বৎসর ধরে লালন করে আসছে, তার জায়গায় আরেকবার দেখা দেবে আত্মপ্রসাদ ও জড়তা। আজকের দিনে যে সকল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হল।

যারা মনে করে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ নীতিগতভাবে ভুল, আমি তাদের একজন নই। আইনসভায় যোগদান এবং সরকারি দায়িত্বগ্রহণের সঙ্গে নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ জড়িত। কিন্তু আমি বরাবরই এই প্রকার শপথকে নিতান্তই নিয়মতান্ত্রিক বলে গণ্য করে এসেছি। ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে কংগ্রেস মহলে যখন আইনসভায় যোগদান করা নিয়ে জোর বিতর্ক চলেছিল, তখন বিরুদ্ধপন্থীরা যে যুক্তি দেখান, যেমন, যোগদান করলে ব্রিটিশ সম্রাটের কাছে আনুগত্যের শপথ নিতেই হবে, সেই যুক্তি আমার মনে কোনও সাড়া জাগায়নি। মি. ডি ভ্যালেরা যাতে ডয়েলে গিয়ে ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ বাতিল করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি তাঁর আনুগত্যের

---

* ১৯৩৮-এর আগস্ট সংখ্যা মডার্ন রিভিউ-এ স্বনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ

শপথ নেওয়াটাকে নীতিগতভাবে আমি মোটেই অন্যায় মনে করি না। এক্ষেত্রে যে প্রশ্ন জড়িত তা নীতির প্রশ্ন নয়, সুবিধার প্রশ্ন, এবং আমি যে দিক থেকে এইসব প্রশ্নের বিচার করি তা পুরোমাত্রায় বাস্তব ভিত্তিক।

আমাদের পৌর প্রশাসনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিশ্চিতভাবে বুঝি, প্রশাসনক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে হলে খুঁটিনাটি অসংখ্য বিষয় আয়ত্ত করার সামর্থ্য থাকা দরকার। অতএব মনপ্রাণ দিয়ে প্রশাসনিক কাজে আত্মনিয়োগ করলে ব্যাপকতর বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত থাকার মতো অতিরিক্ত সময় বা শক্তি প্রায়ই থাকে না। ক্বচিৎ আমরা এইরকম লোকের সংস্পর্শে আসি যাঁরা প্রশাসনের তুচ্ছতম খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর রেখে একই কালে অধিকতর মৌলিক সমস্যা নিয়েও চিন্তা করতে পারেন। আমার অত্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে, ১৯২৪ সালে আমি যখন কলিকাতা মিউনিসিপাল করপোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলাম, তখন কংগ্রেসের সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধই ছিল না, পৌর প্রশাসনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে আমাকে এত বেশি ডুবে থাকতে হত। কিন্তু আমি যখন এই কাজ গ্রহণ করতে যাই, কাজের দায়িত্বকে মেনে নিয়েই যাই, কারণ তখন আমার আশা ছিল, কংগ্রেসের কাজ অদম্য উৎসাহে চালিয়ে নিয়ে যাবার লোকের কোনও অভাব নেই।

বরাবর আমি এই মত পোষণ করে এসেছি, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন স্বাধীনতা অর্জন করার পর "যুদ্ধপরবর্তী" পুনর্গঠনের দায়িত্ব তাঁদেরই গ্রহণ করতে হবে। "আমাদের অভীষ্ট কর্ম শেষ হয়েছে"— এই অজুহাতে দায়িত্ব এড়ানো যেতে পারে না। সেই কারণে জয়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পার্টিকে সামাজিক পুনর্গঠন ও প্রশাসনের কাজে মনে প্রাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং তারই মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে দেখাতে হবে, তারা যেমন ধ্বংস করতে পারে তেমনি সার্থক সৃষ্টিও করতে পারে। কিন্তু সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করবার আগে পার্টিকে ভেবে দেখতে হবে সেই বহুপ্রতীক্ষিত লগ্ন সমাগত কিনা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ হয়েছে কি না। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা এই— "১৯৩৫-এর ভারত-সরকার আইন কি আমরা যা চেয়েছিলাম তাই দিয়েছে? আপাতত কেন্দ্রীয় সরকারের কথা যদি বাদ দেওয়া যায়, তা হলেও এই আইন থেকে কি আমরা প্রদেশগুলিতেও যথার্থ স্বায়ত্তশাসন পাচ্ছি?" এর সুস্পষ্ট উত্তর— "না"।

তর্কের খাতিরে এ-কথা অবশ্য বলা হবে, সামরিক সংগ্রামেও যেমন, রাজনৈতিক সংগ্রামেও তেমনই, আমাদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার সময় সুবিধাজনক ঘাঁটি দখল করে নিজেদের অবস্থা সংহত করার প্রয়োজন আছে। খুব সত্য কথা। কিন্তু আমরা কি সুনিশ্চিত, ক্ষমতার আসনের মূল্য যতটুকুই থাক, সেই আসন দখল করার চেষ্টায় আমরা প্রশাসনের গোলকধাঁধায় নিজেদের হারিয়ে ফেলব না এবং যে "বিদ্রোহী মানসিকতা" থেকে যাবতীয় রাজনৈতিক অগ্রগতির সূচনা, তা পরিহার করতে চাইব না? স্পষ্টতই কংগ্রেস আজ উভয়সংকটের সম্মুখীন। যে স্বাধীনতা অর্ধেকও জয় করা যায়নি, সেই স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে কংগ্রেস তার প্রথম সারির কর্মীদের মন্ত্রিত্বের গদি দখল করার জন্য পাঠাতে পারে না। অপরপক্ষে, যথার্থ প্রথম শ্রেণির ব্যক্তি যদি বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রী না হয়, আমরা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির যে আসনগুলি শাসনতন্ত্রের কাছ থেকে পেয়েছি তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারব না। ১৯২৫-৩০ সালে ভারতীয় আইন সভার প্রেসিডেন্টরূপে স্বর্গত ভি. জে. প্যাটেলের মতো প্রথম সারির রাজনৈতিক প্রতিভাই কেবল জনসাধারণের স্বার্থকে তুলে ধরে সংসদীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেন এবং সরকারি আসনের সদস্যদের তাঁদের আসনে নির্বাক করে রাখতে পারেন। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমান ব্যক্তি নিশ্চিত ব্যর্থ হত। ভি. জে. প্যাটেলের পাশে যন্মুখম চেট্টি ও আবদার রহিমরা নগণ্য মেরুদণ্ডহীন বলে মনে হয়।

সরকারি দায়িত্বগ্রহণের যাঁরা গোঁড়া সমর্থক তাঁরা এও বলবেন বা বলতে পারেন, যে-কোনও রাজনৈতিক পার্টির পক্ষে প্রশাসনের অভিজ্ঞতা অপরিহার্য এবং নতুন শাসনতন্ত্র এই অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দিচ্ছে। এই যুক্তির দোহাই দিয়ে সহজেই বাড়াবাড়ি করা যেতে পারে। প্রশাসনের অভিজ্ঞতাও যা সংগঠনের অভিজ্ঞতাও তাই, তবে শেষেরটি যেমন যে-কোনও পার্টির সম্পদ, প্রথমটি কিন্তু সহায়ক হওয়ার থেকে প্রতিবন্ধকই হয়ে ওঠে বেশি। সর্বকালে সর্বদেশে যা হয়ে এসেছে সেই ধারায় যুদ্ধপরবর্তী ইউরোপের যাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রশাসক তাঁরা যখন তাঁদের পুরোগামীদের কাছ থেকে সরকারি শাসনভার গ্রহণ করেন, তুলনায় তাঁরা ছিলেন তরুণ এবং প্রশাসনেও ছিলেন অনভিজ্ঞ। আমার এই যুক্তির অকাট্যতা লেনিন, স্টালিন, হিটলার, মুসোলিনি, কামাল পাশার মতো সার্থক প্রশাসকদের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। আসল কথা এই যে বিপ্লবের পরে (সহিংসই হোক, অহিংসই হোক) নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সার্থক মোকাবিলা করবার জন্য নতুন প্রশাসনে দরকার হয় সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের নীতি ও কর্মকৌশলের এবং সেইসঙ্গে সাহস, কল্পনা ও উপায় উদ্ভাবনীশক্তির। "অভিজ্ঞ" প্রশাসকরা কি সোভিয়েত রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন, কিংবা তুরস্কে নতুন প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন, কিংবা ইতালির নতুন সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন, অথবা বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি থেকে নতুন এক পারস্যের সৃজন করেছিলেন?

এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, ক্ষমতা ও প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রীয় দুর্গটি (ভারত সরকার) এখনও ব্রিটিশ সরকারের করায়ত্ত রয়েছে এবং কেবলমাত্র ফাঁড়িগুলি অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারগুলি, আমাদের হাতে এসেছে— তাও পুরোপুরি নয়। এই অবস্থায় আমাদের পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যদি প্রশাসনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নিমগ্ন থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তা হলে কি আমরা আমাদের সাবেকি উৎসাহ মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখে এবং আসল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারব? এই প্রশ্নের পূর্বকল্পিত উত্তরের তেমন কোনও মূল্য নেই এবং যথাকালে একমাত্র ঘটনাধারা থেকেই আমরা এর যথার্থ উত্তর পাব। তবে যাঁরা ক্ষমতাগ্রহণের পক্ষে, তাঁদের প্রত্যয় যদি সমর্থনযোগ্য বিবেচিত হয়, তা হলে নিকট ভবিষ্যতে আমাদের যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হতে পারে এবং যার উল্লেখ প্রথম অনুচ্ছেদে করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আগে থেকে আমাদের সাবধান ও প্রস্তুত থাকতে হবে। যে প্রশ্নে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পরিচালকমণ্ডলী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আজ সেই প্রশ্ন নতুন করে তোলা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে নতুন শাসনতন্ত্র থেকে যথাসম্ভব সুবিধা আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার আদর্শকে যদি আরও অগ্রসর করা আমাদের অভিপ্রায় হয়, তা হলে যে সব বিপদকে আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে, আমার উদ্দেশ্য, তার কয়েকটির ইঙ্গিত দেওয়া।

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞকে প্রধান প্রধান যে সমস্যাগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে তা দারিদ্র্য, বেকারি, ব্যাধি ও নিরক্ষরতা। এই সব সমস্যার সার্থক সমাধান করতে পারে একমাত্র জাতীয় সরকার। অবশ্য প্রচুর সহায়সম্বল সেই সরকারের আয়ত্তাধীনে থাকা চাই। এইসব সমস্যার মোকাবিলা করার সংকল্প একবার আমাদের ভিতর জাগলে আমাদের দরকার হবে সংগঠনের এবং সেই কাজ করার উপযোগী অর্থের। ব্যাপকভাবে জাতিগঠনের কাজ হাতে নেবার মতো প্রয়োজনীয় সংগঠন ও অর্থের সন্ধান কি প্রদেশের কংগ্রেসি মন্ত্রীরা পাবে? সংগঠন সম্পর্কে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে, সরকারি চাকরির উচ্চ পদগুলি অধিকার করে আছে প্রধানত ব্রিটিশরা, তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ঐতিহ্যের মধ্যে লালিত হয়েছে এবং তারা সব সময়ে মনেপ্রাণে চাইবে তাদের বেতন, পেনসন ও অন্যান্য পাওনা মন্ত্রীদের আওতার বাইরে শাসনতন্ত্রের রক্ষাকবচে যেন নিরঙ্কুশ থাকে। কংগ্রেসি মন্ত্রীরা স্বতঃই যে নতুন নীতি গ্রহণ করবে এই ধরনের অফিসাররা কি তার সঙ্গে তাল রেখে চলবে। যদি না চলে তা হলে মন্ত্রীদের অবস্থা

কী হবে? তাদের যতই সদিচ্ছা থাক না কেন, প্রতিবন্ধী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে তারা কি সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে সক্ষম হবে? উচ্চতর চাকরির পদস্থবর্গকে অদলবদল করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হবে যেহেতু উচ্চপদাধিকারীরা "সংরক্ষিত" বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং মন্ত্রীদের যতদূর সম্ভব তাদের সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে, যদিও তাদের প্রতিবন্ধী নীতির ফলে মন্ত্রীদের কাজ ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা থেকেই যাবে। উপরন্তু কয়েকটি প্রদেশে অদ্ভুত এক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, সরকার কংগ্রেসি, অথচ তা চালাচ্ছে প্রধানত ব্রিটিশ অফিসাররা এবং তাদের প্রাক্তন পোষ্যরা।

অর্থসমস্যা এমন একটি সমস্যা যা আরও বেশি বিপত্তিকর। কংগ্রেস পার্টি এমন কয়েকটি পন্থা গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুত যা সরকারি রাজস্বের মূলে কুঠারাঘাত করবে এবং ব্যাপক হারে জাতিগঠনের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য করে তুলবে। ভূমিরাজস্ব হ্রাস করার পর এবং আবগারি ব্যাপারে মাদকবর্জন নীতি চালু করার ফলে মন্ত্রিমণ্ডলী ঘাটতি বাজেটেরও সম্মুখীন হতে পারে। অন্য যে-কোনও দেশে অর্থমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করতে লেগে যেত। ভারতীয় প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে উচ্চতর চাকরির বেতন ও অন্যান্য পাওনায় হাত দেওয়া যাবে না এবং বাকি যে সব পদ আছে তাদের বেতন এতই কম যে সেখানে মিতব্যয়িতার কোনও অবকাশ নেই। ফলতঃ এই ক্ষেত্রে ছাঁটাই করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। সেনাবাহিনী, রেলওয়ে, ডাক ও তার, শুল্ক ইত্যাদি যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়, এইসব বিভাগে ছাঁটাই বা এইসব বিভাগ থেকে আয়বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে না। মুদ্রাস্ফীতি মারফতও অর্থসাচ্ছল্য করা কোনও প্রাদেশিক সরকারের সাধ্যে নেই, যেহেতু মুদ্রা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়— ভারতের যে বিপুল স্বর্ণসঞ্চয় আছে সেদিক থেকে যদিও এ ব্যবস্থা গ্রহণ সহজেই সম্ভব। এই অবস্থায় একমাত্র বিকল্প পন্থা যা প্রাদেশিক সরকারের কাছে খোলা থাকবে তা এই, জাতিগঠনমূলক কার্যকলাপে অর্থের দায় পূরণ করতে মোটা অঙ্কের ঋণের জন্য জনসাধারণের দ্বারস্থ হওয়া। কিন্তু প্রাদেশিক আইনসভার অনুমোদনের জন্য এইপ্রকার ঋণ গ্রহণ গভর্নর কি সুপারিশ করবেন এবং লর্ড লিনলিথগোর প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় সরকার এই ঋণকে কি স্বীকৃতি দেবে, যে ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এই স্বীকৃতিলাভ প্রয়োজন? যদি তা না করে, তা হলে মনে হয় কংগ্রেসি মন্ত্রীদের কপালে শূন্য হতাশা ছাড়া কিছু নেই।

এতক্ষণ যা পর্যালোচনা করা হল সেই দিক থেকে দেখা যাক কংগ্রেসি মন্ত্রীরা যথার্থ ভাল কিছু করতে পারেন কি না। প্রথমত, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করতে পারেন, দমনমূলক আইন ও অর্ডিনান্সগুলি বাতিল করতে পারেন এবং জনসাধারণকে আরও স্বাধীনতার সুযোগ দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক প্রশাসনে তাঁরা নতুন এক উৎসাহের সঞ্চার করতে পারেন এবং সকল শ্রেণির সরকারি কর্মচারীর কাছে, বিশেষ করে পুলিশের কাছে জনসেবার এক নতুন মান তুলে ধরতে পারেন। তার ফলে বর্তমান সরকারি অফিসার ও কর্মচারীর কাছ থেকে তাঁরা আরও কাজ পেতে পারেন এবং প্রশাসনিক মান উন্নত করতে পারেন। তৃতীয়ত, যেখানে যেখানে সম্ভব সরকারি সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে তাঁরা কংগ্রেসের গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপকে জোরদার করতে পারেন। চতুর্থত, সরকারি খাতে জিনিসপত্র কেনবার সময় আমদানি জিনিসের জায়গায় দেশি জিনিস পছন্দ করে তাঁরা স্বদেশি শিল্পকে এবং বিশেষ করে খাদিকে (হাতে কাটা সুতোয় হাতে বোনা কাপড়) উৎসাহ দান করতে পারেন। পঞ্চমত, বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন, সমাজকল্যাণ, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি) তাঁরা জনহিতকর আইন প্রবর্তন করতে পারেন, বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে একপ্রকার আইন প্রণয়নের ফলে অতিরিক্ত ব্যয় হয় না। ষষ্ঠত, অর্থানুকূল্য সতর্ক বণ্টনের ফলে তাঁরা দেশের জাতীয়তাবাদী অংশকে শক্তিশালী করে তুলতে পারেন, এবং প্রকারান্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে কোণঠাসা করতে পারেন। সপ্তমত, জনসাধারণের অর্থসম্পদ, তাদের করদানের সামর্থ্য এবং বেকারির পরিমাণ ঠিকমতো জানবার উদ্দেশ্যে প্রদেশগুলিতে তাঁরা সর্বাত্মক অর্থনৈতিক সমীক্ষা চালাতে পারেন। অষ্টমত, কোনও কোনও বিভাগে তাঁরা কিছু

পরিমাণ ছাঁটাই করতে পারেন। নবমত, কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রবর্তন বানচাল করার জন্য তাঁরা তাঁদের সরকারি পদমর্যাদার সদ্ব্যবহার করতে পারেন। সর্বশেষে এবং শেষ বলে তুচ্ছ নয়, নিজেদের কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁরা অবশিষ্ট পাঁচটি অকংগ্রেসি মন্ত্রিসভার উপর কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

কিন্তু যতই হোক এগুলি সবই টুকরো টুকরো সংস্কার। কিছুদিনের জন্য জনসাধারণ তাতে খুশি থাকতে পারে কিন্তু বেশিদিন থাকবে না। প্রথম বৎসর শেষ হবার আগেই মৌলিক সমস্যাগুলি— যথা, দারিদ্র্য, বেকারি, রোগ, নিরক্ষরতা ইত্যাদি— গুরুতর আকার নিয়ে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং আশু প্রতিকারের দাবি জানাবে। কেন্দ্রে যখন প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এবং প্রদেশগুলির অর্থসংগতিও যখন সীমিত, কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি কি এই দাবিকে সামাল দিতে পারবে? দারিদ্র্য ও বেকারির সঙ্গে মোকাবিলা করা যেতে পারে কেবলমাত্র কৃষির উন্নতি ও জাতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার করে, তার সঙ্গে ব্যাঙ্ক ও ঋণদান সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার দ্রুত প্রসার ঘটিয়ে। রোগ দূর করার ব্যাপারে, একদিকে রোগ নিবারণ ও নিরাময়ের জন্য অন্যদিকে খেলাধূলা ও শারীরিক ব্যায়ামচর্চা বৃদ্ধির জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হবে। এবং নিরক্ষরতা দূর করার আগে ভাবতে হবে ছোটবড় সবার জন্য অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, যা সম্ভবপর হবে একমাত্র তখনই যখন মন্ত্রীদের হাতে থাকবে খরচ করার মতো বিরাট তহবিল।

আজকের দিনের অগ্রগণ্য জাতিগুলিও এইসব মৌলিক সমস্যার এখনও পর্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান করে উঠতে পারেনি। ভারত কেবলমাত্র তখনই সাফল্যের সঙ্গে এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে পারে যখন দিল্লিতে জনপ্রিয় সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে পুরোপুরি সহযোগিতা থাকবে। এ ছাড়াও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতের মতো অনগ্রসর ও দরিদ্র দেশকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে যখন অগ্রসর হতে হবে, গোঁড়া রাজস্ববিজ্ঞানের রীতি বা নীতি অনুসরণ করে এই দেশের আর্থিক চাহিদা কখনও মেটানো যাবে না।

অতএব নিকট ভবিষ্যতে এমন একটা সময় আমি প্রত্যক্ষ করতে পারছি যখন কংগ্রেসি মন্ত্রীরা তাঁদের আংশিক সংস্কারের কার্যক্রম নিয়ে বেশ খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পর বুঝতে পারবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দিল্লিতে জনপ্রিয় সরকারের প্রতিষ্ঠা না হচ্ছে এবং দেশের জনসাধারণের কাছে ক্ষমতার সম্পূর্ণ হস্তান্তর না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আরও অগ্রগতি সম্ভব নয়।

কিন্তু আমরা এ-কথা যেন না ভাবি যে এই পর্যায়ে আসা অবধি কংগ্রেসি মন্ত্রীদের কাছে সবকিছু অনায়াস ও নির্ঝঞ্ঝাট থাকবে। আগেই আমি দুটি প্রতিবন্ধকতার আভাস দিয়েছি যা সরকারি জীবনে তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপকে নিরস্ত করবে, তা অর্থের অনটন এবং উচ্চপর্যায়ের পদগুলির বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার। প্রথমটি বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না, দ্বিতীয়টি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাই। একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত ধরা যাক, যেমন, ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিস। আগেকার কাঠামোয় ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে ৩৮৬ জন ছিল ব্রিটিশ এবং ২৬৩ জন ভারতীয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশদের সংখ্যা একই রকম থাকবে, কিন্তু ভারতীয়দের সংখ্যা কমিয়ে করা হবে ১৯৮ এবং এই সংখ্যার মধ্যেও ৫৮ জন অফিসার থাকবে স্বল্পমেয়াদি সার্ভিস কমিশনে। আই এম এস অফিসারদের মূল বেতন ভবিষ্যতে কমিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু যারা ব্রিটিশ তাদের ক্ষতির থেকে লাভই হবে বেশি ওভারসিজ ভাতা বৃদ্ধির ফলে, অবশ্য বলাই বাহুল্য, এই ভাতা এই চাকরিতে বহাল ভারতীয়দের দেওয়া হবে না। অতএব নতুন কাঠামোয় আই এম এস-এর ব্রিটিশ সদস্যদের তুলনায় ভারতীয়দের অবস্থা এখনকার থেকেও শোচনীয় হবে। পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন করার জন্যই ব্রিটিশদের জন্য দেশের কয়েকটি

সেরা সেরা জেলা এবং মেডিকেল কলেজের কয়েকটি সেরা চাকরি সংরক্ষিত রাখা হবে। যদিও এই অবস্থাবিপাকের জন্য কংগ্রেসি মন্ত্রীরা দায়ী হবেন না এবং ওয়াকিবহাল শিক্ষিত লোকেরা তাঁদের অসহায় অবস্থার কথা বুঝবেন, তা সত্ত্বেও বড় বড় চাকরিতে ভারতীয়দের নিয়োগ করতে না পারার জন্য এবং ওই সব পদস্থ ব্যক্তিদের অত্যধিক বেতন ও ভাতা কমাতে না পারার জন্য সাধারণ লোক কিন্তু প্রাদেশিক সরকারকে একেবারে নির্দোষ বলে ছেড়ে দেবে না। ছ'টি প্রদেশে কংগ্রেসি মন্ত্রীরা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়বেন, কারণ নামে যদিও তাঁরা আই এম এস অফিসারদের ওপরওয়ালা হয়ে থাকবেন, অফিসারদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার একটিতেও তাঁরা হাত দিতে পারবেন না। অন্যান্য শাখার উচ্চপদের অবস্থাও হবে আই এম এস-এর মতোই।

ছ'টি প্রদেশে কংগ্রেসি মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রত্যাশা যদি এই হয় তা হলে যে পাঁচটি প্রদেশে বেশির ভাগ মন্ত্রীরা মেরুদণ্ডহীন, যাঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা কোনওক্রমে গদিতে টিকে থাকা সেই প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিমণ্ডলীর কাজের রেকর্ড কী হবে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। বাংলাদেশে যেমন, গত চার মাসে মন্ত্রিমণ্ডলী যা করেছেন, বরঞ্চ না করেছেন বলাই ভাল, ভবিষ্যতের তা পূর্বসূচনা ধরা যায়। যে কোনও জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যতালিকায় যা প্রথম কর্তব্য, অর্থাৎ রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদান, সেই কর্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হবার মতো সাহস তাঁরা এখনও সঞ্চয় করতে পারেননি। যে পাটসমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের উপর চার কোটি না হলেও কমপক্ষে তিন কোটি লোকের সুখসাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে সেই দুরূহ সমস্যার মীমাংসার ব্যাপারে ওই মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছ থেকে তা হলে কী আশা করা যেতে পারে?

আমার মনে পড়ে ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি যখন ডাবলিনে ছিলাম, কৃষি ও শিল্পসংক্রান্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে অনেকটা একই ধরনের সমস্যা নিয়ে আমার আলোচনা হয়েছিল। যেমন, আইরিশ ফ্রি স্টেটে বিট চাষের সীমাবন্ধন, চিনি উৎপাদন শিল্পের চাহিদার সঙ্গে তার সম্বন্ধ এবং সে-দেশে উৎপন্ন চিনির বিপণন। তখনই আমি বুঝেছিলাম বাংলাদেশের পাট সমস্যার সমাধান কত সহজ হত শুধু যদি দিল্লিতে ও কলকাতায় একটি জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকত। আমার বিশ্বাস, শাসনতন্ত্রের সীমার মধ্যে থেকেও বাংলাদেশে জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলী পাট সমস্যার সমাধান করতে অনেক কিছুই করতে পারেন, অবশ্য কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো সাহস যদি তাঁদের থাকে; তবে পাটচাষিদের অর্থসাহায্য করার জন্য যেখানে অতিরিক্ত তহবিলের দরকার সেক্ষেত্রে স্বভাবত তাঁরা অনন্যোপায়। কিন্তু বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল এই মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছ থেকে, যাঁদের না আছে তেমন বুদ্ধি, না আছে তেমন সাহস, কিছুই প্রত্যাশা করা যায় না।

তা হলে আমাদের কি এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, মন্ত্রিপদ গ্রহণের নীতি থেকে প্রকৃতপক্ষে কিছুই লাভ হবে না? কখনওই না। যদিও অধিকাংশ কংগ্রেসি সদস্য থেকে আমি ভিন্নমত এবং আমি আশা করি না যে, কংগ্রেসি মন্ত্রীদের সহায়তায় সুদূরপ্রসারী সংস্কারসাধন সম্ভব, তা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের নীতিকে পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করেও ভারতীয় স্বাধীনতার উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই কাজে সার্থক হতে গেলে আমাদের সর্বদা সজাগ থাকতে হবে এবং আমরা কংগ্রেসকে সম্মানপ্রাপ্ত নরমপন্থীদের একটি সমিতিতে নেমে আসতে দিতে পারি না। কংগ্রেসের মধ্যে এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা নিজেদের ইচ্ছামতো চলতে পারলে নিয়মতান্ত্রিকতার অধিকতর আরামপ্রদ পন্থা গ্রহণ করতে চাইবেন।

সরকারি দায়িত্বগ্রহণের সবচেয়ে বড় লাভ এই হবে, এর দ্বারা জনসাধারণের মনে একটা বিশ্বাস সঞ্চারিত হবে যে, কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী এবং কালের পরিণতিতে ভারতের সমগ্র সরকারি যন্ত্র কংগ্রেস পার্টির হাতে চলে আসবে। এর ফলে নৈতিক

দিক থেকে যা লাভ হবে তা অপরিমেয়, এবং আমি মনে করি, কংগ্রেসি মন্ত্রীদের দয়ায় বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের যতটুকু লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার থেকে এর মূল্য অনেকগুণ বেশি। দ্বিতীয়ত, দুর্বলচিত্ত কংগ্রেস সদস্যদের ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষমতার আস্বাদন আরও বেশি দুঃখকষ্ট ও আত্মত্যাগ বরণ করার কাজে শক্তিশালী অনুপ্রেরণা হতে পারে এবং তাঁদের মধ্যে অধিকতর আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে পারে। তৃতীয়ত, এর ফলে কংগ্রেস কেবলমাত্র বাইরে থেকেই নয়, প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে দিয়েও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রবর্তনের বিরোধিতা করতে পারবে এবং এই দ্বিমুখী বিরোধিতার ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে যদি নস্যাৎ করা যায়, কংগ্রেসের জয়গৌরব আরও বাড়বে।

পরিশেষে যা বলতে চাই তা শেষ বলেই তুচ্ছ নয়। সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ করে কংগ্রেসি মন্ত্রীরা নিজেদের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থেকে সারা ভারত ও দুনিয়ার কাছে প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবেন যে, ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রের সীমানার মধ্যে থেকে সুদূরপ্রসারী সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ করার সামান্যই সুযোগ আছে। এই অভিজ্ঞতা মনস্তাত্ত্বিকভাবে সমগ্র দেশকে এবং কংগ্রেসকে দিল্লি ও হোয়াইট হলের প্রতিক্রিয়া দুর্গের উপর চরম আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত করবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি আশাতিরিক্ত খুশি হব যদি সরকারি দায়িত্বগ্রহণের থেকে এই চারদফা ফলপ্রাপ্তি হয়। কিছু কিছু কংগ্রেস নেতা ভবিষ্যতের স্বীকৃত নীতি হিসেবে নিয়মতান্ত্রিকতাকে সম্ভবত মেনে নিতে চাইছেন, এবং তাঁরা কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর দশ-সালা কার্যক্রমের গুজব চালু করেছেন। নীতিগতভাবে সরকারি দায়িত্বগ্রহণের উপর আমাদের মধ্যে যাঁদের আস্থা নেই অথচ প্রকৃত ঘটনা বলে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে, স্বদেশবাসীকে এই গুজব সম্পর্কে সতর্ক করার দায়িত্ব তাঁদের নিতে হবে।

সুখের কথা যে, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং তাঁদের মতো প্রথম সারির নেতারা মন্ত্রিপদ এবং আইনসভা, এই দুইয়ের থেকে দূরে রয়েছেন। এর থেকেই ভরসা পাওয়া যাচ্ছে যে, সংসদীয় কার্যকলাপের জালে কংগ্রেস নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে এবং তার দ্বারা বিশুদ্ধ একটি নিয়মতান্ত্রিক সংস্থায় নিজেকে পরিণত হতে দেবে না (নিয়মতান্ত্রিক শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে আমি প্রয়োগ করছি।) কংগ্রেসি মন্ত্রীরা যাতে নিজ নিজ স্থানে অধিষ্ঠিত থেকে কংগ্রেস হাই কমান্ডের নির্দেশ পালন করেন, এইসব নেতা সেই দিকে লক্ষ রাখবেন। সবার উপরে, মহাত্মা গান্ধী যে তাঁর সাময়িক অবসরগ্রহণ সত্ত্বেও গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে ঘটনাপ্রবাহের দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন, তাতে কারও কোনও সন্দেহ নেই যে, যদি সেরকম অবস্থার উদ্ভব হয়, হবে বলেই সব দিক থেকে মনে হচ্ছে, তিনি আর একবার প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসে কংগ্রেসকে নিয়মতান্ত্রিক কার্যকলাপ পরিহার করার আবেদন জানাতে দ্বিধা করবেন না এবং কংগ্রেস যাতে ভারতের "পূর্ণ স্বরাজ" জয় করার জন্য শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে সেইজন্য "গণ সত্যাগ্রহের" পতাকা উত্তোলন করবেন।

ভারতের শিল্প-সমস্যা

২ অক্টোবর ১৯৩৮, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত শিল্পমন্ত্রীগণের এক অধিবেশনে প্রদত্ত সম্পূর্ণ ভাষণ।

অসুবিধা ও সময়ের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও আপনারা যে আমার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এই অধিবেশনে যোগদান করেছেন এইজন্য প্রারম্ভে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রদেশে কংগ্রেস সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এই ধরনের অধিবেশন এই প্রথম। কংগ্রেস সদস্যদের মন্ত্রিপদ গ্রহণ করতে অনুমতি দেবার পর থেকেই দেশে শিল্পের বিকাশসাধনের সমস্যা এবং ওই উদ্দেশ্যে আমাদের সহায়সম্বল সমন্বিত করার প্রশ্ন ওয়ার্কিং কমিটির গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছে।

১৯৩৭-এর আগস্ট মাসে যে বৈঠক হয় তাতে ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে:

> জরুরি ও অত্যাবশ্যক যে সকল সমস্যার সমাধান জাতীয় পুনর্গঠন ও সমাজ উন্নয়নের যে-কোনও পরিকল্পনার পক্ষে আবশ্যক সেই সকল সমস্যা বিবেচনা করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির নিকট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের সুপারিশ করিতেছে। এইপ্রকার সমাধানের জন্য প্রয়োজন হইবে ব্যাপক সমীক্ষা, তথ্যসংগ্রহ এবং তৎসহ সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত সামাজিক লক্ষ্য। এইসব সমস্যার অনেকগুলিকেই প্রাদেশিক ভিত্তিতে সার্থকভাবে মীমাংসা করা যাইবে না। পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির স্বার্থও তাহাদের সঙ্গে জড়িত। সর্বনাশা বন্যা নিরোধ করিতে, সেচের জল ব্যবহার করিতে, ভূমিক্ষয় সমস্যা বিবেচনা করিতে, ম্যালেরিয়া দূর করিতে এবং জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনার বিকাশ ও অন্যান্য পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে একটি নীতি নির্ধারণের জন্য সর্বাত্মক নদী সমীক্ষার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র নদী উপত্যকায় সমীক্ষা ও অনুসন্ধান চালাইতে হইবে এবং ব্যাপকহারে রাজ্য পরিকল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে। শিল্পসমূহের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্যও কয়েকটি প্রদেশের মিলিতভাবে কাজ করিবার ও কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। অতএব ওয়ার্কিং কমিটি এই নির্দেশ দিতেছে যে, যে-সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাদের সাধারণ প্রকৃতি বিবেচনা করিতে এবং কী প্রকারে ও কোন ক্রমে তাহাদের সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে সেই সম্পর্কে পরামর্শ দিতে প্রারম্ভে একটি আন্তঃপ্রাদেশিক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হউক। এইপ্রকার প্রতিটি সমস্যা পৃথকভাবে বিবেচনা করিবার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারগুলিকে মিলিতভাবে কাজ করা সম্পর্কে উপদেশ দিবার জন্য এই বিশেষজ্ঞ কমিটি বিশেষ বিশেষ কমিটি বা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করিতে পারে।

গত মে মাসে বোম্বাইয়ে আমি সাতটি কংগ্রেস প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের একটি অধিবেশন আহ্বান করি। তাতে ওয়ার্কিং কমিটির কিছু সদস্য ছাড়াও কয়েকজন মন্ত্রী যোগদান করেন। সেই উপলক্ষে, আপনাদের মধ্যে কারও কারও হয়তো মনে আছে, আমরা শিল্প পুনর্গঠনের সমস্যা নিয়ে এবং শক্তি-উৎসের ও শক্তি-সরবরাহের বিকাশসাধন, সেইসঙ্গে কংগ্রেস প্রদেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও কাজের সমন্বয়সাধনের সাধারণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি। আমার যদি

ঠিকমতো মনে থাকে, তবে যাঁরা ওই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন তাঁদের অভিমত এই ছিল যে, উল্লিখিত সমস্যাগুলি সম্পর্কে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলিকে উপদেশ দেবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির দিক থেকেই বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের প্রাথমিক প্রয়াস করা উচিত।

গত জুলাই মাসে ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে:

> একটি সারা ভারত শিল্প পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ সম্পর্কে ১৪-১৭ আগস্ট, ১৯৩৭ ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল তৎসূত্রে এই প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে যে, প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে প্রেসিডেন্টকে অধিকার দেওয়া হউক যাহাতে তিনি সত্বর একটি দিন স্থির করিয়া শিল্প-মন্ত্রীদিগকে একটি অধিবেশনে আহ্বান করেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে বর্তমান শিল্পগুলি সম্পর্কে এবং নূতন নূতন শিল্পের সম্ভাবনা ও চাহিদা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট চাহিয়া পাঠান।

এই প্রস্তাব অনুযায়ী এই অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে।

আমাদের আজকের জাতীয় জীবনে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা যখন এত বিরাট আকার ধারণ করেছে, আমার এ-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমাদের যাবতীয় সহায়সম্বলকে জাতির সর্বাধিক উপকারে নিয়োগ করার প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের কৃষিসমাজের নিদারুণ দুর্দশার অবসান ঘটানো এবং জীবিকার সাধারণ মান উন্নয়ন করা একান্ত আবশ্যক। কেবলমাত্র কৃষির উন্নতিতেই তা সম্ভব হবে না। কৃষিপদ্ধতিতে অধিকতর নৈপুণ্য নিশ্চয় বাঞ্ছিত, তার দ্বারা অনেক বেশি পরিমাণে এবং সস্তায় আমরা খাদ্য পেতে পারি এবং জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষিজাত জিনিসও পেতে পারি ঠিক, কিন্তু এই উপায়ে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। কথাটা বিরুদ্ধার্থক মনে হতে পারে কিন্তু সামান্য বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে, আরও বেশি নৈপুণ্যের অর্থ দাঁড়াবে এখনকার থেকে কম-সংখ্যক কৃষকদের দিয়ে একই পরিমাণ কৃষির উৎপাদন। তাই যদি হয়, বৈজ্ঞানিক কৃষির ফলে এখন বেকার সমস্যার যা পরিস্থিতি তা আরও শোচনীয় হতে পারে।

এই দারুণ সমস্যাকে আমরা তা হলে কীভাবে আয়ত্তে আনব? আমাদের লক্ষ্য প্রত্যেকে—নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে—যাতে আরও ভাল পরতে পায়, আরও ভাল শিক্ষা পায়, বিশ্রাম ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য যথেষ্ট অবসর পায়। এই লক্ষ্যে যদি পৌঁছতে হয় শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়াতে হবে, অপরিহার্য কাজগুলিকে সংগঠিত করতে হবে এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার বিরাট অংশকে শিল্পসংক্রান্ত নানা কাজে নিয়োজিত করতে হবে।

ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যার সংগতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান। অফুরন্ত তার ধাতব সম্পদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্ভাবনা। দরকার দেশের সর্বাধিক স্বার্থে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিতভাবে আমাদের সেগুলিকে কাজে লাগানো। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ যারা সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তারা পুরোমাত্রায় তাদের শিল্পবিকাশের মধ্যে দিয়েই তা করেছে। এখানে আমি একটিমাত্র দেশের কথা উল্লেখ করব। মহাযুদ্ধের আগে রাশিয়ার অবস্থা ভারতের চেয়ে কোনও অংশে ভাল ছিল না। সে দেশ ছিল প্রধানত কৃষিনির্ভর, জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ ছিল কৃষক এবং আমাদের আজকের কৃষকদের মতোই দুঃস্থ ও হতভাগ্য। শিল্প ছিল অনগ্রসর অবস্থায়, প্রাকৃতিক শক্তির উৎপাদন তেমন বিকাশলাভ করেনি এবং এই শক্তির ব্যবহার বিলাসিতা বলে গণ্য হত। দেশের শক্তি-সম্ভাবনা সম্পর্কে না ছিল জ্ঞান, না ছিল তেমন বিশেষজ্ঞ বা প্রয়োগকুশলী। কিন্তু গত ষোলো বছরের মধ্যে নিরন্ন চাষিদের সেই দেশ সুপুষ্ট ও সুসজ্জিত শিল্পশ্রমিকদের এক দেশ



সভাপতি, হরিপুরা কংগ্রেস, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮



ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির উদ্বোধন করছেন, ১৯৩৮

হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য, রোগ ও দুর্ভিক্ষের যে সমস্যা বিপ্লবের আগেকার কৃষিসমাজের উপর নিয়ত ভর করে থাকত সেই সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে সে দেশ বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে। এর প্রধান কারণ দেশব্যাপী সুপরিকল্পিত শিল্পযোজনা, যার জন্য আগে থেকে ভাবতে হয়েছে বৈদ্যুতিকরণের সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার কথা। যে রাজনৈতিক মতবাদের উপর রুশ রাষ্ট্রের ভিত্তি তার কথা না ধরলেও, অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে রাশিয়ার চমকপ্রদ এই অগ্রগতি আমাদের সযত্ন অনুশীলন ও অভিনিবেশ দাবি করে। কেবলমাত্র রাশিয়ার যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের মিল আছে বলেই সে-দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, সেইসঙ্গে এও দেখাতে চেয়েছি সুবিন্যস্ত শিল্পযোজনার পরিকল্পনা সর্বাত্মক সমৃদ্ধির পথে আমাদের কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ক্ষমতা দখল আমাদের দৃষ্টিসীমার ভিতরে এসে পড়েছে এবং স্বরাজ আর স্বপ্নমাত্র নয় যা সুদূর ভবিষ্যতে রূপ পরিগ্রহ করবে, এই কথা বিবেচনা করে আমরা যারা কংগ্রেস-সেবক আমাদের কেবলমাত্র স্বাধীনতার প্রয়াস করলেই চলবে না। আমাদের চিন্তার ও সামর্থ্যের কিছুটা অংশ জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যাতেও নিয়োজিত করতে হবে। জাতীয় পুনর্গঠন সম্ভব হবে কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সহায়তায়। এদেশে শিল্পীয় পুনরুদ্ধার সম্ভবপর করার জন্য নানা পরিকল্পনা নিয়ে আজকাল অনেক অসংযত কথাবার্তা চলেছে। আমার মতে আমাদের প্রধান যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা শিল্পের পুনরুদ্ধার নয়, শিল্পযোজনা। বিবর্তনের ধারায় ভারতবর্ষ এখনও প্রাক্-শিল্পীয় স্তরে রয়েছে। শিল্পবিপ্লবের যন্ত্রণা আমরা যতক্ষণ না পার হয়ে যাচ্ছি, শিল্পে কোনওপ্রকার অগ্রগতি সম্ভব নয়। শিল্পবিপ্লব যদি অশুভ হয়, সেই অশুভ প্রভাব আবশ্যক। অন্যান্য দেশে শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে কুফল দেখা দিয়েছে, আমরা কেবল সাধ্যমতো তা লাঘব করার চেষ্টা করতে পারি। এছাড়াও আমাদের স্থির করতে হবে এই বিপ্লব গ্রেট ব্রিটেনে যেমন হয়েছে তেমনই অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে হবে, না সোভিয়েত রাশিয়ার মতো জোর কদমে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমার ভাবনা হচ্ছে, এদেশে জোর কদমেই তা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজকের দুনিয়া যেভাবে গঠিত, যে-সমাজ শিল্পযোজনার প্রতিবন্ধক হবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তার টিকে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম।

এইখানে আমি যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে বলে রাখতে তাই, কুটীরশিল্পের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের বিরোধ হওয়ার কোনও কারণ নেই। এরকম বিরোধ যদি থাকে, তার কারণ বোঝার ভুল। কুটীরশিল্প উন্নয়নের যে প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী, যদিও সেইসঙ্গে আমি এও মনে করি শিল্পযোজনার সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করে নিতেই হবে। আমরা দেখেছি ইউরোপের প্রথম সারির শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও বহুসংখ্যক কুটীরশিল্প এখনও রয়েছে এবং ভালভাবেই চলছে। আমাদের দেশেও আমরা এইরকম অনেক কুটীরশিল্পের কথা জানি—যেমন তাঁত শিল্প—যা ভারতীয় ও বিদেশি মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে আছে এবং একটুও হটে আসেনি। অতএব শিল্প যোজনার অর্থ এই নয় যে আমরা কুটীরশিল্পের দিকে পিছন ফিরে থাকব। মোটেই তা নয়। এর অর্থ কেবল এই যে, আমাদের স্থির করে নিতে হবে কুটীরশিল্পের ভিত্তিতে কোন কোন শিল্পের এবং বৃহৎ শিল্পের ভিত্তিতে কোন কোন শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। ভারতে বর্তমানে যে অদ্ভুত ধরনের জাতীয় অর্থনীতি চালু রয়েছে সেইদিক থেকে এবং আমাদের দেশবাসীর সীমিত সামর্থ্যের কথা মনে রেখে বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কুটীরশিল্পের উন্নতিসাধন করতে পারলে আমরা সবচেয়ে উপকৃত হব।

শিল্পগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে—ভারী, মাঝারি এবং কুটীর শিল্প। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির দিক থেকে বর্তমানে ভারী শিল্পের মূল্য যে সর্বাধিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারী শিল্পই আমাদের জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড। দুর্ভাগ্যক্রমে এইদিকে

আমরা বেশি অগ্রসর হতে পারছি না, অন্তত যতদিন কেন্দ্রে আমরা ক্ষমতা দখল করে আমাদের রাজস্ব নীতি নিয়ন্ত্রণের পুরো অধিকার না পাচ্ছি। মাঝারি ধরনের শিল্পগুলি প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীরা সরকারের সহযোগিতায় ও সাহায্যে শুরু করতে পারে। কুটীর শিল্প সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি বৃহৎ শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে এইপ্রকার শিল্পের উন্নয়নের বিরোধ থাকার কোনওই কারণ নেই।

জাতীয় পরিকল্পনার মূল নীতি সম্পর্কে আমি এখন কয়েকটি কথা বলতে চাই:

(ক) যদিও শিল্পের দিক থেকে সারা পৃথিবী একযোগে যুক্ত, তা সত্ত্বেও বিশেষত আমাদের প্রধান প্রধান চাহিদা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, জাতীয় স্বয়ংভরতাকে আমাদের লক্ষ্য বলে মেনে নেওয়া উচিত।

(খ) যাতে শক্তি সরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রোপকরণ তৈরি, মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত, পরিবহণ ও যোগাযোগ শিল্প, ইত্যাদি—এইসব মূল শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন হয় এইরকম নীতি আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

(গ) আমাদের টেকনিকাল শিক্ষা ও টেকনিকাল গবেষণা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। টেকনিকাল শিক্ষার ব্যাপারে, জাপানি ছাত্রদের বেলায় যেমন করা হয়, আমাদের ছাত্রদেরও একটি সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদেশে পাঠানো হবে যাতে তারা দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শিল্পগঠনের কাজে সরাসরি লেগে যেতে পারে। টেকনিকাল গবেষণার ব্যাপারে আমরা নিশ্চয়ই একমত যে, সর্বপ্রকার সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে এই গবেষণাকে মুক্ত রাখা বিধেয়।

(ঘ) একটি স্থায়ী জাতীয় গবেষণা কাউন্সিল থাকবে।

(ঙ) পরিশেষে, তবে শেষ বলে তুচ্ছ নয়, জাতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে এবং জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে বর্তমান শিল্প-পরিস্থিতির উপর অর্থনৈতিক একটি সমীক্ষা হওয়া উচিত।

এই অধিবেশনে আপনাদের বিবেচ্য হতে পারে এইরকম কয়েকটি সমস্যার প্রতি আমি এখন আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

(১) প্রতিটি প্রদেশে ঠিকমতো অর্থনৈতিক সমীক্ষা করার ব্যবস্থা।

(২) কুটীর শিল্পের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের সমন্বয়সাধন, যাতে উভয়ে একই ক্ষেত্রে ব্যাপৃত না থাকে।

(৩) আঞ্চলিকভাবে শিল্প বণ্টন করার যৌক্তিকতা।

(৪) আমাদের ছাত্রদের জন্য ভারতে এবং বিদেশে টেকনিকাল ট্রেনিং সংক্রান্ত নিয়মাবলি।

(৫) টেকনিকাল গবেষণার যথোচিত ব্যবস্থা।

(৬) শিল্পযোজনার সমস্যা সম্পর্কে আরও পরামর্শ দেবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের যৌক্তিকতা।

যদি এই অধিবেশনে এই সমস্যাগুলির সমাধানে আমরা প্রবৃত্ত হতে পারি, আজ অপরাহ্ণে আমাদের এখানে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য যে তাতে সফল হবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। প্রথমেই আমি আপনাদের জানিয়ে রেখেছি, বিভিন্ন প্রদেশে যেসব শিল্প আছে তাই নিয়ে, সেইসঙ্গে নতুন নতুন শিল্পের চাহিদা ও সম্ভাব্যতার প্রশ্ন নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। এই কর্তব্য কেবলমাত্র তখনই আমরা করে উঠতে পারব যখন আমরা নানারকমের সমস্যার সমাধান করব, যার কিছু কিছু উল্লেখ আমি করেছি।

পরিশেষে, আমি আন্তরিক এই আশা প্রকাশ করছি যে, আপনাদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় এই অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং আমাদের দরিদ্র ও নির্যাতিত দেশের শিল্পজাগরণে তা শক্তিশালী এক প্রেরণা হবে।

ছাত্র আন্দোলন

২৯ অক্টোবর ১৯৩৮, এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত উত্তরপ্রদেশ ছাত্র অধিবেশনে প্রদত্ত বাণী।

ভারতের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বরাবর ঘনিষ্ঠ এবং তার নানা কারণ আছে। আমার ছাত্রাবস্থায় অভিজ্ঞতার অনেক বছর আগে থেকেই আমার দৃঢ় ধারণা হয় যে, ছাত্ররা যদি আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় এবং মহান এক দেশের নাগরিকরূপে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য তৈরি হতে চায় তা হলে তাদের নিজস্ব সংগঠন থাকা একান্ত দরকার। সংকীর্ণ অর্থে ছাত্র বলতে যা বোঝায় সেই ছাত্রাবস্থা যখন আমার শেষ হল তখন আমি সংকল্প করি যে, যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে এবং যদি তা দেখা দেয় আগামী যুগের ছাত্রদের সাহায্যের জন্য আমার যতখানি সাধ্য আমি তাই করব।

সারা পৃথিবীতে যেখানে যত ছাত্র আছে তাদের মধ্যে জাতীয় ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের এক ভ্রাতৃসংঘের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে এবং ঠিকই করে। এ শুধু কথার কথা নয় যে, আজকের ছাত্র কালকের নেতা এবং ছাত্ররাই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত প্রতীক। সচরাচর ছাত্ররাই জাতির সবচেয়ে আদর্শবাদী অংশের প্রতিনিধি এবং সহজাত এই আদর্শবাদের দরুনই দুনিয়ার সব ছাত্র বিরাট এক ভ্রাতৃসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেদের মনে করে। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে এই সংহতি বোধ জাগ্রত করা আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত, যাতে তাদের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জনগণ চিরদিনের জন্য এক জাতি হয়ে গড়ে ওঠে।

স্বাধীন দেশের ছাত্ররা, স্বাধীন পুরুষ ও স্বাধীন নারী যে-অধিকার ভোগ করে, তারাও তাই ভোগ করে, কিন্তু আমাদের ছাত্রদের কথা অন্য। আমাদের ছাত্রদের বাধানিষেধ অনেক, পরাধীন জাতির লোকদের তা বিধিলিপি। ঘরে-বাইরে তাদের অভিভাবকদের চোখে তারা নাবালক; রাষ্ট্রের কাছে সাধারণত তারা রাজনৈতিক সন্দেহভাজন। (কংগ্রেস সরকার হবার পর থেকে অবস্থার উন্নতি ঘটেছে।) এই অবস্থায় ছাত্রদের শিখতেই হবে নিজেরা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। বয়স্ক নারী-পুরুষের মতো ব্যবহার পাবার জন্য তাদের জিদ করতে হবে এবং স্বাধীন জাতির লোকেরা যে সকল অধিকার লাভ করে তার জন্য দাবি করতে হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রেই হোক, সরকারি পর্যায়েই হোক, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ নেহাত কম হয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ সাধারণত তখনই বাধে যখন ছাত্রদের ছাত্র-অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে যখন তাদের নাগরিক-অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। উভয়ক্ষেত্রেই ছাত্ররা তখনই নিজেদের ন্যায্য দাবি আদায়ের আশা করতে পারে যখন তারা ঠিকমতো সংগঠিত। অতএব সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথমে যা করা কর্তব্য, তা সংগঠন। ছাত্রদের অধিবেশন তখনই স্থায়ী উপকারসাধন করতে পারে যখন তা অনুপ্রেরণা জোগায়। ছাত্রদের অধিকার আদায় করার জন্য সংগঠনই কিন্তু সব নয়। দৈহিক, বুদ্ধিগত ও নৈতিক শিক্ষাদানও সংগঠনের লক্ষ্য হওয়া উচিত যাতে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে ছাত্ররা আরও উন্নত মানুষ ও আরও ভাল নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, ছাত্র আন্দোলন মঞ্চ আরও ব্যাপকভিত্তিক হওয়া চাই এবং তা সবরকম মতের ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত। যদি কোনও বিশেষ পার্টির, দলের বা মতাদর্শের ছাত্ররা অপর ছাত্রদের বাদ দিয়ে কর্তৃত্ব দখলের প্রয়াস করে তখনই সর্বনাশের সূচনা

হবে। তাই যদি ঘটে, ছাত্র আন্দোলন ভেঙে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং একাধিক ছাত্র ফেডারেশনের আবির্ভাব ঘটবে। তোমাদের আলাপ-আলোচনায় স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও প্রগতির আদর্শে তোমাদের দৃষ্টি সমুন্নত রেখো এবং সর্বদা মনে রেখো স্বাধীনতার অর্থ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি।

আমাদের প্রয়োজন এবং আমাদের কর্তব্য

ন্যাশনাল ফ্রন্ট পত্রিকায় ১৯৩৮ সালের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ।

আজকের দিনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব ও শক্তির রহস্য কী তা যদি বিশ্লেষণ করি, আমরা তা হলে দেখব এর কারণ তিনটি।

(১) কংগ্রেসের বিপুল সভ্যসংখ্যা।

(২) কংগ্রেসের সংগঠন এবং নিয়মনিষ্ঠা এবং

(৩) গত তিপ্পান্ন বছর ধরে অনুসৃত কংগ্রেসকর্মীদের সেবা ও আত্মত্যাগের আদর্শ।

১৮৮৫ সালে পত্তন হবার পর থেকে কংগ্রেস অনেক পথ অতিক্রম করেছে এবং ভারতীয় জনগণকে তাদের স্বরাজ বা স্বাধীনতার লক্ষ্যের অনেক কাছে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। যদিও ক্ষমতা আমাদের গোচরের মধ্যে, আমাদের সামনে সংগ্রাম এখনও বাকি আছে। যদি আমরা স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছতে যাত্রাপথের এই সংগ্রামকে শেষ বাধা বলে গণ্য করি, তা হলে আমাদের তিনটি কাজ করতে হবে। কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা এমন বাড়াতে হবে যাতে আমাদের দেশবাসী বিপুল সংখ্যায় কংগ্রেসের আওতার মধ্যে আসে। আমাদের সংগঠনকে ও নিয়মানুবর্তিতাকে নিখুঁত করতে হবে এবং পরিশেষে, শেষ বলেই নগণ্য নয়, অনেক বেশি দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত তিনটি আবশ্যকতার প্রথমটি সম্পর্কে আমি প্রধানত আলোচনা করতে চাই।

যে রাজনৈতিক সংগঠন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ না করে অহিংস পদ্ধতিতে দীক্ষিত, সেই সংগঠনে সংখ্যাগত প্রশ্নের গুরুত্ব অত্যধিক। অহিংস সংগ্রামের চরম অস্ত্র সত্যাগ্রহ বা গণ আইন অমান্য, যার পূর্বশর্ত এক পতাকাতলে জনগণের সমাবেশ ঘটানো। কংগ্রেস যে অনুপাতে জনসাধারণকে তার আওতার মধ্যে টানতে সক্ষম হয়েছে, কংগ্রেসের প্রভাব ও শক্তি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে, সেই উপলক্ষে মাত্র জনকয়েক মধ্যবিত্ত ও বর্ধিষ্ণু শ্রেণির বুদ্ধিজীবী সেখানে সমবেত হয়। এখন কংগ্রেসের অধিবেশনে যত পারা যায় তত লোকের সমাগম হতে পারে।

এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, মহাত্মা গান্ধীই প্রথম নেতা যিনি কংগ্রেসকে এ দেশের জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনেন। মহাত্মা গান্ধীর যে ব্যক্তিত্ব ও কার্যক্রম জনসাধারণকে কংগ্রেসের দিকে অভূতপূর্বভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছে আমি তা বিশ্লেষণের প্রয়াসী নই। মহাত্মা গান্ধী যে প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করেছিলেন এখন তাকে যথার্থ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে। কি করে তা সম্ভবপর হবে? অসংখ্য ভ্রান্ত ও নগণ্য বিষয় অগণিত মূক জনমানবকে বিপথে

চালিত করতে চাইছে, চাইছে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করতে ও শক্তিক্ষয়ী নানা প্রবণতায় ইন্ধন জোগাতে। এদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করার অস্ত্র দ্বিমুখী— রাজনৈতিক এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক দিকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার প্রলোভনকে প্রতিহত করতে আমাদের জাতীয়তার আবেদনের উপর জোর দিতে হবে।

দলগত বা সম্প্রদায়গতভাবে নয়, জাতিগতভাবে আমাদের সবাইকে অনুভব করতে ও চিন্তা করতে শিখতে হবে। সামাজিক-রাজনৈতিক দিকে আমাদের নিরক্ষর দেশবাসীদের চোখ খুলে দিতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে, জাতি ধর্ম ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ এক এবং তার সমাধান হতে পারবে একমাত্র তখনই আমরা স্বাধীন হব এবং জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিনিধি এক জাতীয় সরকার গঠিত হবে।

অর্থনৈতিক যে প্রশ্নগুলি সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বাধাকে অতিক্রম করে, সেই প্রশ্নগুলির উপর জোর দেওয়া একান্ত দরকার। দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা, নিরক্ষরতা ও রোগের সমস্যা, করভার ও ঋণদায়ের সমস্যা হিন্দু মুসলমান ও জনসাধারণের অন্যান্য অংশকে সমানভাবে উৎপীড়িত করে। জনসাধারণকে এ-কথা বোঝানো সহজ হবে যে, রাজনৈতিক সমস্যার পূর্ব-সমাধানের উপর, অর্থাৎ জাতীয়, জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপর তাদের সব সমস্যার সমাধান নির্ভর করে।

উপরে যেভাবে বলা হয়েছে সেইভাবে বিজ্ঞানসম্মত গণ-প্রচার যদি চালিয়ে যাওয়া যায়, তা হলে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সব মানুষকে তা স্বরাজের পতাকাতলে নিশ্চয় টেনে আনবে। হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ যখন কংগ্রেসে যোগ দিতে আসবে কংগ্রেসের শক্তি ও প্রভাবও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। একমাত্র সমস্যা তখন যা থেকে যাবে তা এই, এই বিপুল সদস্য সংখ্যাকে সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা এবং স্বরাজলাভের জন্য ভবিষ্যৎ সংগ্রামে যে দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগ করতে হবে তার জন্য প্রস্তুত করা।

প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই। বিজ্ঞানসম্মত প্রচারকার্যের ফলে নতুন যেসব সভ্য কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হবে তারা যেন তাড়া-খাওয়া বোবা মেষপালের মতো না হয়। তাদের কর্মোদ্যমে ভরপুর জীবন্ত মানুষ হতে হবে। ব্যক্তি হিসেবে সভ্যদের মধ্যে উদ্যমের অভাব থাকলে তারা যেসব কমিটি গঠন করবে সেখানেও সক্রিয়তার অভাব দেখা দেবে। তা হলে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। ভারতবর্ষে গণতন্ত্র নির্ভর করবে ব্যক্তির উদ্যমের উপর এবং অধস্তন কংগ্রেস কমিটিগুলির সক্রিয়তার উপর। এই কর্মোদ্যম যদি নীচে থেকে না এসে, উপর থেকে আসে, তা হলে গণতন্ত্র প্রায় সর্বগ্রাসী শাসনতন্ত্রে (totalitarianism) পর্যবসিত হবে। আমরা এই পরিণতির জন্য কাজ করে যাচ্ছি না। অতএব আমরা যেন একথা মনে রাখি, ব্যক্তিগত উদ্যমকে সর্বদা উৎসাহ দিতে হবে, জাগিয়ে তুলতে হবে এবং অধস্তন কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সদাসর্বদা সতর্ক ও সক্রিয় অবস্থার মধ্যে রাখতে হবে।

বর্তমান সময়ে আমাদের প্রয়োজন ও আমাদের কর্তব্য বাস্তবিক সহজ। কিন্তু তা পূরণ এবং পালন করা দুঃসাধ্য প্রয়াসের অপেক্ষা রাখে। নষ্ট করার মতো সময় নেই; অতএব আসুন, এই গুরুদায়িত্ব পালনে সকলে কাঁধ লাগাই।

ইউরোপীয় সংকট—বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণ

১৯৩৮ অক্টোবর সংখ্যায় দি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পত্রে প্রকাশিত স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ।

নানা লোকে নানা দিক থেকে সাম্প্রতিক ইউরোপীয় সংকটের পর্যালোচনা ও ব্যাখা করেছেন। পাঠকদের কাছে এইরকম আরও একটি পর্যালোচনা এখানে নিবেদন করা হচ্ছে।

১৯৩৮-এর ১৯ জানুয়ারি আমি যখন প্রাগের মধ্য দিয়ে যাই, তখন চেকোস্লোভাক রিপাবলিকের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ডক্টর বেনেশ কর্তৃক সংবর্ধিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এর আগে তাঁর সঙ্গে আরও দু'বার সাক্ষাতের সুযোগ আমার হয়েছে, তখন তিনি প্রেসিডেন্ট মাসারিকের অধীনে বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর এক ঘণ্টা কথা হয়, তারই মধ্যে তিনি আমাকে জানান, চেকোস্লোভাকিয়া সেই সময়ে যত নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত বোধ করছিল আগে কখনও তা করেনি। সবারই মতে ডক্টর বেনেশ ইউরোপের সবচেয়ে বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিবিদদের মধ্যে একজন, এমনকী তিনিও বুঝতে পারেননি যে তিনি আগ্নেয়গিরির উপরে বসে আছেন। বাস্তবিকই, আমাদের মধ্যে যে অতি বুদ্ধিমান সেও মারাত্মক ভুল করে বসে। চেক মাজিনো লাইন এবং সদ্য গড়ে তোলা বিমানবাহিনী প্রেসিডেন্টকে নিরাপত্তাবোধে নিশ্চিন্ত করেছিল।

পরের দিন আমি ভিয়েনা অতিক্রম করি। অস্ট্রিয়ায় সাধারণত যেমন থাকে, তেমনি সবই শান্ত। মনে হল চান্সেলাররূপে শুশনিগ নিরাপদেই অধিষ্ঠান করছেন এবং কালো সাজ পরা যাজক ও কালো সার্ট পরা ফ্যাসিস্টদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে বিনা ঝঞ্ঝাটে অস্ট্রিয়ার শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর জানা ছিল না যে কয়েক মাসের মধ্যে নাৎসিরা অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করবে এবং তিনি যেমন শত শত অস্ট্রিয়ান সমাজতন্ত্রীদের কারারুদ্ধ করেছেন, তাদের মতো তাঁকেও বন্দি করা হবে।

এর আগে নাৎসিরা ভার্সাই চুক্তি ছিঁড়ে ফেলেছে এবং সামরিক দখলের জন্য রাইনল্যান্ডে প্রবেশ করেছে। ফরাসি গুপ্তচর বিভাগ ফরাসি সরকারের কাছে এই মর্মে এক রিপোর্ট পাঠায় যে, রাইশভেরের (জার্মান সেনা) কাছে হিটলারের নির্দেশ আছে, ফরাসি সেনাবাহিনী যদি জার্মানি আক্রমণ করে, রাইশভের যেন পিছু হটে আসে এবং যুদ্ধে নিজেদের না জড়ায়। হিটলারকে তার চাল চালতে বাধ্য করানোর মতো হিম্মত ব্লুম-এর ছিল না।

বৃহৎ শক্তিবর্গ অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গ্যারান্টি দিয়েছিল কিন্তু নাৎসিরা যখন অস্ট্রিয়া আক্রমণ করে দখল করে নিল তখন সামান্য প্রতিবাদ জানাবারও সাহস কারও ছিল না। ১৯৩৪-এর জুলাইয়ে ডলফাসকে যখন হত্যা করা হয় তখন জার্মানরা অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করলে ইতালি জার্মানি আক্রমণ করবে বলে শাসিয়েছিল। সেই ইতালির ১৯৩৮-এ একেবারে অন্য চেহারা।

মোটেই তাই আশ্চর্য হবার কথা নয় যে, জার্মানি অস্ট্রিয়াকে গ্রাস করে খুশি হয়ে না থেকে কয়েক মাসের মধ্যে সুদেতেনল্যান্ডকে তার অধিকারভুক্ত করতে চাইল। আবার হিটলার ভাবলেন তাকে তার চাল চালতে বাধ্য করার মতো সাহস কারও নেই।

কোন ভরসায় হিটলার নতুন আক্রমণ চালাবার কথা ভাবলেন? হিটলার আশ্বাস পেয়েছিলেন, ইতালি এতে আপত্তি করবে না এবং তিনি জানতেন বৃহৎ শক্তিবর্গ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ

করতে সাহস পাবে না। তারা, বিশেষ করে ইংল্যান্ড, যুদ্ধসরঞ্জামের আয়োজনে প্রস্তুত নয়। অতএব হিটলারের মূলমন্ত্র হল, 'হয় এখনই করো নইলে কখনও নয়'।

একথা বলা হয়, চেম্বারলেন যখন হিটলারের সঙ্গে দেখা করার জন্য এরোপ্লেনে চেপে ছুটেছিলেন হিটলার তখন চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করার মুখে। সত্যিই কি এরকম আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল, না, সবটাই ধাপ্পা? আমার মত যদি জানতে চান, আমি বলব, একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি জার্মানি কখনওই নিত না, যেহেতু সে জানত তা হলে গ্রেট ব্রিটেন তার বিরোধীপক্ষে যাবে। সেইজন্য, আমার মনে হয়, ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞরা হয় হিটলারের কাছে বোকা বনেছে কিংবা ইউরোপীয় ভূভাগের উপর জার্মান কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য স্বেচ্ছায় তাদের মদত দিয়েছে। হিটলারের কাছে ব্রিটিশের আত্মসমর্পণের অর্থ দাঁড়াল ইঙ্গ-ফরাসি মৈত্রী চুক্তির জায়গায় ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রী কার্যত বহাল হওয়া। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ফরাসি অনুগামী দলকে মন্ত্রিসভার জার্মান-অনুগামী দল উৎখাত করল।

কিন্তু ফ্রান্স কেন এই ভীতি প্রদর্শনের কাছে মাথা নোয়াল? এ এমন একটি প্রশ্ন যার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর। মহাযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে ফরাসিদের ছিল একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। রাতারাতি সেই কর্তৃত্ব লোপ পেল এবং ফ্রান্স এখন ইউরোপের দ্বিতীয় শ্রেণির শক্তি। আমি ভাবিনি, ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা বিনা লড়াইয়ে এই অধঃপতনকে মেনে নেবে। আর ফরাসি সমাজতন্ত্রীরা? তারাই বা কি বলে ওদের অনুগামী হতে স্বীকার করল? আমার যেন মনে হয়, ওরা হীনমন্যতায় ভুগছে। সেইজন্য হিটলারের সামনে তারা রুখে দাঁড়াতে পারেনি। যুদ্ধের সম্ভাবনায় ব্লুম এতই ভয় পেয়েছিলেন যে যা করা তাঁর উচিত ছিল তা তিনি করতে পারেননি।

কিন্তু ফ্রান্স চেকোস্লোভাকিয়াকে বাঁচাতে পারত এবং সেইসঙ্গে পারত যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে। ফরাসিরা যদি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্রিটেন ও জার্মানিকে জানিয়ে দিত যে তারা চেকোস্লোভাকিয়ার পক্ষে আছে, তা হলে রাশিয়াও এসে যোগ দিত। এবং যেহেতু রাইন এখন গ্রেট ব্রিটেনের সীমান্ত, ফ্রান্সকে সে কখনওই ত্যাগ করত না। আমার এক বন্ধু সদ্য ইউরোপ থেকে এসেছেন। তিনি বলছিলেন বেলজিয়ামে যুদ্ধের সব আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল। তা হলে ১৯১৪-র ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হত। নাৎসি জার্মানি সম্পর্কে আমি যা জানি তাতে একথা বলতে পারি, ১৯১৪ সালের মতো পরিস্থিতি দেখা দিলে নাৎসিরা দমে যেত।

আমার সুচিন্তিত ধারণা এই, ব্রিটেন যদি জার্মানিকে এই মর্মে জানিয়ে দিত যে ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকিয়ার পক্ষে সে থাকবে, হিটলারের চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করার সব মতলব ত্যাগ করার পক্ষে তাই যথেষ্ট হত।

ফরাসি ও ব্রিটিশদের এই বিশ্বাসঘাতকতায় চেকোস্লোভাকিয়ার করণীয় কী ছিল? আমার কিন্তু মনে হয়, যদি সে জার্মান আক্রমণে টিকে থাকতে পারত, হয়তো সে ফ্রান্স ও রাশিয়াকে এবং শেষ পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনকেও যুদ্ধে নামিয়ে আনতে পারত। কিন্তু যতই হোক এ শুধু দূর কল্পনা। ডক্টর বেনেশ স্বচক্ষে দেখেছেন আবিসিনিয়ার ভাগ্যে কী ঘটেছে। হয়তো তিনি ভেবেছেন, বাস্তববাদী রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে নেগুসের পক্ষে হোর-লাভাল চুক্তির প্রস্তাব মেনে নিলেই ভাল হত। এইজন্যই তিনি জার্মানিকে সুদেতেনল্যান্ড ছেড়ে দেন এবং পোল ও হাঙ্গেরীয়দের খুশি করার পর তাঁর দেশের যতটুকু অংশ টিকে ছিল তাই নিয়েই তৃপ্ত থাকেন।

এইমাত্র আমরা যা দেখলাম তা একটি নাটকের প্রথম দৃশ্য, সম্ভবত তার পরিসমাপ্তি হবে চতুঃশক্তি এক চুক্তিতে, ফ্রান্সের জয়ে এবং ইয়োরোপীয় রাজনীতি থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার অপনয়নে। আসলে, সারা ইউরোপে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিজ্ঞদের মতলব এই। তারা কি সফল হবে? কে বলতে পারে?

একটি ব্যাপার মনে হয় স্পষ্ট। সোভিয়েত রাশিয়া যদি সগৌরবে ফিরে আসতে চায়, তা

হলে তার দিক থেকে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে, লাভাল যে সময়ে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত জোটের কথা প্রথম পেড়েছিলেন সেই সময়কার মতোই তার সামরিক যন্ত্র দুর্ধর্ষ রয়েছে।

কামাল আতাতুর্ক প্রসঙ্গে

১৯৩৮-এর নভেম্বরে তুরস্কের নেতার মৃত্যুতে শ্রদ্ধার্ঘ

মহাযুদ্ধের ভিতর থেকে যে বিস্ময়কর চরিত্রগুলি বেরিয়ে এসেছিল তাঁদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে চমকপ্রদ, কামাল পাশা নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। খ্যাতি ও প্রতিপত্তির শিখরে ধূমকেতুর মতো তাঁর উত্থান ইতিহাসে সত্যই বিরল। বিস্ময়কর চরিত্র বা রণজয়ী বীর হওয়ার থেকেও কামাল পাশা ছিলেন আরও অনেক বড়। একই কালে তিনি ছিলেন চতুর সমরকুশলী ও সূক্ষ্মবুদ্ধি কূটনীতিবিদ্ এবং জীবনে যে অভূতপূর্ব সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন তা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের বহুবিচিত্র গুণাবলীর অনুপম এক সমন্বয় ছাড়া সম্ভবপর হত কিনা সন্দেহ। কামাল পাশা আনাতোলিয়ার রণক্ষেত্রেই শুধু বিপ্লবী ছিলেন না, জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বিপ্লবী।

যাঁরা স্বাধীনতাকে সংগ্রাম করে জয় করে আনে, যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠনের কার্যক্রমকে বাস্তব রূপদান করা তাঁদেরই কর্তব্য, এই বাক্যের চমৎকার দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। অসাধারণ তিনি সেনানায়ক হিসেবে, অসাধারণ তিনি কূটনীতিবিদরূপে, সমাজসংস্কারকরূপে অসাধারণ, অসাধারণ তিনি রাষ্ট্রবিশারদরূপে, অসাধারণ যোদ্ধা, অসাধারণ সংগঠক কামাল পাশা বা কামাল আতাতুর্ক নিঃসন্দেহে এই শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মুখবিবর থেকে দেশকে রক্ষা করার এবং বিগত তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভস্মস্তূপ থেকে পুনরুজ্জীবিত এক তুরস্ককে গড়ে তোলার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁর। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ আবার যদি এশিয়াকে বিধ্বস্ত করতে চেষ্টা করে, আমাদের ভূখণ্ডের পশ্চিম পার্শ্বে কামালের তুরস্ক সতর্ক প্রহরায় থাকবে। এইরকম অদ্বিতীয় এক ব্যক্তির তিরোধান সারা দুনিয়াকে, বিশেষ করে আমাদের মতো নির্যাতিত ও শোষিত জাতিগুলিকে বিচলিত না করে পারে না।

মানবতার ও স্বাধীনতার এই মহাপ্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা আমাদের অবশ্যকরণীয়। অতএব আমি প্রস্তাব করি, আমরা আগামী ১৯ নভেম্বর যেন "কামাল দিবস" পালন করি। ওই উপলক্ষে আমরা যেন সভা করে কামাল আতাতুর্কের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি এবং তাঁর প্রিয় তুরস্কের মুক্ত জনসাধারণকে আমাদের বন্ধুত্বসূচক অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের জাতীয় শোকে আমাদের সহৃদয় সহানুভূতি জ্ঞাপন করি।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি*

১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৮, বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সারা ভারত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির প্রথম সভায় প্রদত্ত উদ্বোধনী বক্তৃতা।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি লক্ষ করেছি, ১৯২১ সাল থেকে নিখিল ভারত চরকা সংঘ ও নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্প সংঘের উদ্যোগে যথাক্রমে খাদি উৎপাদন ও কুটীর শিল্প উন্নয়নের যে আন্দোলন চলে আসছে তার উপরে শিল্প-পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের প্রচেষ্টার সম্ভাব্য ফল কী দাঁড়াবে সেই নিয়ে কোনও কোনও মহলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে, দিল্লিতে উদ্বোধনী বক্তৃতায় আমি সুস্পষ্টভাবে বলেছিলাম যে, কুটীর শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে মৌলিক কোনও বিরোধ নেই। বস্তুতপক্ষে, তিনটি শ্রেণিতে আমি শিল্পকে ভাগ করি: কুটীর, মধ্যম পর্যায়ের ও বৃহৎ পর্যায়ের শিল্প এবং আমি এমন একটি পরিকল্পনা তৈরির জন্য আবেদন করি যা এই শ্রেণিগুলির প্রত্যেকটির কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেবে। শুধু তাই নয়, জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনেও আমরা নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্পসংঘের তরফ থেকে একজন প্রতিনিধির জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট করে রেখেছি। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতেও অনুরূপ একটি আসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদি এ-কথা বলা হয়, এমনকী যদি আশঙ্কাও করা হয় যে, জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোক্তারা কুটীর শিল্প পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনকে বানচাল করতে চান তা হলে আমাদের উপর দারুণ অবিচার করা হবে।

প্রত্যেকে জানে, না জানলেও প্রত্যেকের জানা উচিত, ইউরোপ ও এশিয়ার যে সব দেশ সবচেয়ে শিল্পোন্নত, যেমন, জার্মানি ও জাপান, সেখানেও প্রচুর কুটীর শিল্প আছে এবং তাদের অবস্থা বেশ ভালই। তা হলে আমাদের দেশ সম্পর্কে আমাদের আশঙ্কা থাকবে কেন?

এখন আমি কুটীর শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের ভিতরকার সম্বন্ধ নিয়ে দু-চার কথা বলতে চাই। বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক শিল্পগুলি, কারণ তাদের উদ্দেশ্য উৎপাদনের উপায় প্রস্তুত করা। অনেক সস্তায় ও তাড়াতাড়ি যাতে উৎপাদন সম্ভব করা যায় সেইজন্য মৌলিক শিল্প কারিগরদের হাতে দরকারি যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক উপকরণ পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন, বারাণসী শহরে দু'পয়সা ইউনিট এই হারে বৈদ্যুতিক শক্তির সঙ্গে আমরা যদি বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত সরবরাহ করতে পারতাম, তা হলে বর্তমান উৎপাদনের হার থেকে পাঁচ-ছ গুণ বেশি হারে নানা ধরনের শাড়ি ও নকশাকাটা কাপড় বোনা কারিগরদের পক্ষে সম্ভব হত, এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা এই ধরনের জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা সফল হতে পারত। ভালমতো একটি বিপণন সংস্থা এবং কাঁচামাল যোগান দেবার জন্য একটি সংগঠন থাকলে যে নিদারুণ দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মধ্যে এই কারিগররা আছে তার থেকে তাদের উদ্ধার করা যেতে পারে।

এই একটিমাত্র দৃষ্টান্তই যে আমি দেখাতে পারি তা নয়। যদি শক্তি-উৎপাদন শিল্প এবং যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের শিল্প জাতির কল্যাণে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, বাইসাইকেল, ফাউন্টেন পেন ও খেলনার মতো বহু হালকা ধরনের শিল্প কারিগরশ্রেণির লোকেরা তাদের নিজ নিজ পরিবারের লোকদের নিয়েই এ দেশে চালু করতে পারে। জাপানে ঠিক এই রকমই করা হয়েছে। তাদের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে একটি বিষয়ের উপর। শক্তি ও যন্ত্রপাতি

---

* কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু তাঁর বক্তৃতার প্রারম্ভে দেশের শিল্প-সম্ভাবনা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেন এবং সেইসঙ্গে একটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখার জন্য কমিটিকে সবিশেষ অবহিত হতে বলেন। দেশের শিল্প-পুনরুজ্জীবনের জন্য কমিটি যা-কিছু প্রস্তাব দেবেন তাতে ক্ষুদ্রতর গ্রামীণ শিল্পগুলির স্বার্থ যেন পুরোপুরি সংরক্ষিত করা হয়।

অত্যন্ত সস্তা এবং জাপানি সরকার কাঁচা মাল সরবরাহ ও উপযুক্ত বিপণনের জন্য বোর্ড গঠন করেছে। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশে তাঁত শিল্প ও রেশম শিল্প একমাত্র ওই উপায়েই পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিকে সুনির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। একে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে মৌলিক শিল্পগুলির দিকে, অর্থাৎ সেইসব শিল্পে যা অন্যান্য শিল্পকে চালায়—যেমন শক্তি-উৎপাদন শিল্প, ধাতু-উৎপাদন শিল্প, ভারী রসায়ন, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রোপকরণ এবং রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও রেডিয়োর মতো যোগাযোগ সংক্রান্ত শিল্প।

অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশ শক্তি-উৎপাদনের দিক থেকে পশ্চাৎপদ। বিশেষ করে বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রে ভারত যে কতখানি অনগ্রসর তা বোঝা যায় এই তথ্য থেকে, বর্তমান সময়ে ভারতে আমাদের মাথাপিছু বিদ্যুৎশক্তি যখন মাত্র সাত ইউনিট, মেক্সিকোর মতো অনগ্রসর দেশেও তখন মাথাপিছু হার ছিয়ানব্বই ইউনিট এবং জাপানে মাথাপিছু প্রায় পাঁচশো ইউনিট। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে সরকার অর্থের অপচয় করেছে। মাণ্ডি হাইড্রোইলেকট্রিক স্কিমের কথা ধরুন। অন্যান্য দেশ এইরকম প্রয়াসে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করেছে সরকার তার দশগুণ অর্থ খরচ করেছে। কত ভাল হত যদি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রোপকরণ উৎপাদনের উপর একটা অনুসন্ধান চালানো যেত, যাতে যুদ্ধ বা অন্যান্য কারণে বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ যদি ব্যাহত হয় তা হলে ওইসব জিনিসের যোগান ঠিক থাকে। অন্যান্য যে মৌলিক শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করা দরকার তাতে পড়ে জ্বালানি শিল্প, ধাতু উৎপাদন এবং ভারী রাসায়নিক শিল্প। এইদিক থেকে দেশের সহায়সম্বল ঠিকমতো অনুসন্ধান করা হয়নি। ছোটখাটো শিল্প যা আছে তা বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণাধীন, ফলে হয়েছে অসম্ভব অপচয়। জ্বালানি শিল্প সম্পর্কে এ-কথা বেশি খাটে।

শেষ মৌলিক শিল্প যানবাহন এবং যোগাযোগ শিল্প। এতে পড়ে রেল, নৌস্টিমার, বৈদ্যুতিক যোগাযোগ, রেডিয়ো ইত্যাদি। বর্তমানে রেল আছে রেলওয়ে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে এবং বোর্ড সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় পরিচালনাধীনে। রেলের চাহিদার সামান্য ভগ্নাংশমাত্র দেশে প্রস্তুত হয়। নৌপরিবহণ সম্পর্কে উপকূলবর্তী নাব্য এলাকায় ব্যবসাবাণিজ্য ছাড়া, অভারতীয়দের অসঙ্গত সুযোগ-সুবিধা থাকায় সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা তাদের হাতে। বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র সম্পূর্ণভাবে বিদেশ থেকে চালান আসে। রেডিয়ো সম্পর্কে আমি প্রস্তাব করতে চাই এর কী সম্ভাবনা আছে তাই নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্য একটা বিশেষ সাবকমিটি গঠন করা হোক।

পরিশেষে, আমাদের শিল্পযোজনার পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ও ঋণ যোগাড় করার অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের যাবতীয় পরিকল্পনা কাগুজে নকশাই থেকে যাবে এবং আমাদের শিল্পপ্রগতির ক্ষেত্রে আমরা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হতে পারব না।

সুনির্দিষ্ট ন্যূনতম কার্যক্রম

১৭ জানুয়ারি ১৯৩৯, বোম্বাই থেকে প্রচারিত বিবৃতি।

গত কয়েকমাস ধরে আমি যা বলে আসছি তার থেকে বেশি কিছু বিশেষভাবে আমার বলার নেই। আজ দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি। দক্ষিণপন্থীদের ভিতরে নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে যেমন একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে বামপন্থীদের মধ্যেও তেমনি এসেছে দায়িত্বহীনতা ও অবিবেচনার দিকে ঝোঁক।

সরকারি দায়িত্বগ্রহণ নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে জাতীয় দুর্বলতার দিকগুলোকে প্রকট করে তুলতেও তা সাহায্য করেছে। আমি আজ দেখতে পাচ্ছি অনেকেই ভাবছেন এবং কল্পনা করছেন, আর কোনও সংগ্রাম না করেই পূর্ণ স্বরাজের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

কংগ্রেসে এখন অন্য লোকেরাও আসতে শুরু করেছে যাদের নিজেদের স্বার্থের চিন্তা ছাড়া কিছু নেই এবং যারা কংগ্রেসকে বেশ একটা নিরাপদ সংগঠন বলে মনে করে। কয়েকটি প্রদেশে ভুয়ো সদস্যদের নাম লেখানোর যে হিড়িক দেখা যাচ্ছে প্রধানত তার কারণ এই।

বামে দেখতে পাচ্ছি ছোটখাটো মত পার্থক্য নিয়ে দলাদলি করছে অসংখ্য দল উপদল। কংগ্রেসের বামপন্থীরা গত কয়েক মাসে প্রভাব বাড়ানো দূরের কথা, খুইয়েছে। কোনও কোনও উপলক্ষ্যে কিছু ব্যক্তি এমন আচরণ করেছে যাতে তাদের সমালোচকরা বলার সুযোগ পেয়েছে যে তারা সচেতন বা অচেতনভাবে হিংসার পোষকতা করছে।

আমার স্থির অভিমত এই যে, পূর্ণ স্বরাজ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার যে সুযোগ বর্তমানে আমাদের এসেছে তা নষ্ট হতে দেওয়া উচিত হবে না, কারণ এমন সুযোগ একটা জাতির জীবনে দুর্লভ। ওই এক উদ্দেশ্যে দক্ষিণের সঙ্গে বামের সহযোগিতা করা উচিত যতক্ষণ তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব। কিন্তু নিজেরা যখন এত অসংগঠিত ও বিশৃঙ্খল তখন কী সহযোগিতা তারা করতে পারে? যাঁরা বামপন্থায় বিশ্বাসী তাঁরা ভেবে দেখলে ভাল করবেন, বাঁধাধরা একটা কার্যক্রমের ভিত্তিতে কংগ্রেসের ভিতরকার চরমপন্থীদের নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে সংগঠিত করার জন্য কী কী ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করতে পারবেন। ওইভাবে নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে যখন তারা সংগঠিত হবে তখনই তারা পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করার কর্তব্যে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে যথার্থ সহযোগিতা করতে সক্ষম হবে।

আমাদের প্রথমে যা দরকার তা এই যে, সকল কংগ্রেসসেবী যেন একই কণ্ঠে কথা বলে এবং একই ইপ্সিত লক্ষ্য যেন তাদের চিন্তা হয়। দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, কিছু কিছু কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা দিচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে কংগ্রেসের আপসহীন মনোভাবের প্রস্তাবটাকে খাটো করে দেখা। এ-কথা আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে রাখতে চাই যে, কোনও কংগ্রেসসেবীর তা করার অধিকার নেই। আশা করি ভবিষ্যতে এরকম প্রয়াস আর হবে না। এও আশা করি, এইরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিরা ব্রিটিশ সরকারকে যে অযাচিত উপদেশ দিয়েছে তাতে কেউ বিপথচালিত হবে না।

এ-কথাও আমি বলে রাখতে চাই যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে জোর করে যদি চালানো হয়, সব দিকে একটা লড়াই বাধবে এবং এরকম লড়াই যদি বাধে, আমি সুনিশ্চিত, তা ব্রিটিশ-ভারতের জনগণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না। আমরা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছিয়েছি যখন আসল সমস্যা এ নয়, কী করে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সঙ্গে লড়াই করব, সমস্যা এই, যদি

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটাকে নিঃশব্দে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় অথবা তা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি রাখা হয় তখন আমরা কী করব। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিকল্পনাকে নীরবে ধামাচাপা দেবার যে রীতিমতো সম্ভাবনা আছে, এ কেবল আমারই অভিমত নয়, ক'দিন আগে লর্ড মেস্টনের কাছ থেকে এমনই মনোভাবের আভাস পাওয়া গেল। আশা করি ত্রিপুরি কংগ্রেস এই প্রশ্নের যথোপযুক্ত জবাব দেবে। এই বিষয়ে আমার নিজের বক্তব্য পরিষ্কার এবং আমি তা আগেই বলেছি। মনে প্রাণে যাঁরা বিশ্বাস করেন যে বিনা সংগ্রামে স্বরাজ লাভ করা যাবে না, কংগ্রেসের মৌলিক নীতি অনুযায়ী আগামী দিনের ঘটনা-সন্নিবেশের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হওয়া তাঁদের পবিত্র কর্তব্য। তার অর্থ আরও বেশি সেবা ও আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুতি, আত্মশুদ্ধি, সংকীর্ণ দলাদলির অবসান এবং সুনির্দিষ্ট ন্যূনতম কার্যক্রমের ভিত্তিতে কংগ্রেসের ভিতরকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিকে সংগঠিত করা। এই রকম সংগঠন প্রয়াস একদিকে যেমন নিয়মতান্ত্রিকতামুখী প্রবাহকে রোধ করবে অন্যদিকে তেমনই দায়িত্বহীনতা ও অবিবেচনার প্রবণতাকেও প্রতিহত করবে।

ত্রিপুরির সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত বিতর্ক

বিবৃতি এবং প্রতি-বিবৃতি, ২১ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

সুভাষচন্দ্র বসুর প্রথম বিবৃতি

২১ জানুয়ারি ১৯৩৯

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নিজের নাম প্রত্যাহার করার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা বিবেচনা করে এবং তিনি যে বিবৃতি প্রচার করেছেন তা পাঠ করে আসন্ন সভাপতি নির্বাচন ব্যাপারে আমার দিক থেকে কিছু বলা অত্যাবশ্যক মনে করছি। এই আলোচনা প্রসঙ্গে মিথ্যা বিনয়ের দ্বিধাসংকোচকে স্থান দিলে চলবে না, যেহেতু বিতর্কের বিষয় ব্যক্তিগত নয়। ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম উত্তরোত্তর শাণিতরূপ নেবার ফলে নতুন নতুন ধারণা, ভাবাদর্শ, সমস্যা ও কার্যতালিকার উদ্ভব হয়েছে। ফলত জনসাধারণ এই মতকেই মেনে নিচ্ছে যে, অন্যান্য স্বাধীন দেশে যেমন হয় তেমনই ভারতবর্ষেও সভাপতির নির্বাচন হওয়া উচিত সুনির্দিষ্ট কতকগুলি সমস্যা ও কার্যতালিকার ভিত্তিতে, যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিবাদের বিষয়গুলিকে প্রাঞ্জল করতে পারে এবং জনমানসের চিন্তাধারার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তুলে ধরতে পারে। এই অবস্থায় একটা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবাঞ্ছিত ব্যাপার হবে বলে মনে হয় না।

এখনও পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াবার জন্য কোনও প্রতিনিধি আমাকে উপদেশ দেননি বা সেরকম প্রস্তাবও করেননি। বিপরীতপক্ষে আমাকে না জানিয়ে বা আমার বিনা সম্মতিতে কয়েকটি প্রদেশ থেকে আমাকে মনোনীত করা হয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজতন্ত্রী ও সেইসঙ্গে অসমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে সনির্বন্ধ অনুরোধ পাচ্ছি যাতে আমি সরে না দাঁড়াই। এ ছাড়াও মনে হয় সাধারণের মধ্যে একটা মনোভাব দেখা দিয়েছে যে, আরও একটা

মেয়াদ আমাকে পদস্থ রেখে সেবা করার সুযোগ দেওয়া উচিত। হতে পারে, আমার এ ধারণা ঠিক নয় এবং প্রতিনিধিবর্গের অধিকাংশ আমার নির্বাচন চান না। ২৯ জানুয়ারি যখন ভোট গ্রহণ করা হবে একমাত্র তখনই তা যাচাই করা যাবে, তার আগে নয়।

কর্মী হিসেবে আমার কর্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। কোন পদাধিকারে আমি সেবা করব তা আমার বলার কথা নয়। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন আমার দেশবাসীরা এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমার বন্ধু প্রতিনিধিবর্গ। কিন্তু কোনও বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত থেকে সেবা করতে আমাকে যদি আদেশ দেওয়া হয় এবং যখন আদেশ দেওয়া হবে, সেই আদেশ অমান্য করার কোনও অধিকার আমার নেই। প্রকৃতপক্ষে, আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে তা নিতে আমি যদি দ্বিধা করি, আমি আমার কর্তব্যে অবহেলা করব। আন্তর্জাতিক সংকট যেভাবে ঘনীভূত হয়ে উঠছে সেদিক থেকে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে নববর্ষ হবে গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। এই এবং আরও অন্যান্য কারণে প্রতিনিধিবর্গের অধিকাংশ যদি দাবি করেন পদস্থ থেকে আমি সেবা করি, কোন যুক্তিতে আমি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াই, বিশেষ করে যে প্রশ্ন এতে জড়িত তা যখন মোটেই ব্যক্তিগত নয়? এতৎ সত্ত্বেও যদি মৌলানা আজাদের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত নেতাদের আবেদনের ফলে প্রতিনিধিবর্গের অধিকাংশ আমার পুনর্নির্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট দেন, আমি তাঁদের রায় মাথা পেতে নেব এবং সাধারণ সৈনিক হিসেবে দেশকে ও কংগ্রেসকে সেবা করে যাব। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে আমি না ভেবে পারছি না যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াবার কোনও অধিকার আমার নেই। অতএব অকপটভাবে আমি নিজেকে আমার বন্ধু প্রতিনিধিবর্গের হাতে সমর্পণ করছি। তাঁরা যা সিদ্ধান্ত নেবেন তাই মাথা পেতে নেব।

২৪ জানুয়ারি ১৯৩৯, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দুই সদস্য বল্লভভাই প্যাটেল ও শরৎচন্দ্র বসুর মধ্যে টেলিগ্রাম বিনিময়।

(১) প্যাটেল : বসু

মনে করি সভাপতি নির্বাচনে সুভাষবাবুর বিবৃতির ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যদের প্রতিবাদ প্রয়োজন। কমিটি এই বৎসর পুনর্নির্বাচন অপ্রয়োজনীয় বোধ করে। সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রস্তুত। ইহাতে বলা হইয়াছে, পুনর্নির্বাচন কেবলমাত্র অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য। সুভাষবাবুকে পুনর্নির্বাচনের পক্ষে বর্তমান অবস্থা সেরূপ নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে সুভাষবাবুর মতামত ইহা খণ্ডন করিয়াছে, বলিয়াছে, কার্যপদ্ধতি ও নীতি স্থির করে সভাপতি নয়, কংগ্রেস বা ওয়ার্কিং কমিটি। প্রতিবাদ বিবৃতি ডক্টর পট্টভির নির্বাচন সুপারিশ করিয়াছে এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কংগ্রেসীদের বিভক্ত না করিতে সুভাষবাবুকে আবেদন করিয়াছে।

(২) বসু : প্যাটেল

টেলিগ্রাম আজ সকালে পাইয়াছি। সিলেট হইতে আসার পথে মৌলানার ও সুভাষের বিবৃতি পড়িয়াছি। আমার মতে মৌলানার প্রত্যাহারের পর ডক্টর পট্টভিকে দাঁড় করানো অবাঞ্ছিত। আগামী বৎসর সব দিক হইতে ১৯৩৭ তুলনায় আরও সংকটময় ও অস্বাভাবিক। দৃঢ় অভিমত,

ওয়ার্কিং কমিটির কোনও সদস্যের সহকর্মীদের মধ্যে নির্বাচনদ্বন্দ্বে পক্ষগ্রহণ উচিত নয়। আপনার প্রস্তাবিত বিবৃতি দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে দলাদলি বাড়াইবে, যাহাতে না হয় তাহাই উচিত, আগামী সংগ্রামে ডক্টর পট্টভি দেশের আস্থা জাগাইতে অক্ষম। অনুগ্রহ, কংগ্রেসকে বিভক্ত করিবেন না।

(৩) প্যাটেল : বসু

আপনার টেলিগ্রাম অবধারণ করিলাম। নিছক কর্তব্যবোধ বিবৃতিদানে বাধ্য করিয়াছে। বিরোধ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়, নীতিতে নীতিতে। নির্বাচনদ্বন্দ্ব অনিবার্য হইলে আশা করি তাহা হইবে বিনা তিক্ততায় ও উদ্দেশ্য আরোপিত না করিয়া। দেশের স্বার্থে পুনর্নির্বাচন অনিষ্টকর বিবেচিত।

বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জয়রামদাস দৌলতরাম, জে. বি. কৃপালনি, যমুনালাল বাজাজ, শঙ্কররাও দেও এবং ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ সারা ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বিবৃতি।

২৪ জানুয়ারি ১৯৩৯

সুভাষবাবুর বিবৃতি যেরকম যত্নসহকারে পাঠ করা দরকার আমরা সেইভাবে পাঠ করিয়াছি। যতদূর আমরা জানি, অদ্যাবধি সভাপতি নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে হইয়াছে। সুভাষবাবু একটি নূতন নজির সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা করিবার অধিকার তাঁহার সম্পূর্ণ আছে। যে পন্থা তিনি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ন্যায্যতা একমাত্র অভিজ্ঞতা দ্বারাই যাচাই হইবে। এই বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে পরিণত করিবার পূর্বে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে অধিকতর সংহতি, সহনশীলতা এবং অপরের মতামতের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতে পারিতাম। বিবৃতি সম্পর্কে কিছু না বলিলে যদি হইত আমরা তাহা হইলে আনন্দিত হইতাম। কিন্তু আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে আমরা দৃঢ় অভিমত পোষণ করি, তাহা না বলিলে আমরা বোধ করি আমাদের সুস্পষ্ট কর্তব্যে অবহেলা করিব।

আমাদের নিকট ইহা গভীর দুঃখের বিষয় যে মৌলানা সাহেব প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বিরত থাকা শ্রেয় মনে করিয়াছেন। কিন্তু যখন তিনি বিরত থাকিবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিলেন, তিনি আমাদের কয়েকজনের সহিত পরামর্শক্রমে ডক্টর পট্টভির নির্বাচন সমর্থন করেন। অনেক দিক ভাবিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আমরা মনে করি, অত্যন্ত অস্বাভাবিক অবস্থায় ছাড়া একই সভাপতিকে পুনরায় নির্বাচন না করার রীতিকে মানিয়া চলার নীতিই ঠিক।

সুভাষবাবু তাঁহার বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁহার বিরোধিতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যই একই মত পোষণ করেন। ইহা কংগ্রেসেরই নীতি। তিনি ভাবাদর্শ, নীতি ও কার্যক্রমের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা মনে করি এইসব কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত করিবার পক্ষে প্রাসঙ্গিক নহে।

সভাপতি পরম্পরা কংগ্রেসের নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারিত করেন না। যদি তাহাই হইত, গঠনতন্ত্রে ওই পদ এক বৎসরের জন্য সীমিত হইত না। কংগ্রেসের নীতি ও কার্যপদ্ধতি যখন

কংগ্রেস নিজে স্থির করে না, তখন ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা তাহা নির্ধারিত হইয়া থাকে। সভাপতির স্থান চেয়ারম্যানের মতো। অধিকন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে যেরূপ হইয়া থাকে সভাপতি সেইরূপ জাতির ঐক্য ও সংহতির প্রতীক ও প্রতিনিধি। অতএব এই পদটিকে যথার্থভাবে অত্যন্ত উচ্চ সম্মানজ্ঞাপক পদ বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে এবং সেই কারণে বাৎসরিক নির্বাচন দ্বারা জাতি তাহার শ্রেষ্ঠ সন্তানের মধ্যে যতজনকে সম্ভব এই সম্মানে ভূষিত করার প্রয়াসী। এই উচ্চ পদমর্যাদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই নির্বাচন সর্বদাই সর্ববাদিসম্মত হইয়াছে। এমনকী নির্বাচন প্রসঙ্গে নীতি ও কার্যক্রম লইয়াও কোনওপ্রকার বাকবিতণ্ডা এই কারণে অবাঞ্ছিত। আমরা বিশ্বাস করি ডক্টর পট্টভি কংগ্রেস সভাপতি পদের পক্ষে যথেষ্ট যোগ্য। তিনি ওয়ার্কিং কমিটির প্রাচীনতম সদস্যদের মধ্যে অন্যতম এবং দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন জনসেবার সুনাম তাঁহার রহিয়াছে। সুতরাং নির্বাচনের জন্য আমরা তাঁহার নাম কংগ্রেস প্রতিনিধিবর্গের নিকট সুপারিশ করিতেছি। সহকর্মী হিসাবে আমরা সুভাষবাবুকেও বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি তিনি যেন তাঁহার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন এবং ডক্টর পট্টভি সীতারামাইয়ার নির্বাচনকে সর্ববাদিসম্মত হইতে দেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর দ্বিতীয় বিবৃতি

২৫ জানুয়ারি ১৯৩৯

ওয়ার্কিং কমিটির আমার কোনও কোনও বিশিষ্ট সহকর্মীর সঙ্গে প্রকাশ্যে বিতর্কে রত হওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক দায়িত্ব, কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, এ ব্যাপারে আমার কোনওই হাত নেই। গত ২১ তারিখে আমি প্রথম যে বিবৃতিটি প্রকাশ করি তা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের বিবৃতির অনিচ্ছাকৃত প্রত্যুক্তি এবং আমি এখন যা বলছি তা সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য নেতাদের চ্যালেঞ্জ করা বিবৃতি দেওয়ার ফলে আমার অনিচ্ছাকৃত জবাব। এই প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডা শুরু করার দায়িত্ব আমার নয়, এ দায়িত্ব আমার বিশিষ্ট সহকর্মীদের। ওয়ার্কিং কমিটির দু'জন সদস্যের মধ্যে নির্বাচনদ্বন্দ্বে অন্যান্য সদস্যরা সংগঠিতভাবে কারও পক্ষ সমর্থন করবেন আশা করা যায় না, যেহেতু স্পষ্টত তা ন্যায়সঙ্গত নয়। সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্য নেতারা নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, ব্যক্তিগত কংগ্রেসসেবী হিসাবে করেননি। আমি জিজ্ঞাসা করি, এটি ন্যায়সঙ্গত কিনা, বিশেষ করে যখন ওয়ার্কিং কমিটি এই বিষয় নিয়ে কখনও আলোচনা করেনি। ওই বিবৃতি থেকেই আমরা প্রথম জানতে পারি ডক্টর পট্টভির নির্বাচনকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত অনেক বিচার-বিবেচনার পর গ্রহণ করা হয়েছে। না আমার, না ওয়ার্কিং কমিটিতে আমার কোনও সহকর্মীর এই বিচার বিবেচনা বা সিদ্ধান্তের বিষয় জানা ছিল, বা সে-সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল। স্বাক্ষরকারীরা ভাল করতেন যদি তাঁরা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে বিবৃতিটি প্রচার না করে ব্যক্তিগত কংগ্রেসসেবী হিসাবে প্রচার করতেন।

সভাপতি নির্বাচনকে যদি নির্বাচন নামের যোগ্য হতে হয়, তা হলে নৈতিক চাপ ছাড়া ভোট দেবার স্বাধীনতা থাকা উচিত, কিন্তু এই ধরনের বিবৃতি কি নৈতিক চাপের নামান্তর নয়? সভাপতিকে যদি প্রতিনিধিবর্গের নির্বাচিত করতে হয় এবং তিনি ওয়ার্কিং কমিটির প্রভাবশালী সদস্যদের মনোনীত না হন, তা হলে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য নেতারা তাঁদের প্রচারিত বিবৃতি কি প্রত্যাহার করবেন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের খুশিমতো যাকে ভোট দিতে চান তাঁদের

উপরই তা ছেড়ে দেবেন? প্রতিনিধিদের যদি খুশিমতো ভোট দেবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, নির্বাচনদ্বন্দ্বের ফলাফল সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। তা যদি না দেওয়া হয়, তা হলে এই নির্বাচন ব্যবস্থার ইতি করে ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়ে সভাপতি মনোনয়ন করলেই তো হয়।

আমার কাছে এটি একটি সংবাদ যে এমন একটি নিয়ম নাকি আছে যাতে অস্বাভাবিক অবস্থায় ছাড়া একই ব্যক্তিকে আবার সভাপতি নির্বাচন করা হয় না। যদি কেউ কংগ্রেসের ইতিহাস অনুধাবন করেন তা হলে তিনি দেখতে পাবেন বেশ কিছু ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে একাধিকবার নির্বাচিত করা হয়েছে। আমি আরও এই মন্তব্য দেখে অবাক হচ্ছি যে অদ্যাবধি সভাপতি নির্বাচন সর্ববাদিসম্মত হয়ে এসেছে। বেশ কয়েকবার আমার মনে আছে আমিই একজনকে ভোট না দিয়ে আরেকজনকে দিয়েছি। সম্প্রতি কয়েক বছর মাত্র নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে হচ্ছে।

১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের নতুন গঠনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর থেকে, ওয়ার্কিং কমিটি, অন্ততপক্ষে নিয়ম রক্ষার জন্য, সভাপতির পদমর্যাদা আরও উঁচু স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। অতএব কংগ্রেস সভাপতি এবং তাঁর নির্বাচনকে ঘিরে এখন নতুন প্রথা গড়ে উঠবে, এইটেই স্বাভাবিক। আজকের দিনে প্রেসিডেন্টের অবস্থা কোনও সভার চেয়ারম্যানের মতো আর নয়। প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মতো, যিনি তাঁর ক্যাবিনেট নিজেই মনোনীত করেন। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে নিয়মতান্ত্রিক অধিপতির সঙ্গে তুলনা করা মোটেই ঠিক নয়। এ-কথাও আমি বলে রাখতে পারি যে, নীতি ও কার্যক্রমের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয় এবং কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে বহু আগেই এ-প্রশ্ন উঠত যদি না ১৯৩৪-এর কংগ্রেসের পর থেকে দক্ষিণপক্ষ ও বামপক্ষ, উভয়পক্ষের সমর্থনে একজন বামপন্থীকে সভাপতি নির্বাচিত করা হত। এই বৎসর এই প্রথার ব্যতিক্রম এবং সভাপতি পদের জন্য একজন দক্ষিণপন্থীকে দাঁড় করানোর প্রয়াস মোটেই তাৎপর্যহীন নয়। আগামী বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে একটা আপসরফার সম্ভাবনা আছে, অনেকেরই এই ধারণা। স্বভাবত দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থী সভাপতি চান না, যেহেতু তিনি আপসরফার পথে কন্টক হতে পারেন এবং আপস-আলোচনার পথে বাদ সাধতে পারেন। জনসাধারণের ভিতরে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেই জানা যায় এই ধারণা কতখানি ব্যাপক। এই পরিস্থিতিতে এমন একজনের সভাপতি হওয়া একান্ত দরকার যিনি অন্তরের অন্তস্তল থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী।

আমার কাছে বাস্তবিক এটি দুঃখের বিষয় যে সভাপতি পদের প্রার্থী হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি অসংখ্য বন্ধুবান্ধবদের জানিয়েছিলাম, এই বৎসর বামপক্ষ থেকে নতুন একজন প্রার্থীকে দাঁড় করানো উচিত হবে, কিন্তু দুর্ভাগ্য, তা হল না এবং কয়েকটি প্রদেশ থেকে আমার নাম প্রস্তাব করা হল। দেরিতে হলেও এখনও আমি নির্বাচনদ্বন্দ্ব থেকে সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত, যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সত্যকার বিরোধী, আচার্য নরেন্দ্র দেওয়ের মতো কাউকে আগামী বৎসরে সভাপতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আমার দৃঢ় ধারণা, এই বৎসরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বৎসরে সভাপতির আসনে সত্যকার একজন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধীকে আমাদের দরকার। দক্ষিণপক্ষ যদি আন্তরিকভাবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি চান, তা হলে তাঁরা ভাল করবেন যদি একজন বামপন্থীকে সভাপতি করেন। যে কোনও মূল্যে এবং অশোভন উপায়ে এমন একজন দক্ষিণপন্থী প্রার্থীকে দাঁড় করাবার জন্য তাঁরা উঠেপড়ে লেগেছেন যিনি অবসর নেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন এবং তাঁর নাম সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে শুনে যিনি নিজেই অবাক হয়েছেন। এর ফলে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

ঠিক এই মুহূর্তে দেশে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে সভাপতি নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের অঙ্গ এবং সেইদিক থেকে আমরা এ বিষয়ে নির্বিকার হয়ে থাকতে পারি না। দেশের সামনে এখন আসল প্রশ্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রতিহত করে বর্তমান সংকটে জাতীয় সংহতিকে বজায় রাখায় বিশ্বাসী, যে প্রার্থী স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন জোর করে তাঁকে মনোনীত করে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন ধরানো তাঁদের পক্ষে উচিত হবে না।

সভাপতি নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিধিবর্গের ব্যাপার এবং তা তাঁদেরই কাছে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপক্ষ নিঃসন্দিগ্ধভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। দেরিতে হলেও তাঁরা এখনও বামপন্থী একজন প্রার্থীকে গ্রহণ করে বামপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে পারেন। আমি আশা করি আমার আবেদন ব্যর্থ হবে না।

পট্টভি সীতারামাইয়ার বিবৃতি

২৫ জানুয়ারি ১৯৩৯

সভাপতি আসনের জন্য নির্বাচনদ্বন্দ্ব আপাতত যখন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন উক্ত বিষয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত নানা লেখার যে কয়েকটি দিকের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে তৎসম্পর্কে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আমার পক্ষ হইতে একটি বিবৃতি দেওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

১৭ জানুয়ারি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষে আমি বারদৌলি ত্যাগ করি এবং ওইদিন সন্ধ্যাতে বোম্বাই পৌঁছাই এবং সেই সময়ে আমার মনে যে ধারণা ছিল তাহা এই যে, কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনে সভাপতি পদের জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নির্দিষ্ট রহিয়াছেন।

একাধিক কারণে এই অভিমত আমি নিজেও বরাবর পোষণ করিয়াছি। কিন্তু সন্ধ্যা ৭টায় আমি আমার বাসস্থান পৌঁছাইয়া দেখিতে পাই মৌলানা আজাদের নিকট হইতে একটি টেলিফোন বার্তা আমার নিকট আগেই আসিয়াছে, তাহাতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে তাঁহার সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করিতে বলিয়াছেন। আমি তাহা করি এবং মৌলানা আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন।

আমি ভাবিয়া পাইলাম না তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান কেন, কিন্তু এই বিষয়ে চিন্তা না করিয়া আমি অবিলম্বে রাত্রের আহার সমাধা করি, যেহেতু আমার আগেই স্থির ছিল যে ওই রাত্রেই ১০টা ২০-র মাদ্রাজ মেলে আমি বোম্বাই ত্যাগ করিব। তৎপূর্বে মৌলানার সহিত দেখা করিয়া যাইব স্থির করি।

ইত্যবসরে সংবাদপত্রের কতিপয় বন্ধু আমার আবাসস্থলে ঘটনাচক্রে উপস্থিত হন এবং কথাপ্রসঙ্গে আমাকে জানান যে, তিনজন প্রার্থী হইয়াছে তন্মধ্যে আমি অন্যতম। যেহেতু আমার বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল যে, সভাপতিপদের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত মৌলানা একজন প্রার্থী, আমি তৎক্ষণাৎ আমার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিয়া একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রদান করি। টেলিফোন মারফত তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ করা হয়।

অতঃপর আমি মৌলানার বাসস্থানের দিকে রওনা হই এবং পথে বেজাওয়াদায় যাইবার জন্য টিকিট ক্রয় করি। মৌলানার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কিছুটা তাড়াহুড়া করিয়া আমি তাঁহাকে যখন জানাই যে আমি আমার নাম প্রত্যাহার করিয়াছি, তিনি তখন বলেন তিনিও নাম প্রত্যাহার

করিতেছেন এবং পরের দিন প্রাতে বারদৌলি যাত্রা করিতেছেন। তিনি আমাকে আমার প্রত্যাহারপত্র বাতিল করিতে পীড়াপীড়ি করেন।

ওইভাবে চিন্তা না করিবার জন্য তাঁহাকে কিছুকাল উপরোধ করিবার পর যখন আমি বুঝিলাম যে, অনাবিল আন্তরিকতা তাঁহাকে তাঁহার সিদ্ধান্তগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তখনই আমি টেলিফোন করিতে যাই এবং আমার প্রত্যাহার-বিবৃতি প্রত্যাহার করি।

পরদিবস সন্ধ্যায় আমি বোম্বাই ত্যাগ করি এবং ২১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মৌলানার নিকট হইতে এক টেলিগ্রাম পাই। তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, আমার সপক্ষে তিনি নাম প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং এই আশা ব্যক্ত করিয়াছেন যে আমার নির্বাচন যেন সর্বসম্মত হয়।

ইহা সত্য যে আমার মনোনয়ন আমার অজ্ঞাতেই হইয়াছে, তবে এইমত প্রত্যাশা করিবার কারণ আমার ছিল, কারণ কিছুকাল হইতে সাধারণভাবে দক্ষিণ ভারতের এবং বিশেষ করিয়া অন্ধ্রের জনসাধারণের মধ্যে সর্বসম্মত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছিল যে, এইবারে দক্ষিণাঞ্চলের তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া অন্ধ্রের কংগ্রেসসেবীদের মধ্য হইতেই কারও সভাপতি হওয়া উচিত।

আমি বরাবরই এইমত উচ্চাভিলাষ নিরুৎসাহিত করিয়াছি, তৎসহ আকাঙ্ক্ষাপূরণের পরিসরও সীমিত রাখিয়াছি।

কংগ্রেসের দিক হইতে প্রতিবৎসর এমন এক ব্যক্তির সভাপতি হওয়া উচিত যিনি কালোচিত প্রয়োজন মিটাইতে পারেন, এবং বিভিন্ন দাবিদার বা বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সমানভাবে সম্মান বণ্টনের বিষয়রূপে সভাপতির মনোনয়ন উচিত নয়।

অধিকন্তু আমি ১৯১৬ সালে চিকিৎসাব্যবসায় ত্যাগ করার পর হইতে জনসমাজে সর্বক্ষণের কর্মীরূপে কাজ করিয়া আসিতেছি এবং ব্যক্তিগতভাবে একমাত্র সেবার আদর্শে আমি সর্বদা অনুপ্রাণিত হইয়াছি এবং কখনওই আমার মনের অন্তরতম কন্দরেও কোনওপ্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করি নাই। কিন্তু যখন যখন মৌলানা তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিলেন, যখন কংগ্রেসসেবী ও অন্যান্যরা, শ্রদ্ধেয় গুরুদেব, গণ্যমান্য প্রধান ব্যক্তিরা, এক কথায় বিভিন্ন মতাশ্রয়ী জননেতারা ব্যাপকভাবে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; যখন আবার মৌলানা নির্বাচনদ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার নাম প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে আমার সাফল্য কামনা করিয়া আমার প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যখন আমি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইলাম, মৌলানার প্রার্থীপদের পরিবর্তে আমার নাম ওয়ার্কিং কমিটির আমার অনেক সহকর্মীর নিকট এবং অন্যত্র অনুমোদন লাভ করিবে, তখন আমার মনে হইল প্রার্থীরূপে আমার মনোনয়ন জনসমাজের দিক হইতে আমার প্রতি কর্তব্যের আহ্বান, যাহা আমার পক্ষে সহজে উপেক্ষা করা উচিত হইবে না।

অতঃপর আজিকার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আমার মনোভাব কী সেই বিষয়ে একটি বিবৃতি দিতে আমি ইচ্ছা করি। গান্ধীবাদের আমি যে একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ইহা দেশে মোটামুটি সুবিদিত।

এই বিষয়ে এবং আজিকার বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রশ্নের উপর আমি বহুবার বলিয়াছি এবং প্রচুর লিখিয়াছি। ১৯৩৫-এর ভারত-সরকার আইনের অন্তর্ভুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যে বিপদের আশঙ্কা আছে তাহা সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে দেশে অন্যের তুলনায় আমি কিছু কম করি নাই।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস ও হরিপুরা অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে আমার অধিকতর স্বাধীনতা ছিল এবং সেই স্বাধীনতার আমি সদ্ব্যবহার করিয়াছি, যে-ভারতীয় শাসনতন্ত্র আমাদের উপর চাপাইয়া দিবার প্রয়াস হইতেছিল সেই শাসনতন্ত্রকে নস্যাৎ করিতে।

হরিপুরার পর হইতে মন্ত্রিসভার সদস্য হওয়ায় আমাকে বাধ্য হইয়া সংযত হইতে হইয়াছিল।

আমার যতদূর জানা আছে এবং যতদূর বিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রশ্নে ব্রিটিশের সহিত আপরসফায় আসিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির কোনও সদস্যের দিক হইতে কোনওপ্রকার প্রয়াস হয় নাই। সম্প্রতি আমি নিজে অভ্রান্তভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছি যে, বড়লাটের বিবৃতিটি কংগ্রেসের নিকট হইতে সাড়া পাইবার জন্য মৃদু আহ্বান, এবং কংগ্রেসের তরফ হইতে তাঁহাকে যোগ্য জবাব কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নিজেই ইতোপূর্বে দিয়াছেন।

দেশীয় রাজ্যের বিষয়ে আমি সামান্য কিছু বলিতে চাই। বিগত তিন বৎসর যাবৎ আমি যে দৃঢ় ধারণার বশবর্তী হইয়া এই বিষয়ে আগ্রহী, তাহা এই যে, যদি আমরা দেশের সাম্প্রদায়িক অঙ্গচ্ছেদে প্রস্তুত না থাকি, আঞ্চলিকভাবে দেশকে খণ্ডবিখণ্ড হইতে দিতে ততোধিক প্রস্তুত নই।

যুক্তরাষ্ট্র আমরা নিঃসন্দেহে চাই, কিন্তু ব্রিটিশ পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে বিসদৃশ ও পঙ্গু করিতে বাধ্য— এমন একটি দেশে পরিণত করিবে, যাহার একদিক পরিপূর্ণ এবং অন্যদিক বিকল।

দেশীয় রাজ্যগুলির বিরাট জাগরণে কংগ্রেসের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইতে পারে। যদি আমি নির্বাচিত হই আমার নির্বাচনকে দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে আমার প্রচেষ্টার স্বীকৃতি বলিয়া গণ্য করিব।

আমি অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে কাজ করিতেছি। কংগ্রেস কর্মীদের ভিতর শৃঙ্খলাভঙ্গের দুর্নীতির দৃষ্টান্ত আমার নজরে আসিয়াছে। যদি নির্বাচিত হই আমি আমাদের নিজেদের গৃহের শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে আমার যথাশক্তি প্রয়োগ করিব।

লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠদের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল রহিয়াছে, তাহা কংগ্রেস সংগঠনের আভ্যন্তরিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখিবার একাগ্র আগ্রহ। 'হরিজন'-এ প্রকাশিত আমার রচনাগুলিতে আমি দেখাইয়াছি যে, কংগ্রেস দ্রুত নীতিচ্যুত এক সংগঠনে পরিণত হইতে চলিয়াছে এবং তাহা এই অর্থে যে ইহার খাতাপত্রে বিপুল সংখ্যায় ভুয়া সদস্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে। গত কয়েক মাস ধরিয়া আমি এইসব খাতাপত্র ঢালিয়া সাজাইবার কথা বলিয়া আসিতেছি। এইসব ভুয়া ভোটদাতাদের জোরে যে সকল ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে পর আসনচ্যুত হইবেন সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমি এই প্রকার চরম ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলিতেছি না। খাতাপত্র হইতে সমস্ত ভুয়া সদস্যদের নাম যাহাতে খারিজ করা হয় এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ না হয় তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সংখ্যালঘুদের নিরুৎসাহ হইবার কোনও কারণ নাই। যদি তাঁহারা কংগ্রেসের বর্তমান কার্যক্রমে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে তদনুযায়ী কাজ করা যাইতে পারে, তাঁহারা সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু হোন, এমনকী তাঁহারা কংগ্রেসের ভিতরে থাকুন বা বাহিরে থাকুন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। রদবদলের ফলে সম্ভবত একটি বিষয় প্রভাবিত হইতে পারে, তাহা সংসদীয় কার্যক্রম।

ভূতপূর্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক মন্ত্রীরা নির্বাচিত হইয়াছেন এবং কার্যক্রম স্থির হইয়াছে। কিন্তু, সংসদীয় কার্যক্রম কংগ্রেস কার্যক্রমের সামান্য অংশমাত্র। যাহাই হউক না কেন কংগ্রেসমন্ত্রীদের দৈনন্দিন জীবনযাপন করিতে হইবে। কোনও প্রশ্নে কংগ্রেস নীতির সহিত তাঁহাদের মতৈক্য হইলে তাঁহাদের যদি ফিরাইয়া আনা হয়, অথবা কংগ্রেসের সহিত মতানৈক্য হওয়ার দরুন তাঁহারা যদি পদত্যাগ করেন, তাহাতে সামান্যই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে।

যতই হোক সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তাঁহার নীতি ও কার্যক্রমই সর্বাধিক অগ্রগামী ও দুঃসাহসিক। সংখ্যালঘুরা কেবলমাত্র ইহার

সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতে পারে। তাঁহারা যদি ইহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারেন, তাঁহাদের কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। যদি তাঁহারা তাহা পারেন, তাহাতে সংখ্যাগুরুর শক্তিবৃদ্ধি হইবে। কোনও কারণেই সংখ্যালঘু যেন বাধা সৃষ্টি না করেন। যখন তাঁহারা সহযোগিতা করিতে পারিবেন না, তাঁহারা যেন বিরত থাকেন, আমি সকল কংগ্রেসসেবীদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে যাঁহারা কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন হইয়াও কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে উহার বাহিরে রহিয়াছেন, তাঁহারাই উহার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। অতএব যাঁহারা কংগ্রেসের ভিতরে থাকিতে অস্বস্তি বোধ করিতেছেন তাঁহারা কোনও বিদ্বেষের মনোভাব না লইয়া, উপরন্তু অধিকতর সার্থকভাবে সেবা করিবার সুচিন্তিত উদ্দেশ্যে উহা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর পঞ্চম বিবৃতি

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

সাম্প্রতিক সভাপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি যতখানি গুরুত্ব দিয়ে পড়া উচিত আমি সেইভাবেই পড়েছি। মহাত্মা গান্ধী একে তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় বলে নিয়েছেন দেখে আমি মর্মাহত হয়েছি। আমার সশ্রদ্ধ নিবেদন, এই বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। ভোটদাতাদের, অর্থাৎ প্রতিনিধিবর্গকে মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতে বলা হয়নি। অতএব আমার মতে এবং অধিকাংশ লোকের মতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে স্পর্শ করছে না।

গত কয়েকদিনে কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থীদের সম্পর্কে সংবাদপত্রে অনেক কিছুই বলা হয়েছে। কিছু লোক নির্বাচনের ফলাফলকে বামপন্থীদের জয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আসল কথা এই যে, জনসাধারণের সামনে দুটি প্রশ্ন তুলে ধরেছিলাম, যেমন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই এবং সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে, প্রতিনিধিবর্গের অবাধ ও স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ। ভোটদানে নিশ্চয় এই প্রশ্নগুলির প্রভাব ছিল বিরাট এবং ওইগুলি ছাড়াও প্রার্থীদের ব্যক্তিত্বও কিছুটা কাজ করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হয়, এই নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কল্পনার উপর নির্ভর করা বা এতে যা নেই তা আবিষ্কার করা আমাদের উচিত হবে না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে নির্বাচনের ফল বামপন্থীদের জয় সূচিত করছে, তা হলেও আমাদের ভেবে দেখা উচিত বামপন্থীদের কার্যক্রম কী। অব্যবহিত ভবিষ্যতে বামপন্থীদের লক্ষ্য জাতীয় ঐক্য এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর আপসহীন বিরোধিতা। এ ছাড়াও তারা গণতান্ত্রিক মূলনীতির পক্ষে। বামপন্থীরা কংগ্রেসের ভিতরে ভাঙন সৃষ্টি করার দায়িত্ব নেবে না। যদি ভাঙন দেখা দেয় তা আসবে তাদের জন্য নয়, তাদের থাকা সত্ত্বেও।

ব্যক্তিগতভাবে আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে কংগ্রেস দলের মধ্যে ভাঙন ধরানোর কোনও যৌক্তিকতাও নেই, কারণও নেই। অতএব আমি একান্তভাবে আশা করি, এখন বা নিকট ভবিষ্যতে তথাকথিত সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে অসহযোগিতা করার কোনও কারণ দেখা দেবে না। এ কথা আমার বলার দরকার হয় না যে, আমাদের সামনে ভাঙনের কোনও সম্ভাবনা যদি কখনও দেখা দেয়, আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করব যাতে তা এড়ানো যায়।

আমাদের মতো লোকেরা ভবিষ্যতে কী নীতি অনুসরণ করবে সে সম্পর্কে অনেকের মনেই কিছু পরিমাণ আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। আমি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই, সংসদীয় ক্ষেত্রে বা সংসদের বাইরে অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করা হবে না। সংসদীয় কার্যক্রমের কথা বলতে গেলে, অতীতের থেকে আরও দ্রুতগতিতে আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রতিজ্ঞাগুলি ও সংসদীয় কার্যক্রম বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করব। সংসদের বাইরে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রতিরোধ করতে এবং "পূর্ণস্বরাজের" দিকে অগ্রসর হতে আমাদের সকল শক্তি ও উপায় সংহত করার চেষ্টা করব এবং আমরা অবশ্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ীই কাজ করে যাব।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও একটি কথা বলতে চাই। লৌকিক বিষয়ে কয়েক ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যদিও আমি একমত হতে পারিনি, তবু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কারও থেকে কম নয়। যদি আমি তাঁকে ঠিকমতো বুঝে থাকি, তিনিও চান সবাই নিজের মতো চিন্তা করুক যদিও তাতে তাঁর সঙ্গে সব সময় একমত হওয়া নাও হতে পারে। মহাত্মাজির আমার সম্পর্কে অভিমত কী আমার জানা নেই। তাঁর মতামত যাই থাক, আমার সবসময় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে তাঁর বিশ্বাস অর্জন করা শুধুমাত্র এই কারণে যে, আর সবার বিশ্বাস অর্জনে সফল হয়ে আমি যদি ভারতের শ্রেষ্ঠ মানবের বিশ্বাস অর্জন করতে না পারি আমার কাছে তা মর্মান্তিক ঘটনা হয়ে থাকবে।

ত্রিপুরি ভাষণ

মার্চ ১৯৩৯-এ ত্রিপুরিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ

কমরেড সভাপতি, ভগ্নীগণ এবং প্রতিনিধি ভ্রাতাগণ,

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির আসনে পুনর্নির্বাচিত করে আপনারা আমাকে যে উচ্চ সম্মান প্রদান করলেন, তার জন্যে এবং এখানে ত্রিপুরিতে আপনারা আমাকে যে সাদর অভ্যর্থনা দিলেন তার জন্যেও, আমি হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সত্য বটে, আমার অনুরোধে, এ রকম উপলক্ষ্যে যে ধরনের জাঁকজমক দেখা যায় তার কিছু কিছু আপনারা বর্জন করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় সেই পদক্ষেপ গ্রহণে আপনারা বাধ্য হলেও, তাতে আপনাদের অভ্যর্থনার আন্তরিকতার কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি, এবং আমি আশা করি এই উপলক্ষে সেই আড়ম্বরের খর্বতায় কেউ দুঃখিত হবেন না।

বন্ধুগণ, আরও কিছু বলবার আছে। আমি আপনাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে, রাজকোটে মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য সফল; এবং তার ফলে তাঁর অনশনের অবসান হওয়াতে আমাদের আনন্দের কথা জানাচ্ছি। সারা দেশ এখন আনন্দিত, দুশ্চিন্তামুক্ত।

বন্ধুগণ, এই বৎসরটি একটি অসাধারণ ভিন্নপ্রকৃতির বৎসর হতে চলেছে বলে মনে হয়। এবারের সভাপতি নির্বাচন মামুলি ধরনের হয়নি। নির্বাচনের পরেই চমক সৃষ্টি করে ওয়ার্কিং কমিটির পনেরো জন সদস্যের মধ্যে বারোজন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং ডা. রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে পদত্যাগ করেন। ওয়ার্কিং কমিটির

আরেকজন বিশিষ্ট এবং প্রধান সদস্য, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, রীতিসম্মতভাবে পদত্যাগ না করলেও একটি বিবৃতি দেন, যার ফলে সকলের ধারণা হয়, তিনিও পদত্যাগ করেছেন। ত্রিপুরি কংগ্রেসের ঠিক আগেই রাজকোটের ঘটনাবলির ফলে মহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশনের শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এবং তার পরে সভাপতি ত্রিপুরি পৌঁছন, অসুস্থ অবস্থায়। অতএব এ বছরের সভাপতির ভাষণ দৈর্ঘ্যের দিক থেকে যদি এতাবৎকালের রীতি থেকে স্বাতন্ত্র্য দাবি করে তা উপযুক্তই হবে।

বন্ধুগণ, আপনারা অবগত আছেন, মিশর থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অতিথি হিসাবে একটি ওয়াফদ প্রতিনিধি দল আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছেন। আপনারাও আমার সঙ্গে একযোগে তাঁকে অতিশয় আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাবেন। তাঁরা যে আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং ভারতে এসেছেন, সে জন্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের দুঃখের কারণ শুধু এই যে মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্যে ওয়াফদ-এর সভাপতি, মুস্তাফা এল-নাহাস পাশা নিজে এই প্রতিনিধিদলকে নেতৃত্ব দিতে পারলেন না। ওয়াফদ দলের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের সঙ্গে এবং সভাপতির সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি বলে আমি অধিকতর আনন্দ বোধ করছি। আবার আমি আমার দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁদের অত্যন্ত আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি।

১৯৩৮-এ হরিপুরায় আমাদের সম্মেলনের পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এর মিউনিখ চুক্তি, যা প্রকৃতপক্ষে ছিল নাৎসি জার্মানির কাছে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের শোচনীয় আত্মসমর্পণ। তার ফলে ফ্রান্স আর ইউরোপের প্রধান শক্তি নয়, বন্দুকের একটি গুলিও খরচ হল না, সে আধিপত্য এখন চলে গেল জার্মানির হাতে। তার পরে, স্পেনে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ক্রমশ পতন, মনে হচ্ছে, ইতালি ও নাৎসি জার্মানির ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছে। দুই তথাকথিত গণতান্ত্রিক শক্তি, ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন— ইতালি ও জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখনকার মতো সোভিয়েত রাশিয়াকে ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে লুপ্ত করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু কতদিন তা সম্ভব হবে? এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, এশিয়ার মতো ইউরোপেরও সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ওপর রীতিমতো আঘাত করেছে।

এবারে আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রসঙ্গ। অসুস্থতার কারণে আমি মাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করব। প্রথমত, বিগত কিছু দিন যাবৎ আমার যা মনে হচ্ছে, অর্থাৎ স্বরাজের প্রশ্ন উত্থাপন করে আমাদের ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে একটি চরমপত্র দেবার যে সময় এসেছে, সেই কথাটা আমাকে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধহীন ভাষায় ব্যক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থেকে আমাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিকল্পনা করে চাপিয়ে দেওয়া হবে তার জন্যে অপেক্ষা করার দিন অনেক কাল চলে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কবে আমাদের জোর করে গিলিয়ে দেওয়া হবে, এখন আর প্রশ্নটা তা নয়। প্রশ্ন হল, কয়েক বছরের জন্যে, সুবিধামতো যদি তা মুলতুবি রাখা হয়, যতদিন না ইউরোপে শান্তি সুনিশ্চিত হচ্ছে, তা হলে আমরা কী করব। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, চতুঃশক্তি চুক্তির ফলেই হোক, কিংবা অন্য কোনও ভাবেই হোক ইউরোপে শান্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হলেই গ্রেট ব্রিটেন সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করবার নীতি অবলম্বন করবে। এখন যে তারা প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের বদলে আরবদের সন্তুষ্ট করবার কিছু কিছু লক্ষণ দেখাচ্ছে, তার কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের নিজেদেরকে দুর্বল বোধ হচ্ছে। অতএব আমার মতে আমাদের উচিত আমাদের দাবি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে একটি চরমপত্রের আকারে পেশ করা এবং সময় বেঁধে দেওয়া, এর মধ্যে

আমরা উত্তর আশা করব, যদি সেই উত্তর পাই, আমাদের জাতীয় দাবি মানতে তাদের বাধ্য করবার জন্যে, আমাদের হাতে যা যা আছে সে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের হাতে আছে দুটি অস্ত্র, গণ আইন-অমান্য অথবা সত্যাগ্রহ এবং সর্বভারতীয় সত্যাগ্রহের মোকাবিলা দীর্ঘকাল করবার অবস্থায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এখন নেই।

আমার দেখে দুঃখ হয় যে, কংগ্রেসের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা নিরাশাবাদী, যাঁরা মনে করেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর বড় আঘাত হানার উপযুক্ত সময় এখনও আসেনি। কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তববাদী দৃষ্টিতেই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আমি নিরাশার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না। কংগ্রেস এখন আটটি প্রদেশে ক্ষমতায় আছে.এবং আমাদের জাতীয় সংগঠনের শক্তি ও মর্যাদা এখন উচ্চে। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে গণআন্দোলন যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। এবং সব শেষে বলি, যদিও এটি তুচ্ছ ব্যাপার নয়, দেশীয় রাজ্যগুলিতেও এক অভূতপূর্ব জনজাগরণ ঘটেছে। এর চাইতে শুভ লগ্ন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে আমরা আর কী আশা করতে পারি। স্বরাজের উদ্দেশ্য যাত্রার শেষপর্বের জন্যে, বিশেষত যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল? অতিশয় ঠাণ্ডা মাথায়, বাস্তববাদী হিসাবে আমি বলতে পারি, বর্তমান পরিস্থিতির যাবতীয় বিষয় আমাদের পক্ষে এতদূর সুবিধাজনক যে আমাদের অত্যন্ত আশাবাদী হওয়া উচিত। শুধু আমরা যদি আমাদের যাবতীয় বিভেদ ভুলে যাই, আমাদের সমস্ত সামর্থ্য ও সম্পদ একত্র করি, এবং জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে আমাদের কর্তব্য পূর্ণমাত্রায় পালন করি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর আমাদের আক্রমণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। আমাদের কি এমন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি হবে, যাতে আমরা বর্তমান অনুকূল পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারব, না কি এমন সুযোগ, একটি জাতির জীবনে যা কদাচিৎ আসে, আমরা হারাব?

দেশীয় রাজ্যসমূহে জনজাগরণের কথা আমি আগেই বলেছি। আমার সুনিশ্চিত মত, হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতি আমাদের যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা আমাদের পরিবর্তন করা উচিত। আপনারা জানেন, কংগ্রেসের নামে দেশীয় রাজ্যে কয়েক ধরনের আন্দোলন সে-প্রস্তাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী, পার্লামেন্ট-সংক্রান্ত কাজকর্ম এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন, এই দুইয়ের কোনওটিই কংগ্রেসের নামে করা যায় না। কিন্তু হরিপুরার পরে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। আজ আমরা দেখছি, অধিকাংশ স্থানে সার্বভৌম শক্তি ভারতের ভাইসরয় স্বয়ং যার প্রতিভূ) দেশীয় রাজ্যের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একত্রে কাজ করছেন। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের কি উচিত নয়, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের কাছাকাছি যাওয়া? আজ আমাদের কর্তব্য কী, সে-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

উপরোক্ত নিষেধ প্রত্যাহার ছাড়াও, দেশীয় রাজ্যগুলিতে নাগরিক স্বাধীনতা ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের জন্যে জনআন্দোলনের পরিচালনা সর্বাত্মক ও নিয়মিত ভিত্তিতে ওয়ার্কিং কমিটিকে করতে হবে। এতদিন পর্যন্ত কাজ হয়েছে টুকরো টুকরো ভাবে, এবং তার পিছনে কোনও নিয়ম কিংবা পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু এখন সময় এসেছে, এ দায়িত্ব ওয়ার্কিং কমিটিকে গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বাত্মকভাবে ও নিয়মিত এর পালন করতে হবে, এবং প্রয়োজন হলে সেই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করতে হবে। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশ এবং সর্বভারতীয় রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দের অধিবেশনের সহযোগিতায় পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।

আগেই আমি পূর্ণ স্বরাজের অভিমুখে আমাদের যাত্রার শেষপর্ব এখনই সমাধা করার প্রয়োজনের কথা বলেছি। তার জন্যে যথেষ্ট প্রস্তুতি দরকার। সর্বপ্রথম ক্ষমতার প্রলোভনে যত কিছু দুর্নীতি ও দুর্বলতা আমাদের কর্মীদের মধে প্রবেশ করেছে, নির্মম হাতে তার সমস্ত দূর

করবার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। তারপর দেশের যত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠন, বিশেষত কিষাণ আন্দোলন ও শ্রমিক ইউনিয়ন, তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আমাদের কাজ করতে হবে। দেশের সমস্ত বিপ্লবীশক্তিকে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করতে হবে এবং দেশের সব সাম্রাজ্য বিরোধীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্যে একমুখী হতে হবে।

বন্ধুগণ, আজ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন, বিভেদ দেখা দিয়েছে। তার ফলে আমাদের বন্ধু অনেকে নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম। আজকে আপনারা যে মেঘ দেখছেন, তা কেটে যাবে। স্বদেশবাসীর ওপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি নিশ্চিত, অচিরে আমরা আমাদের যাবতীয় সমস্যার নিরসন করে দলের মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে আনতে পারব, খানিকটা একই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের সময়ে এবং তারপরে যখন দেশবন্ধু দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, যাঁদের স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে, তাঁরা স্বরাজ্য পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রার্থনা করি, আমার পরলোকগত গুরু পরম শ্রদ্ধেয় মতিলালজি এবং ভারতজননীর অন্য মহান সন্তানেরা যেন আমাদের বর্তমান সংকটের সময়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করেন এবং মহাত্মা গান্ধী, যিনি এখনও আমাদের জাতিকে নেতৃত্ব ও সহায়তা প্রদান করবার জন্যে আমাদের মধ্যে আছেন, তিনি, যেন বর্তমানের জটিল পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের সাহায্য করেন।

আমার অদ্ভুত অসুখ

১৯৩৯-এর এপ্রিলে মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ।

১৯৩৯-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি। সেবাগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এবং তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে আমি সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ওয়ার্ধায় ফিরে আসি। রাত্রে কয়েকজন বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং গুরুতর বা জরুরি কিছু করার না থাকায় আমরা গল্পগুজব করতে থাকি। আমি অসুস্থ বোধ করছিলাম, তাই তাঁদের সামনেই আমি নিজের তাপমাত্রা দেখি। দেখলাম জ্বর ৯৯.৪ ডিগ্রি হয়েছে। ব্যাপারটার উপর তেমন কোনও গুরুত্ব দিইনি।

পরের দিন ১৬ ফেব্রুয়ারি আমি ওয়ার্ধা থেকে কলকাতা রওনা হব। সকালে সুস্থ বোধ করার বদলে কেমন যেন খারাপ লাগছিল। ভাবলাম গত রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ার জন্যে ওইরকম হয়েছে। ওয়ার্ধায় এবং নাগপুর স্টেশনে অনেক বন্ধুবান্ধব আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, নিজের কথা ভাববার তাই সময় পাইনি। নাগপুর স্টেশন ছেড়ে ট্রেন যখন চলতে শুরু করেছে একমাত্র তখনই আমি বুঝতে পারলাম, আমি অসুস্থ। এইবার তাপমাত্রা নিয়ে দেখি জ্বর ১০১ ডিগ্রি। সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘণ্টা দুয়েক পরে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এক ভদ্রলোক আমার কামরায় এলেন। তাঁর উপস্থিতি আমার ভাল লাগছিল না, বিশেষ করে যখন জানতে পারলাম তিনি কলকাতা পর্যন্ত সারা পথ সঙ্গে যাবেন, কারণ, জ্বর অবস্থায় তখন আমরা একলা থাকতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু উপায় নেই;

তাঁরও সেখানে থাকার যেমন অধিকার ছিল আমারও তেমনই। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করে সহৃদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কী হয়েছে? আপনাকে ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।" আমি বললাম, "আমি ভাল বোধ করছি না, আমার জ্বর এসেছে।" তখন তিনি বললেন, "আপনি ঘামছেন দেখছি। নিশ্চয়ই আপনার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে।"

সমস্ত দিন সমস্ত রাত আমি আমার বার্থে পড়ে রইলাম এবং সর্বক্ষণ ঘেমেছি। তাঁর কথাগুলো বারে বারে আমার মাথায় ঘুরছিল "আপনাকে ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।" আমাকে অত খারাপ দেখাবার কারণ কী? আমার মুখের ভাব সবসময় এমনই থাকে যে অনেকদিন অসুখে ভোগার পরও আমাকে কদাচিৎ সত্যি খারাপ "দেখায়"। তা ছাড়া একদিনের অসুখে আমাকে কী করে এতখানি কাহিল দেখাতে পারে? আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম।

পরের দিন সকালে আমি প্রতিজ্ঞা করে উঠলাম, আমাকে দেখাতেই হবে আমি সুস্থ আছি। আমি বাথরুমে গিয়ে ভাল করে মুখ-হাত ধুয়ে, দাড়ি কামিয়ে যখন বেরিয়ে এলাম তখন আগের দিনের থেকে কিছুটা ভাল দেখাচ্ছিল। আমার সহযাত্রী সহানুভূতির সঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কেমন বোধ করছি। আমার জবাব শুনে তিনি বললেন, "আচ্ছা, আজ আপনাকে অনেক ভাল দেখাচ্ছে। কাল আপনাকে ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল।"

স্টেশান থেকে আমি বাড়িতে গিয়ে দেখি কয়েকজন বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছেন। কিছুটা জোর করেই তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলাম বটে, তবে ১১টা নাগাদ এমন কাহিল বোধ হতে লাগল যে তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হল। বিছানায় শুয়ে পড়তে হল। সেই বিছানায় বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাকে পড়ে থাকতে হয়েছিল।

ডাক্তার এলেন এবং সবরকম পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে জানালেন রোগ গুরুতর। প্যাথোলজিস্টকে ডাকা হল, তিনি যথারীতি পরীক্ষার জন্যে রক্ত ইত্যাদির নমুনা নিয়ে গেলেন। পরে আরও অনেক ডাক্তারকে ডেকে আনা হল। তার মধ্যে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ডাক্তারদের অগ্রগণ্য স্যার নীলরতন সরকারও ছিলেন।

ডাক্তাররা যখন রোগ নিয়ে চিন্তিত এবং কী করে তা আয়ত্তে আনা যায় তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন, আমি নিজে তখন বাইরের আমার নানা কাজের কথা ভাবছিলাম। ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি বিহারের হাজিপুরে ও মজঃফরপুরে আমার কাজ ছিল এবং ২২ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ছিল ওয়ার্ধায়। ১১ ফেব্রুয়ারি আমি ওয়ার্ধা থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছই এবং ওই দিনই সন্ধ্যায় আমি পাটনা রওনা হয়ে যাব ঠিক ছিল। আমার আগেকার কর্মসূচি বহাল আছে কিনা এবং আমি তা মেনে চলব কিনা জানতে চেয়ে বিহার থেকে টেলিগ্রাম ও টেলিফোন আসতে লাগল। আমি জানিয়ে দিলাম, বহাল আছে, সেইসঙ্গে একথাও জানিয়ে রাখলাম, যদিও আমি অসুস্থ, যেমন করে হোক আমি আসবই। শুধু তাঁদের বলেছিলাম শোভাযাত্রার সব ব্যবস্থা বাতিল করতে এবং আমার কর্মসূচি যতদূর সম্ভব হালকা করতে। বাড়িতে আমার নিজের লোকদের বললাম, সেইদিনই (১৭ ফেব্রুয়ারি) রাত্রের ট্রেনে আমি হাজিপুর হয়ে পাটনা যাচ্ছি। ডাক্তাররা যাই বলুক না কেন, ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমার যে কর্মসূচি ঠিক ছিল তা পালন করতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ডাক্তারের নির্দেশ শোনবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে আমি বলে দিলাম, আমার ১০৫ ডিগ্রি জ্বর থাকলেও আমি রওনা হয়ে যাব। তারপর আমার টিকিট কেটে আনতে ও বার্থ রিজার্ভ করতে নির্দেশ দিলাম।

কিন্তু বেলা যত বাড়তে লাগল, আমার জ্বরও উত্তরোত্তর উঠতে লাগল। সবচেয়ে মারাত্মক—অসম্ভব মাথার যন্ত্রণায় মনে হল রগ দুটো ছিঁড়ে যাচ্ছে। যখন রওনা হবার সময় এল সবকিছু ঠিক থাকলেও আমি তখন মাথা তুলতে পারছি না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে হার

মানতে হল এবং সংকল্প ত্যাগ করতে হল। অনুশোচনার সঙ্গে টেলিগ্রাম করে জানাতে হল ওই রাত্রে আমার পক্ষে রওনা হওয়া অসম্ভব, তবে পরের দিন রওনা হতে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব। পরের দিন অবস্থার কোনও উন্নতি হল না, বরঞ্চ তা আরও খারাপ হল। তা ছাড়া ১৭ তারিখে আমার রওনা না হওয়ার ফলে সব আয়োজন বানচাল হয়ে গেল। অতএব মজঃফরপুরে যাওয়াটা একেবারে বাতিল করে দিতে হল। অপ্রত্যাশিত এই অবস্থা বিপর্যয়ে আমার গভীর অনুশোচনা কিছুতেই বোঝান যায় না।

যদিও ১৮ ফেব্রুয়ারির পর মজঃফরপুরকে আমার কর্মসূচি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, নিজের মনে আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না। ওয়ার্কিং কমিটির ওয়ার্ধায় মিটিংয়ের জন্যে আমি ভাবতে আরম্ভ করলাম। ওয়ার্ধায় যাওয়া অসম্ভব বলে ডাক্তাররা আমাকে বারেবারে সাবধান করতে লাগলেন। আমি যদি ওয়ার্কিং কমিটির চিন্তা ত্যাগ করে সুস্থ হয়ে ওঠার দিকে মন দিই, আমি তা হলে হয়তো ত্রিপুরি কংগ্রেসে যেতে পারব—নইলে ত্রিপুরিকেও বাতিল করতে হতে পারে। কিন্তু এত সব হুঁশিয়ারি বধিরকে বলার মতো। ডাক্তারের নির্দেশ সত্ত্বেও আমার যাবার আয়োজন চলল এবং বন্ধুদের দয়ায় ২২ ফেব্রুয়ারি নাগাদ আমাকে নাগপুরে নিয়ে যাবার জন্যে একটা এরোপ্লেনও ঠিক করা হল।

২১ তারিখে আমি ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম ডাক্তাররা ঠিকই বলেছেন, ট্রেনে বা প্লেনে কিছুতেই আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। একথা মহাত্মা গান্ধীকে ও সর্দার প্যাটেলকে আমি টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম, সেইসঙ্গে প্রস্তাব করলাম ত্রিপুরি কংগ্রেস পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং যেন মুলতুবি রাখা হয়। তখন আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন (বা তেরোজন) সদস্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করবেন।

ওই দুটো টেলিগ্রাম নিয়ে অনেকরকমই জল্পনা হয়েছে, বলা হয়েছে আমি নাকি ওয়ার্কিং কমিটিকে বাঁধাধরা রুটিনমাফিক কাজ করবারও অনুমতি দিইনি। এরকম অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। প্রথমত টেলিগ্রামে এমন কিছুই ছিল না যাতে বোঝা যায় আমি ওয়ার্কিং কমিটিকে রুটিনমাফিক কাজও করতে দিতে চাইনি। আমার একমাত্র ভাবনার কারণ ছিল কংগ্রেসের খসড়া প্রস্তাবগুলি। কংগ্রেসের বার্ষিক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ঠিক আগে সাধারণত সেগুলি ওয়ার্কিং কমিটিই রচনা করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, সর্দার প্যাটেলকে আমি যে টেলিগ্রাম করেছিলাম তাতে মুলতুবি করা সম্পর্কে আমার মতামত জানিয়ে আমি তাঁকে অনুরোধ করি অন্যান্য সদস্যদের অভিমত জেনে নিয়ে তিনি যেন আমাকে টেলিগ্রাম করে জানান। আমার টেলিগ্রাম দুটির জবাবে আমি পেলাম ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্যের পদত্যাগ। এইসব সদস্য যদি আমার অনুপস্থিতিতেই ত্রিপুরি কংগ্রেসের জন্যে প্রস্তাব রচনা করতে চাইতেন, আমি নিশ্চয় তাঁদের পথে অন্তরায় হতাম না। কাজকর্ম চালানোর ব্যাপারে অন্যান্য সদস্যরা যদি মুলতুবি করা সম্পর্কে আমার সঙ্গে একমত না হতেন অথবা আমার সত্যিকার অভিপ্রায় কী সে সম্পর্কে তাঁদের যদি কোনও সংশয় থাকত, তাঁরা সহজেই আমাকে একটা ট্রাঙ্ককল বা টেলিগ্রাম করতে পারতেন। দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোর ব্যাপারে আমার দিক থেকে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। এছাড়া অন্যান্য ও আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিষয়েও, যদি তাঁরা একবার খোঁজ চালিয়ে যেতে চাইতেন আমার দিক থেকে কোনওই বাধা পেতেন না। আমার একমাত্র ভাবনা ছিল, ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়ে কংগ্রেসের খসড়া প্রস্তাবগুলি এমনভাবে করিয়ে নেওয়া যাতে সব সদস্যরা একমত হন—তা না হলে বিপদ হবে এই যে, 'আনুষ্ঠানিকভাবে' যখন খসড়া প্রস্তাবগুলি সাবজেক্টস কমিটির কাছে আসবে তখন দেখা যাবে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেছেন। এই মতৈক্যের জন্যে ওয়ার্কিং কমিটিতে খসড়া প্রস্তাবগুলি রচিত হবার সময় আমার উপস্থিতি

দরকার ছিল। সেইজন্যেই ত্রিপুরি কংগ্রেস পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং মুলতুবি রাখার কথা আমি বলেছিলাম। আমার প্রস্তবমতো কাজ ভালভাবেই হত যদি বারোজন (বা তেরোজন) সদস্য সবাইকে হতচকিত করে ইস্তফা দিয়ে আমায় জবাব না দিতেন।

২১ ফেব্রুয়ারি আমি সর্দার প্যাটেলকে এই টেলিগ্রাম করি:

সর্দার প্যাটেল, ওয়ার্ধা

মহাত্মাজিকে করা আমার টেলিগ্রাম অনুগ্রহপূর্বক দেখিবেন। দুঃখের সঙ্গে বোধ করিতেছি ওয়ার্কিং কমিটিকে কংগ্রেস পর্যন্ত মুলতুবি রাখিতে হইবে। সহকর্মীদের পরামর্শ লইয়া টেলিগ্রামে অভিমত জানাইতে অনুরোধ করি।—সুভাষ

কিন্তু আমি অন্য কথায় চলে এসেছি বলে দুঃখিত। এটি 'রাজনৈতিক' প্রবন্ধ নয়, এবং আমি যখন কলম ধরেছিলাম, আমি 'আমার অদ্ভুত অসুখ' সম্বন্ধে কিছু লিখতে চেয়েছিলাম এবং বলতে চেয়েছিলাম কেন আমি আমার অসুখকে অদ্ভুত বলেছি। এবারে আমি আমার কথায় ফিরে যাই।

২১ তারিখে সন্ধেবেলা পর্যন্ত হতাশার মধ্যেও আমি আশা করছিলাম আমি ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে যোগদান করতে পারব, অন্ততপক্ষে ২২ তারিখে প্লেনে সেখানে হাজির হতে পারব। কিন্তু ডাক্তারদের এইসব চিন্তার কোনও বালাই ছিল না। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, ওয়ার্ধার প্রশ্নই উঠতে পারে না—তাঁদের লক্ষ ছিল ত্রিপুরি। তাঁদের একমাত্র প্রচেষ্টা ছিল আমার অবস্থা পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে এমন করে তোলা যাতে আমি অন্তত ত্রিপুরি কংগ্রেসে গিয়ে উঠতে পারি। স্যার নীলরতন সরকারের বুলেটিন তো ত্রিপুরি কংগ্রেসকেও নিষিদ্ধ বলে জানিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমি আমার ডাক্তারদের যুক্তিতর্ক দিয়ে নানাভাবে বুঝিয়ে শেষপর্যন্ত সোজা জানিয়ে দিলাম: যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, আমি আমাদের ইতিহাসের এমন সংকটমুহূর্তে ত্রিপুরি কংগ্রেস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি আমি যাতে কংগ্রেসে যোগদান করতে সমর্থ হই তার জন্যে মানুষের পক্ষে যতখানি সম্ভব তাঁরা আমার জন্যে তা করেছেন।

আমার পাঁচ সপ্তাহের অসুখের কথা যখন ভাবি, তখন আমাকে একটি স্বীকারোক্তি করতেই হয়। শুরু থেকে আমার অসুখ সম্পর্কে ডাক্তাররা যতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন আমি ততখানি দিইনি—আসলে আমি ভেবেছিলাম তাঁরা অকারণে বেশি ভয় পাচ্ছেন— এবং তাঁদের সঙ্গে যতখানি সহযোগিতা করা আমার উচিত ছিল আমি তা করিনি। অপরপক্ষে আমার একটা যুক্তিসংগত অছিলাও ছিল। আমার পক্ষে শরীর ও মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া অসম্ভব ছিল। আমি অসুখে পড়ি অত্যন্ত সংকটের সময়ে। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পদত্যাগ সেই সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আমাকে আক্রমণ করে বিবৃতির পর বিবৃতি বার হতে থাকে। সবচেয়ে মর্মান্তিক আঘাত আসে এমন জায়গা থেকে যেখান থেকে তা মোটেই প্রত্যাশিত ছিল না। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদত্যাগ করায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আপিস থেকে পাঠিয়ে দেওয়া জরুরি কাজকর্ম বাধ্য হয়ে আমাকেই দেখতে হয়। সাক্ষাৎকার সম্পর্কেও স্থানীয় বন্ধুবান্ধব ও দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা না করলেও, অনেক দূর জায়গা থেকে যেসব কংগ্রেসকর্মী কংগ্রেসের কাজে কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা না করে ফিরিয়ে দিতে আমি পারিনি। এইসব এবং অন্যান্য আরও কারণে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকলেও আমার শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম সম্পর্কে ডাক্তারদের উপদেশ মেনে চলা

আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখানে এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলছি। আমার বিরুদ্ধে যখন বিবৃতির পর বিবৃতি বার হচ্ছে তখন আমার চুপ করে থাকাটারই অপব্যাখ্যা করা হচ্ছিল এবং বিভিন্ন প্রদেশের এমনকী দূরাঞ্চলের বন্ধুরা আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন আমার বিরুদ্ধে যেসব ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে অন্ততপক্ষে তার মধ্যে কতকগুলিকে খণ্ডন করার জন্যে আমি যেন যাহোক একটা জবাব প্রকাশ করি। আমার ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন বেশ কিছুটা দ্বিধাসংকোচের পর একদিন বিকেলে আমি ঠিক করে ফেললাম আজই আমার বিবৃতিটা লিখে ফেলব, তার ফল যাই হোক। ব্যাপারটা কিন্তু সহজ হল না। প্রথমে কী কী অভিযোগ করা হয়েছে তা বোঝবার জন্যে তদবধি যেসব বিবৃতি বার হয়েছে আমাকে সেগুলো পড়তে হল। তা শেষ করার পরই আমি আমার বিবৃতি বলে যেতে শুরু করলাম। যখন টাইপ করা খসড়াটা দেখা শেষ করে খবরের কাগজে তা ছাপাবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছি তখন মাঝরাত। তখন আমার জ্বর দেখা হল, ১০৩ ডিগ্রি। এর আগে মোটামুটি আমার অবস্থার উন্নতি হয়েছিল এবং গত দু'দিন সন্ধেয় ১০১ ডিগ্রির বেশি জ্বর ওঠেনি। সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে নিজের ইচ্ছামতো মাথা খাটানোর ফলে যে অবনতি ঘটল তার জন্যে ডাক্তাররা আক্ষেপ করলেন বটে কিন্তু আমি যে অবস্থায় পড়েছিলাম তাতে আমার তা না করে উপায় ছিল না।

এবারে আমার ঝঞ্ঝাটগুলির মধ্যে যেটি মোক্ষম সেই প্রসঙ্গে আসছি, কারণ যা ঘটেছে তার অনেকখানি একমাত্র তাই থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধা থেকে ফিরে এসে কলকাতায় যখন আমি অসুস্থ হয়ে রয়েছি তখন স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকেরা সর্বত্র গুজব রটিয়ে চলছিল যে আমার অসুখটা 'মেকি', ২২ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং এড়াবার জন্যে আমার 'রাজনৈতিক' জ্বরকে কাজে লাগানো হচ্ছে। আমাকে এইখবর জানায় কয়েকটি প্রদেশ থেকে আমার বন্ধুরা এবং এই খবরের সত্যতা সম্পর্কে আমি সন্দেহ করতে পারি না। যেসব লোকেরা জেনেশুনে বদ মতলবে ওইরকম মিথ্যা গুজব রটাচ্ছিল, এমনকী স্যার নীলরতন সরকারের বুলেটিনও তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। একই ধরনের প্রচার চালানো হয়েছিল জব্বলপুরে ও ত্রিপুরিতে। ৬ মার্চ বিকেল ৪টা নাগাদ যখন আমি জব্বলপুরে পৌঁছই আমার জ্বর তখন ১০১ ডিগ্রি। অ্যাম্বুলেন্সে করে যখন ত্রিপুরিতে আমার ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছই জ্বর তখন ১০৩ ডিগ্রিতে উঠেছে। ত্রিপুরিতে পৌঁছনোর পর অভ্যর্থনা কমিটির ডাক্তাররা আমার ভার নিলেন। আমাকে পরীক্ষা করার পর তাঁদের মধ্যে একজন অপর একজনের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকালেন, তৎক্ষণাৎ আমার কাছে তা অদ্ভুত ঠেকল। দিন দুয়েক পর সব ব্যাপারটা আমি জানতে পারলাম। ত্রিপুরিতে সবাইকে বলা হয়েছিল আমি সত্যি অসুস্থ নই এবং এই প্রচারের পাল্লায় ডাক্তাররাও পড়েছিলেন। আমার পৌঁছবার পর আমাকে পরীক্ষা করে যখন তাঁরা দেখতে পেলেন আমি গুরুতর অসুস্থ, তাঁরা অবাক হন এবং মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক প্রচার চালানো হয়েছে বলে রেগে যান। তাঁদের রাগ আরও বেড়ে যায় যখন ত্রিপুরিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের বুলেটিনও বিশ্বাস করতে নারাজ হয়। যেমন, একদিন ওয়ার্কিং কমিটির একজন গণ্যমান্য প্রাক্তন সদস্য অভ্যর্থনা কমিটির ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করেন আমার সত্যিই ১০২ ডিগ্রি জ্বর হয়েছে কিনা এবং তিনি (ডাক্তারবাবু) নিজে জ্বর দেখেছেন কিনা। কয়েকটি স্বতন্ত্র সূত্র থেকে আমার কাছে খবর আসে যে, এমনকী উচ্চতম মহলেও আমার অসুখ বিশ্বাস করা হয়নি। একদিন নিছক উত্ত্যক্ত বোধ করে অভ্যর্থনা কমিটির ডাক্তাররা মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের সিবিল হাসপাতালগুলির ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং জব্বলপুরের সিবিল সার্জনকে নিয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড বসালেন। তাঁদের যুক্ত বিবৃতি বার হবার পর, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটল। কিন্তু এইসব হোমরাচোমরা সরকারি লোকদের নিয়ে আসার ফল হল এই যে কংগ্রেসের উন্মুক্ত অধিবেশনে আমার যোগদান করা একেবারে বারণ হয়ে গেল। অভ্যর্থনা কমিটির ডাক্তারদের

হাতে পায়ে ধরে কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগদান করার অনুমতি কোনওমতে হয়তো আদায় করতে পারতাম, কিন্তু সরকারি অফিসারদের কাছে তা সম্ভব নয়। তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশ করার আগে চালাকি করে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নেন তাঁদের অভিমতে আমার আস্থা আছে কিনা এবং তাঁদের নির্দেশ মানব কিনা। স্বভাবত আমাকে সায় দিতে হয়েছিল এবং তারপরে আমি যেন নিজের জালেই বাঁধা পড়লাম— কারণ আমাকে পরে বলা হল, কংগ্রেসের উন্মুক্ত অধিবেশনে আমি যোগদান করতে পারব না। অভ্যর্থনা কমিটি আমার জন্যে যে আয়োজন করেছিল তা খুবই সন্তোষজনক এবং শারীরিক প্রয়োজনের দিক থেকে আমার অভিযোগ করার কিছুই ছিল না। কিন্তু উপরের ওই ও অন্যান্য নানা কারণে ত্রিপুরির মানসিক পরিবেশ ছিল বেশ পীড়াদায়ক। কংগ্রেসের আগেকার কোনও অধিবেশনে এরকম অভিজ্ঞতা কখনও আমার হয়নি।

১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে আমি যেসব চিঠি, টেলিগ্রাম ইত্যাদি পেয়েছি, তা পড়বার আনন্দ ছাড়াও, সেগুলি একসঙ্গে জড়ো করলে রীতিমতো একটা বই হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিদিন তা আসছে—শুধু চিঠি বা টেলিগ্রাম নয়, নানা ধরনের ওষুধপত্র মাদুলি কবচ ভর্তি পার্সেল ও প্যাকেটও তাতে আছে। ধর্মমত অনুযায়ী লেখক ও প্রেরকদের আমি ভাগ করতে চেষ্টা করছিলাম, দেখলাম তাঁদের মধ্যে সব ধর্মমতই আছে। কেবলমাত্র সব ধর্মমতই নয়, সবরকমের চিকিৎসা শাস্ত্র (সব 'প্যাথি', কথাটা যদি ব্যবহার করতে পারা যায়) এবং নারীও আছে পুরুষও আছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পার্সি ইত্যাদি—অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, বৈদ্য, হাকিম, প্রাকৃতিক চিকিৎসক, গণৎকার ইত্যাদি— নারী পুরুষ— সকলে আমাকে লিখে চলেছেন, আমাকে উপদেশ দিয়ে এবং কখনও কখনও ওষুধের নমুনা ও কবচ সঙ্গে পাঠিয়ে। স্বভাবত তাঁদের সহৃদয়তার জন্যে চিঠি লিখে তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানানো এখন আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কখনও কখনও আমার কাছ থেকে জবাব না পেয়ে একাধিকবার তাঁরা লিখেছেন। এত সব ব্যবস্থাপত্র নিয়ে আমি এখন কী করি? প্রথমে আমি আমার ডাক্তারদের হাতে সেগুলি তুলে দিই, সেগুলি কীভাবে ব্যবহার করা হবে তাঁরাই তা সবচেয়ে ভালভাবে ঠিক করতে পারবেন বলে, কিন্তু যেসব নিদানপত্র বা ওষুধ এসেছে ডাক্তাররা অধিকাংশক্ষেত্রে তা ব্যবহার করতে নারাজ। তাঁদের বা আমার দিক থেকে তা নির্মম নয় কি? আমি বুঝি না।

ওষুধপত্র নিদানপত্র ছাড়াও অন্য এক ধরনের চিঠিপত্র ও পার্সেলও আমি পাচ্ছি। সাধু ও গণৎকাররা আমাকে কবচ ও আশীর্বাদি পাঠাচ্ছেন। এবং অপরিচিত কত শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহমর্মী বন্ধু কোনও মন্দিরে বা পীঠস্থানে আমার স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করে পুজো দিয়ে আশীর্বাদি ফুল পাঠাচ্ছেন। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এইসব আশীর্বাদি ফুল, পাতা, ভস্ম ইত্যাদি (বা নির্মাল্য) ভক্তিভরে গ্রহণ করে কিছুক্ষণের জন্য মাথায় রাখতে হয় বা কপালে ছোঁয়াতে হয়। মেয়েরা ওতেই থামে না। ওই কাজটুকু হয়ে গেলে তারা এগুলি ফেলে দিতে রাজি নয়। ফলে আমার বালিশের তলায় অসংখ্য কবচ ও এই ধরণের প্যাকেট পাওয়া যাবে। রোজই তারা সংখ্যায় বাড়ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনের গঠন অত্যন্ত যুক্তিবাদী, তবে আমি অপরের মনোভাব ও বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করি যদিও তা আমার মতের সঙ্গে মেলে না।

অতএব আমি আপনমনেই ভেবে চলেছি এতসব নিদান, ওষুধ, মাদুলি কবচ, ফুল, ভস্মর আসল মূল্য কী। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী—ভারতের সকল প্রান্ত থেকে সমস্ত সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর কাছ থেকে এইসব এসেছে, এই ভেবে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমার এত শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহকর্মী বন্ধু আছে জেনে কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ জলে ভরে এল। স্বপ্নেও আমি কখনও এতটা ভাবিনি। হতে পারে যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে কারও কারও

কিছুটা আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্য ছিল তবে এঁদের মধ্যে বিরাট অংশ আমার কষ্টে আমার জন্যে শুধুমাত্র সত্যিকার সমবেদনা থেকেই যে লিখেছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রেসক্রিপশন, ওষুধ বা মাদুলিগুলোর বাস্তব মূল্য হয়তো কিছুই নেই কিন্তু তাদের পিছনে ছিল সত্যিকারের প্রীতি ও সমবেদনা বোধ, যার মূল্য আমার কাছে অসীম তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীর। পার্থিব ওষুধপত্র বা গণৎকারদের মাদুলি কবচের থেকে এইসব শুভেচ্ছা যে আমাকে সারিয়ে তুলতে অনেক বেশি সাহায্য করবে তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। যেখানে নিদানপত্র, ওষুধ বা কবচ ব্যবহার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সেখানেও যাঁরা তা পাঠান তাঁদের সহৃদয় শুভেচ্ছা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করি।

ত্রিপুরির পীড়াদায়ক মানসিক পরিবেশের দরুন রাজনীতি সম্পর্কে এমন একটা ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা নিয়ে সেখান থেকে চলে আসি যা গত উনিশ বছরের ভিতরে আগে কখনও তেমন বোধ করিনি। জামাডোবায় বিছানায় শুয়ে দিনরাত যখন ছটফট করেছি, নিজেকে তখন বারেবারে এই প্রশ্নই করেছি। সর্বোচ্চ মহলেও যখন এত ক্ষুদ্রতা, এত প্রতিহিংসাপ্রবণতা তখন আমাদের জনসেবাব্রতের পরিণতি কী হবে! হিমালয়ের সেই চিরন্তন আহ্বান—আমার জীবনে যা প্রথম আকর্ষণ—সেইদিকে স্বাভাবিকভাবে আমার ভাবনার মোড় ঘুরে গেল। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আমাদের রাজনীতির পরিণাম যদি এই হয় তা হলে, অরবিন্দ ঘোষ যাকে "দিব্য জীবন" বলেন, কেন আমি তা থেকে সরে এলাম। এতদিনে কি মায়ার আবরণ ছিন্ন করে সব প্রেম ভালবাসার উৎসমুখে ফিরে যাবার সময় আমার হয়েছে? উচিত-অনুচিতের সংশয় সন্দেহের দোলায় দিনের পর দিন রাতের পর রাত কেটে যেতে লাগল। এক এক সময় হিমালয়ের আহ্বান দুর্নিবার হয়ে উঠত। আমার মনের অন্ধকারে একটু আলো পাবার জন্যে আমি প্রার্থনা করতাম। তারপরে ধীরে ধীরে আমার নতুন এক দৃষ্টি খুলে গেল এবং আমার মানসিক স্থৈর্য আবার ফিরে আসতে লাগল—সেই সঙ্গে ফিরে এল মানুষের উপর এবং আমার স্বদেশবাসীর উপর আমার বিশ্বাস। যতই হোক ত্রিপুরি ভারতবর্ষ নয়। এছাড়াও আরেক ভারত আছে, তার পরিচয় রয়েছে এই গোছা গোছা চিঠিতে, নিদানে, রয়েছে এই রাশি রাশি ওষুধে, কবচে, নির্মাল্যে আরও কত কী-তে। এই ভারত—যে ভারত হয়তো সত্যিকার ভারত—এই ভারতের বিরুদ্ধে আমার কী নালিশ আছে? তারপরে আমার খেয়াল হল, ত্রিপুরিতেও দুটো জগৎ ছিল। যে ক্ষুদ্রতা ও প্রতিহিংসার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল তা ত্রিপুরির কেবল একটা অংশ সম্পর্কেই খাটে। অন্য অংশ সম্পর্কে? এই অংশ সম্পর্কে আমার কী নালিশ থাকতে পারে? তা ছাড়া ত্রিপুরিতে আমার অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন মানুষের উপর মৌলিক বিশ্বাস আমি হারাই কী করে? মানুষকে অবিশ্বাস করার অর্থ তার অন্তরের ভগবানকে অবিশ্বাস করা—নিজস্ব অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করা। ক্রমশ আমার সব সন্দেহ দূর হল, আবার আমি আমার সুস্থ স্বাভাবিক আশাবাদে ফিরে এলাম। আমার স্বাভাবিক সত্তাকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় এইসব প্রেসক্রিপশন, ওষুধ, মাদুলি, নির্মাল্যের অবদান ছিল অনেকখানি।

শারীরিক কষ্ট আমি অনেক ভোগ করেছি এবং অনেকরকম রোগের অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় রোগবিদ্যার পাঠ্যবইয়ে যত কিছুর হদিশ দেওয়া আছে আমি সব শেষ করে ফেলেছি। বাড়িতে, বাইরে এমনকী জেলেও আমি অসুস্থ হয়েছি। সত্যি বলতে কী, আমি যে এখনও বেঁচে আছি এবং চলেফিরে বেড়াচ্ছি তাই দেখে আমি নিজে প্রায়ই অবাক হয়ে যাই। কিন্তু ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ থেকে একমাস ধরে যেরকম একটানা বিষম ও তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে সেরকম যন্ত্রণা সারা জীবনে আমি কখনও ভোগ করিনি। একথা ঠিক, জেলখানাতে আমার রোগভোগ কম হয়নি। তবে তখনকার ভোগান্তিটা ছিল আরও অনেক বেশিদিনে ছড়িয়ে। কিন্তু এবারে আমার কী হল? গতমাসের

গোড়ার দিকে আমি আগের থেকে সুস্থই ছিলাম। কি করে এবং কেনই বা আমি হঠাৎ অমন গুরুতর অসুখে পড়লাম? হয়তো ডাক্তাররাই এর জবাব দেবার চেষ্টা করতে পারেন, তা সত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষ—রোগী নিজেই—কি চেষ্টা করতে পারে না?

ডাক্তারদের সামনে তো রোগ পরীক্ষার রিপোর্ট স্তূপাকার হয়ে জমে রয়েছে। এছাড়াও তাঁরা আমাকে বারেবারে পরীক্ষা করে দেখেছেন। রোগী ঠিক কী রোগে ভুগছে যদিও তাঁরা তা রোগীকে জানাতে চান না, তবু আমি এইটুকু আন্দাজ করতে পেরেছি, আমার বর্তমান ব্যাধি নিউমোনিয়া গোছের কিছু, সঙ্গে রয়েছে, লিভারের ও পেটের গোলযোগ। তাঁরা আরও বলেন, রক্তচাপ অসম্ভব কম। এর উপর সেডিমেন্টেশন পরীক্ষায় ও অন্যান্য উপায়ে জানা গেছে প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছে এবং দুর্বলতা অত্যধিক। রোগের আক্রমণকে যোঝবার ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার মতো যথেষ্ট শক্তি শরীরে নেই। এই ব্যাখ্যা কি যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত? আমি জানি না। কোনও না কোনও কারণে আমার জীবনীশক্তি আপাতত অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গেছে— এই ব্যাখ্যা ছাড়া আমার এই দুঃসহ শারীরিক ভোগান্তি ও দীর্ঘ অসুস্থতার সত্যিকার কারণ কী তা রোগশয্যায় আমাকে পরীক্ষা করে এবং অন্যান্য নানা পরীক্ষায় ধরা পড়েছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। অসুখে পড়ার কয়েকদিন পর থেকে আমার ব্যাধিটা কী ধরনের জানিয়ে নানা জায়গা থেকে আমার কাছে চিঠি ও টেলিগ্রাম আসতে লাগল। তার মধ্যে কয়েকটি টেলিগ্রাম ছিল, তাতে বলা হয়েছে আমার উপর বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই শুনে ডাক্তাররা প্রথমটা হেসেছিলেন। পরে তাঁরা ব্যাপারটা ভেবে দেখেন কিন্তু নিদানিক এমন কোনও সূত্র তাঁরা পেলেন না যাতে এই ধারণা সমর্থিত হয়। এ নিয়ে তাই তাঁরা আর মাথা ঘামালেন না।

কয়েকদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের একজন নামকরা পণ্ডিত এবং আদর্শ চরিত্রের লোক। আমাদের পরিবারের সকলে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। আমাদের কাছে একটি খবর পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে তাঁকে পাঠানো হয়েছে। আগের দিন আমার অসুখ নিয়ে আলোচনা করার জন্যে কয়েকজন পণ্ডিত ও জ্যোতিষী মিলিত হন, তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন, সাধারণ কারণ থেকে আমার এই অদ্ভুত ও জটিল অসুখ হয়নি। তাঁরা অভিমত দেন, তন্ত্রশাস্ত্রে যাকে মারণক্রিয়া বলা হয়, অর্থাৎ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বা ইচ্ছা শক্তির জোরে মৃত্যু ঘটানোর প্রয়াস, দেশের কোনও অঞ্চলে কেউ সেই ক্রিয়া করেছে। শুনে প্রত্যেকে কৌতূহল এবং সেইসঙ্গে মজাও বোধ করল। তান্ত্রিক যৌগিক ব্যায়ামে অস্বাভাবিক ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব একথা অবিশ্বাস না করেও এই ১৯৩৯ সালে মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদির মতো মনোজাগতিক ঘটনা ঘটা কি সম্ভব? আমাদের অভ্যাগত অধ্যাপক কিন্তু দৃশনিশ্চিত যে, যদিও এইরকম ঘটনা আজকাল বিরল, তবুও তা কিন্তু ঘটে থাকে। এবং তিনি এইরকম অনেক ঘটনার কথা বললেনও। তিনি আরও জানালেন, যদিও মারণক্রিয়া করা হয়েছে, আমার শক্তির দরুন এর ফলে মারাত্মক কিছু হবে না, কেবল আমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। আমার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে কীভাবে আমার সাবধান হওয়া উচিত সে বিষয়ে কিছু উপদেশ দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

আমি স্বীকার করছি এতশত কথা আমাকে একটুও বিশ্বাস করাতে পারেনি, কিন্তু তবু তা আমার মনে অপার্থিব একটা অনুভূতি রেখে গিয়েছিল। আমার মনের পেছনে আবছা যেন একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের ছাপ পড়েছিল। অন্য কোনও লোক ওইভাবে কথা বলতে এলে বিনা ভণিতায় তাকে বিদায় করে দেওয়া হত। কিন্তু অসাধারণ বিদ্বান ও নির্মল চরিত্রের এই ভদ্রলোক, যাঁর ন্যায়নিষ্ঠা সন্দেহাতীত, রাজনীতির সঙ্গে যাঁর কোনও সম্পর্ক নেই এবং যাঁর নিজের স্বার্থের ধান্দা নেই তাঁর কথার গুরুত্ব দেওয়া না হলেও কথা শুনতেই হয়।

প্রায় এই সময়েই অর্থাৎ ত্রিপুরি রওনা হবার কয়েকদিন আগে আমার কিছু বন্ধু আমাকে কবচ

পরতে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, তাতে নাকি আমার পক্ষে স্বাস্থ্যোদ্ধার করা সহজ হবে। আমার যুক্তিবাদী মন প্রথমে এতে বেঁকে বসল, কিন্তু এক দুর্বল মুহূর্তে আমি রাজি হয়ে গেলাম। দুটো আংটি ও চারটে কবচ নিতে রাজি হলাম। যাদের আমি জানি এবং যাদের ব্যবসাগত কোনও উদ্দেশ্য ছিল না তাদের কাছ থেকেই কেবলমাত্র ওই ক'টি আমি নিয়েছিলাম। যাদের আমি নিজে চিনি না তাদের কাছ থেকে মাদুলি কবচ কিছুই আমি নিইনি এবং এইরকম ছিল অসংখ্য। এগুলি সব ধারণ করলে নিজেকে একটা মাদুলি কবচের প্রদর্শনীতে পরিণত করা হত। ত্রিপুরি কংগ্রেসের সময় ভাল থাকার জন্যে আমি এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম যে আমি নিজেকে এই বলে বোঝাই যে, ওইসব মাদুলি কবচ ধারণ করার ফলে যদি আমার ভাল থাকার শতকরা পাঁচভাগের সম্ভাবনা থাকে তাই বা ছাড়ি কেন? এইভাবে আমার সহজাত যুক্তিবাদিতার সঙ্গে একটা রফায় আসা গেল—তবে ত্রিপুরি কংগ্রেস শেষ হয়ে যেতেই আমি আংটি দুটো ও কবচ চারটে সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেললাম। আপাতত আমার যুক্তিবাদিতার কোনও ভয় নেই এবং প্রকৃতি ও বরাতের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি।

আমার অসুখের কয়েকটা দিক আছে যার কারণ সাধারণ মানুষ হিসেবে অন্তত আমি কিছুই খুঁজে পাই না। নিয়ম ও পালা বলে কিছু নেই। কয়েকদিন ধরে দুপুরের দিকে হয়তো জ্বর বাড়তে শুরু করে সন্ধে ৬টা নাগাদ বেশিরকম বাড়ে, তারপর আস্তে আস্তে নেমে আসে। পরের দিন সকালে হয়তো জ্বর নেই। জ্বর যখন বাড়তে থাকে তখন অসহ্য মাথার যন্ত্রণা—পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ক্রমাগত বরফ লাগাবার পর সেই যন্ত্রণার উপশম হয়। জ্বর যখন ছাড়ে তখন দারুণ ঘাম হতে থাকে, সেই সঙ্গে অসম্ভব অবসাদ। তারপরে হঠাৎ এই নিয়ম পাল্টিয়ে যায়। একদিকে দিনরাত যেমন জ্বর ছাড়ার নাম নেই, অন্যদিকে জ্বরও থাকে খুব বেশি। কখনও কখনও লক্ষণ দেখে মনে হয় মারাত্মক ধরনের ম্যালেরিয়া, কখনও মনে হয় আন্ত্রিক জ্বর, আবার কখনও অন্য কিছু।

কিন্তু প্রতিবারই রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা যাবে কিছুই নেই। একদিন যদি জ্বর ১০৪ ডিগ্রিতে উঠল, পরের দিনই হয়তো তা ছেড়ে গেল, সবাই ভাবল আর জ্বর আসবে না। কিন্তু তিন দিনের দিন দেখা যাবে আবার জ্বর উঠছে। জ্বরের খামখেয়ালি সেই সঙ্গে নানা ধরনের লক্ষণের জন্যে ডাক্তাররা ও আর সকলেও কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। আর কেন যে আমার এই অসম্ভব দুর্বলতা ও অবসাদ তা রহস্যই রয়ে গেল। আজও পর্যন্ত আমার মনে হয় না আমি সত্যিই যতটা কাহিল হয়েছি তার অর্ধেকও আমাকে দেখে বোঝা যায়।

গত পাঁচ সপ্তাহ ধরে বা তারও বেশি যদিও বাইরের জগতের সঙ্গে আমার যোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল না, অন্যদিক থেকে কিন্তু সেই যোগ আমি অনেক ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম। যাদের রাজনীতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, যাদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই—দেশের সুদূর প্রান্তের লোকেরা—এমনকী গোঁড়া পণ্ডিতরাও আমার অসুখে আমার জন্য যেরকম উৎকণ্ঠিত ও কাতর হয়েছেন, তা আমি কল্পনা করতে পারিনি—প্রায়ই আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি—'আমরা কোন সূত্রে বাঁধা রয়েছি? ওঁরা সবাই কেন আমার জন্যে ভাবছেন? এত ভালবাসা পাবার মতো কীই বা আমি করেছি?' এইসব প্রশ্নের উত্তর একমাত্র তাঁরাই দিতে পারেন।

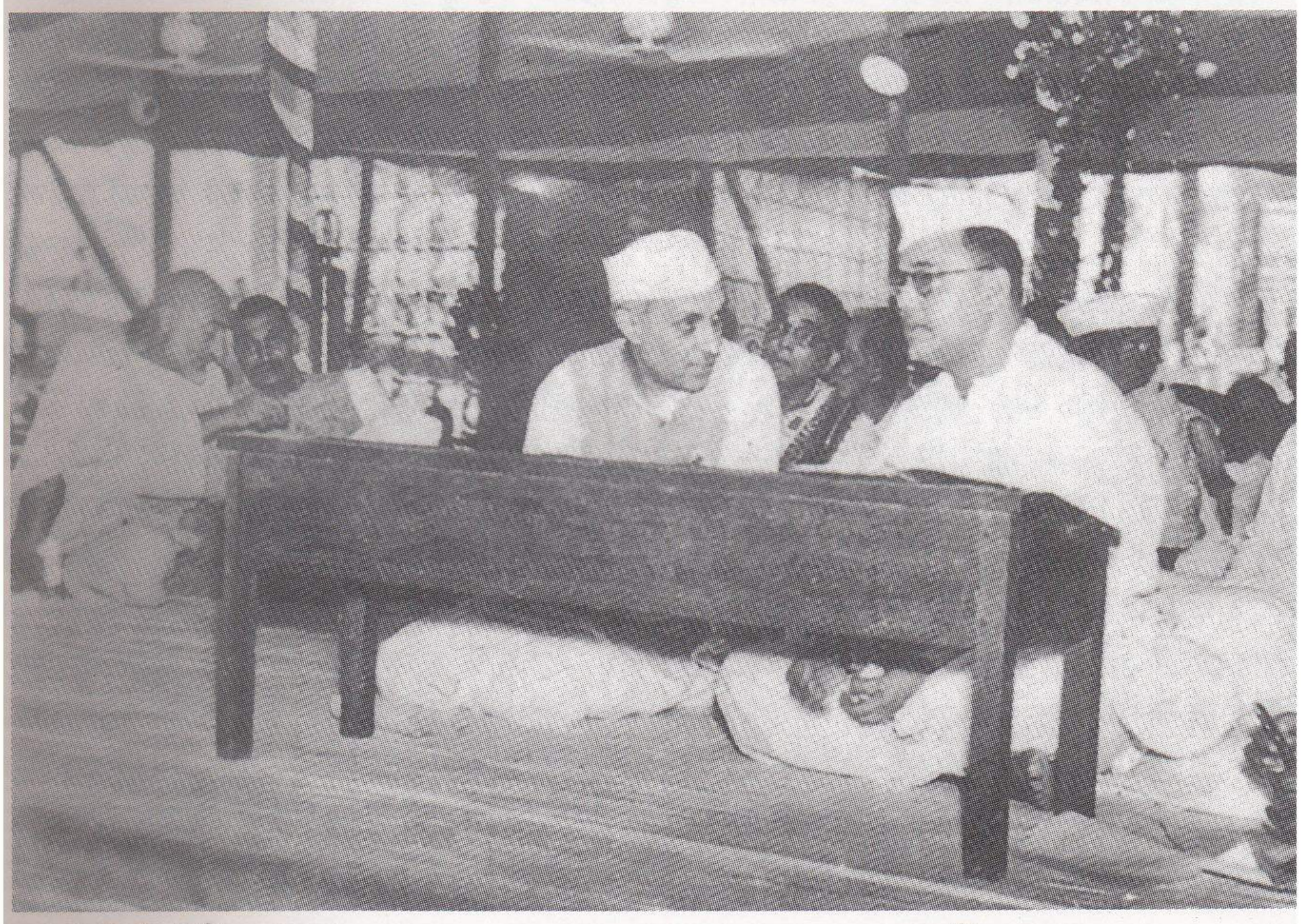
একটি জিনিস আমি জানি। এই সেই ভারতবর্ষ যার জন্যে লোকে পরিশ্রম করে, কষ্টভোগ করে। এই সেই ভারতবর্ষ যার জন্যে জীবন বিসর্জন দেওয়া যায়। এই সেই সত্যকার ভারতবর্ষ যেখানে চিরদিন আস্থা রাখা যায়, ত্রিপুরি যাই বলুক বা করুক না কেন।

জামাডোবা
জিয়ালগোরা পোঃ
জেলা মানভূম।

to take up the task of the leaders of Bengal and ask my countrymen
to make it true.

Let nobody make such a grievous mistake as that, in a fool's pride
of narrow provincialism, I desire to see Bengal as an entity
separate from the rest of India, or dream of setting in my own
province a rival throne to the one on which is seated a majestic
figure representing a new age in the political history of the world.
~~Nothing is so near to my heart as the~~ What I have tried to express is my
wish that Bengal should be every inch

রবীন্দ্রনাথের দেশনায়ক বক্তৃতার প্রতিলিপি



এ আই সি সি মিটিং-এ আবদুল গফ্‌ফর খান, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সুভাষচন্দ্র এবং নেহরু, এপ্রিল ১৯৩৯

কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগের বিবৃতি

১৯৩৯-এর মে মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিংয়ে

বন্ধুগণ,

নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে ত্রিপুরি কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল আপনারা তা অবগত আছেন। সেই প্রস্তাবটি ছিল এইরকম:

"সভাপতি নির্বাচন এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাবলী লইয়া বাদপ্রতিবাদের দরুন কংগ্রেসে এবং দেশের মধ্যে যে নানাপ্রকার ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কংগ্রেসের পক্ষে অবস্থাটি বিশদভাবে বুঝাইয়া তাহার সাধারণ নীতি ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয়।

"বিগত বৎসরগুলিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে মৌলিক নীতি কংগ্রেসের কার্যক্রম পরিচালিত করিয়াছে কংগ্রেস তাহার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে এবং এই সুনিশ্চিত অভিমত পোষণ করিতেছে যে, এইসব মূলনীতি হইতে সরিয়া যাওয়া কখনই উচিত ইহবে না এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কার্যক্রম তাহা দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। এই কংগ্রেস গত বৎসর যে ওয়ার্কিং কমিটি কার্যরত ছিল তাহার কাজে আস্থা প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করা হইয়া থাকিলে দুঃখিত।

"আগামী বৎসর যে সংকটাপন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং এইরূপ সঙ্কটে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই দেশকে ও কংগ্রেসকে জয়লাভের পথে চালিত করিতে পারেন ইহাও স্মরণে রাখিয়া কংগ্রেস আবশ্যিক বলিয়া মনে করে যে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক অঙ্গ তাঁহার আস্থাভাজন হওয়া দরকার এবং সভাপতিকে অনুরোধ জানাইতেছে, তিনি যেন গান্ধীজির ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করেন।"

আমি খুবই দুঃখিত যে ত্রিপুরি কংগ্রেসের পর থেকে নতুন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম আমি ঘোষণা করতে পারিনি। কিন্তু যে অবস্থার দরুন পারিনি তা আমার আয়ত্তাধীন ছিল না। আমার অসুস্থতার দরুন আমি মহাত্মাজির সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারিনি। তার বদলে তাঁর সঙ্গে চিঠিতে কথাবার্তা চালাতে শুরু করি। তার ফলে আমাদের নিজেদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিচ্ছন্ন হয় বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনও মীমাংসা হয় না। যখন আমি বুঝলাম যে চিঠিপত্রে কিছুই ফল হয়নি, আমি তখন দিল্লিতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

মহাত্মাজির কলকাতায় আসার পর আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাতে কোনও সমাধানে পৌঁছনো যায়নি। মহাত্মাজি আমাকে উপদেশ দেন, আগেকার ওয়ার্কিং কমিটি থেকে যে সদস্যরা পদত্যাগ করেছিলেন তাঁদের বাদ দিয়ে নিজে যেন একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করি। কয়েকটি কারণে আমি এই উপদেশ মানতে পারি না। তার মধ্যে দুটি প্রধান কারণ, এইভাবে কাজ করলে পন্থ প্রস্তাবে যে নির্দেশ দেওয়া আছে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। পন্থ প্রস্তাবে বলা আছে গান্ধীজির ইচ্ছানুক্রমে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটিকে তাঁর সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হতে হবে। এ ছাড়াও ভারতে ও ভারতের বাইরে আমাদের সামনে যে সংকট আসছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আমাদের একটি মিশ্র ক্যাবিনেট থাকা দরকার, যে ক্যাবিনেট যত বেশি সংখ্যক সম্ভব কংগ্রেসকর্মীর আস্থাভাজন হবে এবং যাতে কংগ্রেসকর্মীদের সাধারণ সংস্থার গঠন প্রতিফলিত হবে।

যেহেতু মহাত্মাজির উপদেশ অনুযায়ী কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি আমি শুধু এই

অনুরোধই করেছি, ত্রিপুরি কংগ্রেস তাঁর উপর যে দায়িত্বভার দিয়েছে তিনি তা গ্রহণ করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করুন। এবং তাঁকে আমি বলি তিনি যে কমিটিই নিয়োগ করুন না কেন, তা মেনে নিতে আমি বাধ্য থাকব, কারণ পন্থজির প্রস্তাব কার্যকর করাই ছিল আমার সংকল্প।

আমাদের দুর্ভাগ্য, মহাত্মাজি ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন করতে অক্ষম বোধ করেছেন।

শেষ ব্যবস্থা হিসেবে, উল্লিখিত সমস্যার যাতে একটা ঘরোয়া সমাধানে আসা যায় সেইজন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি। মহাত্মাজি আমাকে বলেন আগেকার ওয়ার্কিং কমিটির প্রধান সদস্যদের সঙ্গে আমি একসঙ্গে বসে যেন আলোচনা করে দেখি একটা বোঝাপড়ায় আসা যায় কি না। আমি রাজি হই এবং আমরা সেইমতো প্রয়াসও করি। আমরা যদি একটা মীমাংসায় পৌঁছতে পারতাম তা হলে আমাদের ঘরোয়া মীমাংসাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেবার জন্যে এ.আই.সি.সি-র কাছে হাজির হতাম। দুর্ভাগ্যবশত, যদিও আমরা বিষয়টি আলোচনার জন্যে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছি, আমরা কোনও মীমাংসায় পৌঁছতে পারিনি। অতএব গভীর অনুতাপের সঙ্গে আপনাদের কাছে আমাকে নিবেদন করতে হচ্ছে যে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম আমি ঘোষণা করতে পারলাম না।

এ. আই. সি. সি.-র সামনে আজ যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধানে আমি কি করে সাহায্য করতে পারি সেই কথা আমি গভীরভাবে ভাবছি। আমার মনে হচ্ছে তার যাত্রাপথের এই সন্ধিস্থলে সভাপতি হিসেবে আমার উপস্থিতি সম্ভবত বাধাস্বরূপ হতে পারে— যেমন, এ. আই. সি. সি. এমন একটি ওয়ার্কিং কমিটি নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করতে পারে যেখানে আমি বেমানান হব। আমি আরও মনে করি, এ. আই. সি. সি. যদি একজন নতুন প্রেসিডেন্ট পায় তা হলে তার পক্ষে ব্যাপারটি মীমাংসা করা সম্ভবত আরও সহজ হবে। অতএব গভীরভাবে বিচার-বিবেচনার পর এবং সম্পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আমি আপনাদের কাছে আমার পদত্যাগের আবেদন জানাচ্ছি।

আমার হাতে সময় অত্যন্ত অল্প থাকাতে আমি খুব ছোট একটি বিবৃতি প্রস্তুত করতে পেরেছি। তা সত্ত্বেও আশা করি এই ছোট বিবৃতিটিই এখন পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তা বিশদভাবে বোঝাতে সহায়তা করবে। বন্ধুগণ, এবারে আমি এই সভার কার্যক্রম পরিচালনের জন্যে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করতে আপনাদের অনুরোধ করছি।

নেতাজির পদত্যাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী

অসম্ভব উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে থেকেও তুমি আত্মমর্যাদা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছ। তোমার নেতৃত্বকে আমি অভিনন্দন জানাই, তাতে আমার আস্থা বাড়ল। ত্রুটিহীন এই শালীনতা বাংলাকে তার নিজস্ব আত্মসম্মানের জন্যেই বজায় রাখতে হবে এবং এই উপায়েই তোমার আপাত পরাজয় থেকে স্থায়ী জয়ের সূচনা দেখা দেবে।

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পত্রাবলী

বসু-জিন্না পত্রালাপ
(মে-ডিসেম্বর ১৯৩৮)

জিন্নাকে
১৪ মে ১৯৩৮*

গোপনীয়

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট মিস্টার জিন্নার মধ্যে আলোচনার সময় মিস্টার জিন্না প্রস্তাব করেন যে, যদি কোনও ঐকমত্যে পৌঁছনো যায়, তা পৌঁছতে হবে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের অবস্থা সম্যক উপলব্ধির ভিত্তিতেই। তিনি প্রস্তাব করেন নিম্নলিখিত ধারায় কথাবার্তা চালানো উচিত:

> ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় ও প্রামাণিক সংগঠন হিসাবে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ এবং হিন্দুমতাবলম্বী সুসংহত সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ও প্রামাণিক সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস দুইটি প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য এবং হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের মোকাবিলার জন্য এতদ্বারা নিম্নলিখিত শর্তসমূহ মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছে।

পুনর্বিবেচনার পর কিছুটা ভিন্ন বয়ান তিনি প্রস্তাব করেন, তা এই:

> কংগ্রেস এবং ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রামাণিক সংগঠন অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ একটি চুক্তির মারফত হিন্দুমুসলমান প্রশ্নের মোকাবিলার জন্য নিম্নলিখিত শর্তসমূহ মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংশোধনটি যদিও আরও সংক্ষিপ্ত, এতে যা বলা হয়েছে তা বাহ্যত প্রথমেরই পুনরুক্তি— অর্থাৎ কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং মুসলিম লিগ মুসলমানদের।

কংগ্রেসের পক্ষে একটিমাত্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে নিজেকে ভাবা সম্ভব নয় বা সেইভাবে কাজ করে যাওয়াও সম্ভব নয়, সেই সম্প্রদায় ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যদি হয় তবুও। সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য এর দরজা খুলে রাখতে হবে এবং এর সাধারণ নীতি ও পদ্ধতির প্রতি সমর্থন আছে এমন ভারতীয়মাত্রকে এই প্রতিষ্ঠান স্বাগত জানাবে। একটিমাত্র সম্প্রদায়কে প্রতিনিধিত্ব করার মতো অবস্থা কংগ্রেস মেনে নিতে পারে না। একই কালে অন্যান্য যে সকল সংগঠন সংখ্যালঘু স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে তাদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে এবং সহযোগিতা করতে কংগ্রেস পুরোপুরি আগ্রহী।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, ভারতের মুসলমানেরা সমগ্র দেশের মধ্যে যদিও সংখ্যালঘু, তবুও তারা

---

* কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এই লিপিটি মি. এম. এ. জিন্নাকে দেওয়া হয়েছিল।

জনসংখ্যার অনেকখানি অংশই দখল করে আছে এবং ভারত সম্পর্কিত যে কোনও পরিকল্পনায় তাদের আশাআকাঙ্ক্ষাকে নিশ্চয় বিবেচনা করতে হবে। এ কথাও সত্য যে, অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ এমন একটি সংগঠন যেখানে মুসলমানদের বিরাট অংশের মত প্রতিফলিত। এই দিকটিও গ্রাহ্য করতে হবে। এই কারণেই কংগ্রেস লিগের মনোভাব বোঝাবার চেষ্টা করেছে এবং তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চেয়েছে। অন্যান্য যে সকল মুসলমান সংগঠন অতীতে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছে তাদের সঙ্গে কংগ্রেসকে অবশ্যই পরামর্শ করতে হবে। তা ছাড়া অন্যান্য দল বা সংখ্যালঘুর স্বার্থ জড়িত থাকলে এইসব স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গেও পরামর্শ করার প্রয়োজন হবে।

জিন্নাকে

২৬ মেরিন ড্রাইভ, বোম্বাই
১৫ মে ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার জিন্না,

গত রাত্রে আমাদের বক্তব্যের ব্যাখ্যা সমেত একটি লিপি আপনাকে দিই। আপনি জানতে চেয়েছিলেন গঠনমূলক কী কী প্রস্তাব আমাদের দেবার আছে। আমি মনে করি, লিপিটিতে তার ব্যাখ্যা আছে। আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া কী তা জানবার পর, এখন, আমাদের মতে পরবর্তী পর্যায়ে উপনীত হওয়া বাকি, যথা, নিজ নিজ কমিটি নিয়োগ, যারা মিলিতভাবে নিষ্পত্তির শর্ত নির্ণয় করতে পারবে।

অনুগত
সুভাষ চন্দ্র বসু

জিন্নার পত্র

লিটল গিবস রোড
মালাবার হিল, বোম্বাই
১৬ মে ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার বোস,

কংগ্রেসের পক্ষে আপনি ১৪ মে যে লিপি আমাকে দিয়াছিলেন আমি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। আপনার ১৯৩৮-এর ১৫ মে তারিখের পত্রেরও প্রাপ্তি এতৎসহ স্বীকার করিতেছি। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ও ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় বিষয়টি উপস্থাপিত হইবে এবং সভার সিদ্ধান্ত যথাসম্ভব শীঘ্র আপনাকে জানানো হইবে।

অনুগত
এম. এ. জিন্না

জিন্নার পত্র

৬ জুন ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার বোস,

১৯৩৮ সালের ১৫ মে তারিখের কংগ্রেসের তরফ হইতে যে লিপি আপনি আমাকে দিয়াছিলেন সেই বিষয়ে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত অভিমত কথামতো আমি এতৎসহ পাঠাইতেছি।

বংশবদ
এম. এ. জিন্না

১নং প্রস্তাব

১৯৩৮ সালের ১৪ মে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট মিস্টার জিন্নাকে কংগ্রেসের তরফ হইতে উহার প্রেসিডেন্ট মিস্টার সুভাষচন্দ্র বোস যে লিপি প্রদান করিয়াছেন তাহা, এবং ১৫ই মে তারিখে তাঁহার লিখিত পত্র, অল ইন্ডিয়া মুসলিম মিগের এক্সিকিউটিভ কমিটি বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, মুসলিম লিগ ভরতের মুসলমানদের প্রামাণিক ও প্রতিনিধিস্থনীয় সংগঠন একমাত্র এই ভিত্তিতে ছাড়া কংগ্রেসের সহিত হিন্দু-মুসলিম মীমাংসার প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করা বা কংগ্রেসের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন করা কখনই সম্ভব নয়।

২নং প্রস্তাব

১৯৩৮ সালের ২২ মে তারিখে লিখিত মিস্টার গান্ধীর পত্রও কাউন্সিল বিবেচনা করিয়াছে এবং এই অভিমত পোষণ করে যে, কংগ্রেস কর্তৃক যে কমিটি নিয়োগ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে কোনও মুসলিম তাহার অন্তর্ভুক্ত হউক, ইহা বাঞ্ছনীয় নয়।

৩নং প্রস্তাব

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ইহা স্পষ্টভাবে জানাইতে চায় যে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের ইহা বিঘোষিত নীতি যে, যাহাতে অপরাপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ সৃষ্ট হয় এবং যাহাতে তাহাদের বিশ্বাস অর্জন করা যায় সেইজন্য তাহাদের অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা উচিত এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ প্রয়োজন অনুযায়ী এবম্প্রকার সংখ্যালঘু ও সংশ্লিষ্ট অপর কোনও স্বার্থের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিবে।

জিন্নাকে (তারবার্তা)

১৯৩৮ সালের ২১ জুন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মিস্টার জিন্নাকে নিম্নলিখিত তারবার্তা পাঠানো হয়:

গতকাল ফিরিয়াছি। পত্র পাইলাম। ধন্যবাদ! প্রাপ্তিস্বীকারের বিলম্বে দুঃখিত।

—সুভাষ বসু

জিন্নাকে

৩৮/২ এলগিন রোড, কলকাতা
২৭ জুন ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টর জিন্না,

মুসলিম লিগের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রস্তাব সম্বলিত আপনার ৬ তারিখের পত্র যথাকালে কলকাতায় পৌঁছিয়েছে, কিন্তু যেহেতু আমি বাইরে ছিলাম, ২০ তারিখে ফিরে না আসা পর্যন্ত তা আমার হস্তগত হয়নি। আপনার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করে পরের দিনই আমি তারবার্তা পাঠাই।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আগামী ৯ জুলাই ওয়ার্ধায় মিলিত হবে। আপনার পত্র এবং মুসলিম লিগের প্রস্তাবসমূহ কমিটির কছে উপস্থাপিত হবে এবং আমি তারপর যত শীঘ্র সম্ভব কমিটির সিদ্ধান্ত আপনাকে জানাব। আমি ওয়ার্ধায় গিয়েছিলাম, সেখান থেকে সদ্য ফিরেছি।

অনুগত
সুভাষ চন্দ্র বসু

জিন্নাকে

ওয়ার্ধা
২৫ জুলাই ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার জিন্না,

আপনি ১৯৩৮ সালের ৬ জুনের পত্রের সঙ্গে মুসলিম লিগ কাউন্সিলের যে প্রস্তাবগুলি অনুগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটি যতটা সম্ভব গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা প্রণিধান করেছে। লিগ কাউন্সিলের প্রথম প্রস্তাবে লিগের অধিকার নিরূপিত হয়েছে। যদি তার অর্থ এই হয় যে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন মীমাংসার শর্ত বিবেচনার জন্য আমরা কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বেই কংগ্রেসকে উক্ত প্রস্তাবে বর্ণিত অধিকার স্বীকার করতে হবে, তা হলে তাতে স্পষ্টতই অসুবিধা দেখা দেবে। যদিও প্রস্তাবটিতে "কেবলমাত্র" বিশেষণ ব্যবহার করা হয়নি, প্রস্তাবের ভাষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিশেষণটি উহ্য আছে। ইতিমধ্যেই লিগের একচ্ছত্র অধিকার যাতে স্বীকার না করা হয় সেই মর্মে ওয়ার্কিং কমিটিকে অনেকে সতর্ক করেছে। একাধিক এমন

মুসলিম সংগঠন আছে মুসলিম লিগ থেকে স্বতন্ত্রভাবে যারা কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি কংগ্রেসের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। উপরন্তু এমন অনেক মুসলিম ব্যক্তি আছেন যাঁরা কংগ্রেসি এবং দেশে তাঁদের কারও কারও প্রভাব কম নয়। অতঃপর সীমান্ত প্রদেশের কথা উল্লেখ করতে হয়, সেখানে বিপুলভাবে মুসলিম সংখ্যাধিক্য অথচ তাঁরা পুরোমাত্রায় কংগ্রেস সমর্থক। আপনি বুঝুন, এইসব সুবিদিত তথ্য যখন রয়েছে তখন লিগ কাউন্সিলের প্রথম প্রস্তাব আপাতদৃষ্টিতে কংগ্রেসের নিকট যে স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে, তা কংগ্রেসের পক্ষে প্রদান করা কেবল অসম্ভবই নয়, অযৌক্তিকও বটে। নিবেদন এই যে, কোনও সংগঠনের অধিকার সেই অধিকার নিরূপিত করার ফলেই অর্জিত হয় না। তা আসে সেবা দ্বারা, যে সেবায় কোনও সংগঠন সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছে। অতএব ওয়ার্কিং কমিটি আশা করে যে লিগ কাউন্সিল কংগ্রেসকে অসম্ভব কিছু করতে বলতে হবে না। এ কি যথেষ্ট নয় যে, লিগের সঙ্গে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করতে এবং হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মতো বহুবিতর্কিত প্রশ্নে সম্মানজনক একটি মীমাংসায় উপনীত হতে কংগ্রেস কেবলমাত্র ইচ্ছুক নয়, আগ্রহীও বটে? এই পর্যায়ে কংগ্রেসের দাবি কী, তাও হয়তো বলে রাখা ভাল। যদিও অগণিত কংগ্রেস সদস্যদের তালিকায় সর্বাধিক সংখ্যক নাম যাদের তারা হিন্দু, এ কথা মেনে নিলেও বহুসংখ্যক মুসলিম এবং বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকেরাও কংগ্রেসের সদস্যভুক্ত। যে সকল সম্প্রদায়, জাতি ও শ্রেণির বাসভূমি এই ভারত, তাদের সকলের প্রতিনিধিত্ব করা কংগ্রেসের অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য। সূত্রপাত থেকে এই সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদে প্রায়ই অধিষ্ঠিত থেকেছেন প্রখ্যাত মুসলিমরা এবং তাঁরা কংগ্রেসের ও দেশের বিশ্বাসও অর্জন করেছেন। কংগ্রেস ঐতিহ্যও বলে যে, যদিও কংগ্রেস সদস্য যে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং যাতে তিনি লালিত হন তার থেকে সম্বন্ধচ্যুত হন না, ধর্মবিশ্বাসের বলে কেউ কংগ্রেসের সদস্যভুক্ত হন না। কংগ্রেসের রাজনৈতিক নীতি ও পদ্ধতিকে সমর্থন করেন বলেই তিনি অন্তরে বাহিরে কংগ্রেসি। অতএব কংগ্রেস কোনওভাবেই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নয়। বস্তুতঃপক্ষে কংগ্রেস সর্বদা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করে এসেছে কারণ বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথে তা অন্তরায়।

কিন্তু কংগ্রেস যদিও এই দাবি করে এবং কম-বেশি সাফল্যের সঙ্গে তদনুযায়ী চলতে সচেষ্ট, তবু ওয়ার্কিং কমিটি আনন্দিত হবে যদি আপনার কাউন্সিল কংগ্রেসের সঙ্গে এমন একটা বোঝাপড়ায় আসে যাতে আমরা জাতীয় অখণ্ডতা অর্জন করতে পারি এবং একই ভবিতব্যের জন্য সর্বান্তঃকরণে কাজ করে যেতে পারি।

কাউন্সিলের দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে কুণ্ঠার সঙ্গে আমাকে জানাতে হচ্ছে যে, তাতে যে অভিপ্রায় অভিব্যক্ত তা মেনে নেওয়া ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে সম্ভব নয়।

তৃতীয় প্রস্তাবটি ওয়ার্কিং কমিটি বুঝতে অক্ষম। ওয়ার্কিং কমিটির দিক থেকে মুসলিম লিগ একটি বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িক সংগঠন এই অর্থে যে, তা মুসলিম স্বার্থেরই সেবা করে বলে মনে হয় এবং তার সভ্যপদও কেবলমাত্র মুসলিমদের জন্যই উন্মুক্ত। ওয়ার্কিং কমিটিও বরাবর এইটেই বুঝে আসছে যে, লিগের যা স্বার্থ তাতে লিগ কংগ্রেসের সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসা চায় এবং তা ন্যায্যভাবেই চায়, তাতে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রশ্ন জড়িত নেই। যদি অন্যান্য সংখ্যালঘুদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ থেকে থাকে, কংগ্রেস নিজের দিক থেকে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সর্বদা প্রস্তুত; তার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাতিধর্ম নির্বিশেষে যেহেতু তা সর্বভারতের প্রতিনিধি সেইহেতু তা করা তার অবশ্যপালনীয় কর্তব্য।

আশা করি যা বলা হল তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মীমাংসায় উপনীত হবার জন্য আমাদের আলাপ-আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে।

যেহেতু পূর্ববর্তী পত্রাবলী আগেই প্রকাশ করা হয়েছে, জনসাধারণকে এ বিষয়ে জানানো মনে হয় সুবিবেচনাসম্মত। অতএব আমাদের মধ্যে পরবর্তী যে পত্রবিনিময় হয়েছে তা প্রকাশ করবার প্রস্তাব করছি। আপনি সম্মত হলে, এই পত্রাবলী সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের জন্য পাঠানো যেতে পারে।

অনুগত
এস. সি. বোস

জিন্নার পত্র

মালাবার হিল, বোম্বাই
২ আগস্ট ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার বোস,

আমি আপনার ২৫ জুলাই, ১৯৩৮ তারিখের পত্র অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় উপস্থাপিত করিয়াছি।

আপনার নিকট ইতিপূর্বে প্রেরিত ১নং প্রস্তাবে যে অধিকারের দাবি করা হইয়ছিল তাহা হইতে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলকে নিরস্ত হইতে আপনার পত্রে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন কাউন্সিল তাহা গভীরভাবে প্রণিধান করিয়াছে এবং সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়াছে।

আমাকে ইহা জানাইতে বলা হইয়াছে যে, স্বীকৃতি পাইবার কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া কাউন্সিল তাহার অধিকার নিরূপণ করে নাই, যাহা গৃহীত সত্য কেবলমাত্র তাহাই জ্ঞাপন করিয়াছে।

কাউন্সিল দৃঢ়নিশ্চিত যে মুসলিম লিগ ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রামাণিক ও প্রতিনিধিস্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে যখন কংগ্রেস-লিগ চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন এই অবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং তদবধি ১৯৩৫ সালে জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ আলোচনা চলাকালীনও ইহার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় নাই। অতএব অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের পক্ষে কংগ্রেসের স্বীকৃতি বা অনুমোদন কিছুরই প্রয়োজন নাই, সেইমতো বোম্বাইয়ে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাহারও সেই প্রয়োজন নাই। কিন্তু যেহেতু লিগের অবস্থা— বস্তুতপক্ষে লিগের অস্তিত্ব সম্পর্কে তদানীন্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার এক বিবৃতিতে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, এবং তাহাতে তিনি দৃঢ়তার সহিত এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, দেশে মাত্র দুইটি দল আছে, যথা, ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস, অতএব কীসের উপর ভিত্তি করিয়া এই দুইটি সংগঠনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতে পারে তৎসম্পর্কে কংগ্রেসকে জানানো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিল।

তাহা ছাড়া কংগ্রেস যে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আলোচনা চালাইতে মুসলিম লিগের দ্বারস্থ হইয়াছিল, ইহাতেই লিগের প্রামাণিক ও প্রতিনিধিমূলক চরিত্র স্বীকৃত এবং সেই সূত্রে ভারতের মুসলমানদের পক্ষে লিগের চুক্তিবদ্ধ হইবার অধিকারও স্বীকৃত।

কাউন্সিলের ইহা জানা আছে যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার

গঠিত হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেস সংগঠনেও কিছু কিছু মুসলমান আছে। কিন্তু কাউন্সিলের অভিমত এই যে কংগ্রেসের এই মুসলিমরা ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধি নহে এবং হইতেও পারে না, কেবলমাত্র এই কারণে যে, তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য এবং কংগ্রেসের সদস্যরূপে তাহারা মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে কথা কহিবার বা প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার হারাইয়াছে। ইহা যদি না হইত, কংগ্রেসের জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে আপনার পত্রে যাহা কিছু দাবি করিয়াছেন সবই ভূমিসাৎ হইয়া যাইত।

"অপরাপর মুসলিম সংগঠন" সম্পর্কে, যাহাদের কথা আপনার পত্রে আছে অথচ যাহাদের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই, কাউন্সিল মনে করে তাহাদের সম্পর্কে কোনও উল্লেখ না করাই অধিকতর সমুচিত হইত। ভারতের মুসলমানদের পক্ষে তাহাদের মিলিতভাবে বা এককভাবে কথা কহিবার মতো অবস্থা যদি থাকিত, তাহা হইলে হিন্দু মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং মিস্টার গান্ধী মুসলিম লিগের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেন না।

মুসলিম লিগ সম্পর্কে যতটুকু বলা যায়, ইহার জানা নাই আর কোনও মুসলিম সংগঠন ভারতের মুসলিমদের পক্ষে কথা কহিবার বা আলাপ-আলোচনা চালাইবার দাবি কখনও কহিয়াছে। অতএব ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আপনি এই প্রসঙ্গে "অপরাপর মুসলিম সংগঠনে"র কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

"বহুবিতর্কিত হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে"র একটি মীমাংসায় পৌঁছাইবার জন্য এবং এতদ্বারা একই লক্ষে উপনীত হওয়া ত্বরান্বিত করিবার জন্য কাউন্সিলও সমান আগ্রহী। কিন্তু বেদনার সহিত লক্ষ করা যাইতেছে, মূল বিষয়টিকে অস্পষ্ট করিয়া আলাপ-আলোচনার অগ্রগতিকে প্রতিহত করিবার জন্য সুবিধামতো যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইতেছে।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে কাউন্সিল বিশেষ করিয়া ইহাই জানাইতে চায় যে, কংগ্রেস কর্তৃক যে কমিটি নিযুক্ত হইবার কথা আছে মুসলমানদের তাহার অন্তর্ভুক্ত করা কাউন্সিল বাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচনা করে না। যেহেতু সেই কমিটির সভ্যগণ হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসা ও সমাধানের জন্য মিলিত হইবেন, অতএব সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দিক হইতেই তাঁহারা কি হিন্দু, কি মুসলমান, কাহারও বিশ্বাসভাজন হইবেন না এবং তাঁহাদের অবস্থা হইবে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। অতএব কাউন্সিল উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে প্রশ্নটি বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছে।

তৃতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে, ১৯৩৮-এর ১৫ মে তারিখের আপনার পত্রে যে অধিবেশনের উল্লেখ ছিল ইহা তাহারই স্মারকলিপি। তাহাতে অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উল্লেখ ছিল এবং মুসলিম লিগ তাহার বিঘোষিত নীতি অনুযায়ী আবশ্যক হইলে তাহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল।

এই পত্র সহ পত্রাবলি প্রকাশ করিবার যে অভিপ্রায় আপনি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে কাউন্সিলের কোনও আপত্তি নাই।

অনুগত
এম. এ. জিন্না

জিন্নাকে

৩৮/২ এলগিন রোড, কলিকাতা
১৬ আগস্ট ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার জিন্না,

আপনার ২ আগস্ট, ১৯৩৮-এর পত্রের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। উত্তর দিতে বিলম্বের জন্য আমি দুঃখিত। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী সভায় আপনার পত্রটি পেশ করতে ইচ্ছা করি। তারপরে আপনি আমার কাছ থেকে আবার সংবাদ পাবেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা জানবেন।

অনুগত
সুভাষ চন্দ্র বসু

জিন্নাকে

দিল্লি
২ অক্টোবর ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার জিন্না,

আপনার ২ আগস্ট, ১৯৩৮-এর পত্র ওয়ার্কিং কমিটিতে পেশ করা হয়েছে। যথোচিত বিচার-বিবেচনার পর কমিটি নিম্নলিখিত উত্তর দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

যদিও আপনার পত্রে ভুলত্রুটি আছে, তার উল্লেখে কোনওই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আপনার পত্রের সারমর্ম মনে হয় এই যে, লিগ প্রত্যাশা করে না ভারতের প্রামাণিক মুসলিম সংগঠন হিসাবে তার অধিকার কংগ্রেস পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করে নেবে। যদি লিগ এই অভিমত পোষণ করে, আমাকে তদুত্তরে এই কথা বলতে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, লিগ যে কমিটি নিযুক্ত করবে ওয়ার্কিং কমিটি মীমাংসার শর্তাবলী স্থির করার জন্য তার সঙ্গে আলোচনা করবে। অধিবেশনের সভায় ওয়ার্কিং কমিটির তরফ থেকে কমপক্ষে পাঁচজন সদস্য থাকবে।

যেহেতু পূর্বেকার পত্রাবলী প্রকাশের জন্য আগেই পাঠানো হয়েছে, এই পত্রটিরও প্রকাশের স্বাধীনতা গ্রহণ করছি।

অনুগত
সুভাষ চন্দ্র বসু

জিন্নার পত্র

করাচি
৯ অক্টোবর ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার বোস,

আমি আপনার ২ অক্টোবর তারিখের পত্র পইয়াছি। তাহা লিগের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সমক্ষে পেশ করা হইয়াছিল। উত্তরে আমাকে ইহা বলিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে যে, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল অত্যন্ত দুঃখিত যে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি আমার ২ আগস্টের পত্র সম্পূর্ণভাবে ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছে, অথচ তাহা খুবই স্পষ্ট ছিল এবং তাহা আরও ব্যাখ্যা করিবার বা আরও বিশদ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন ছিল না। আমার উল্লিখিত পত্রে যে ভিত্তি নিরূপিত হইয়াছে সে ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসার উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইতে মুসলিম লিগ এখনও প্রস্তুত এবং আপনার নিকট ইতোপূর্বে প্রেরিত ৫ জুন তারিখের তিনটি প্রস্তাবে আমাদের যে মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহারই ভিত্তিতে কংগ্রেস সে কমিটি নিযুক্ত করিবে তাহার সহিত আলোচনা করিবার জন্য লিগ নিজস্ব প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করিবে।

অনুগত
এম. এ. জিন্না

জিন্নাকে

[১৯৩৮-এর ১১ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনায় মিস্টার জিন্নার ৯ অক্টোবর ১৯৩৮-এর পত্র বিবেচিত হয় এবং কমিটি প্রেসিডেন্টকে মিস্টার জিন্নার নিকট নিম্নলিখিত মর্মে পত্রাদি বিনিময়ের সমাপ্তিসূচক পত্র লেখবার অধিকার প্রদান করে।]

প্রিয় মিস্টার জিন্না,

ওয়ার্কিং কমিটি আপনার ৯ অক্টোবর, ১৯৩৮-এর পত্র বিবেচনা করেছে এবং তাতে যে সিদ্ধান্ত আছে তা পাঠ করে ক্ষুব্ধ হয়েছে। যেহেতু কমিটি আলাপ-আলোচনার ভিত্তি সম্পর্কে মুসলিম লিগ কাউন্সিলের সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভপর বলে মনে করে না এবং যেহেতু কাউন্সিলের মতে ভিত্তি সম্পর্কে ঐকমত্য কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে যে কোনও আলোচনার পূর্বশর্ত, ওয়ার্কিং কমিটি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্য লিগের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে অধিকতর কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্বের দরুন আমি দুঃখিত, তবে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বিষয়টি বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাইনি।

যেহেতু পূর্বেকার পত্রাবলি আগেই প্রকাশিত হয়েছে, এই পত্রিটিও প্রকাশ করার স্বাধীনতা গ্রহণ করছি।

অনুগত
সুভাষ চন্দ্র বসু

বসু-গান্ধী পত্রালাপ
(ডিসেম্বর ১৯৩৮— মে ১৯৩৯)

মহাত্মা গান্ধীকে

২৬, মেরিন ড্রাইভ
বোম্বাই
২১ ডিসেম্বর ১৯৩৮

প্রিয় মহাত্মাজি,

ওয়ার্ধা থেকে শ্রীযুত জি. ডি. বিড়লা যে পত্রখানি নিয়ে এসেছেন সেটি পড়ে আমি অতিশয় বিস্মিত ও আহত হয়েছি। আমার মনে আছে, বঙ্গদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আপনার সঙ্গে বহুবার আমি আলোচনা করেছি। কয়েকদিন আগে আবার ওয়ার্ধাতে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। আমার ভ্রাতা শরৎও আপনার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের দু'জনেরই স্পষ্ট ধারণা বঙ্গদেশে জোট সরকার গঠনের বিষয়ে আপনি প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে একমত। আমি জানি না আমার ওয়ার্ধা ত্যাগের পরে এমনকী হয়েছে যার জন্যে আপনি মত পরিবর্তন করে লিখেছেন, "এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি এখন তাঁর লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়," ইত্যাদি। সংবাদপত্রে দেখছি আমার ওয়ার্ধা ত্যাগের পরে শ্রীযুত এন. আর. সরকার শ্রীযুত জি. ডি. বিড়লা এবং মৌলানা আজাদ সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করেছেন, স্পষ্টতঃই, তাদের সঙ্গে কথা বলার পরে আপনি মত বদলেছেন। তা হলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, বঙ্গদেশে যাঁরা কংগ্রেস সংগঠনের পরিচালনার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত তাঁদের মতামতের চেয়ে ওই তিন ভদ্রলোকের মতামতকে আপনি বেশি মূল্য ও গুরুত্ব দেন।

হালকাভাবে কিছু লেখা আপনার অভ্যাস নয়। সেই কারণে আপনার সুবিবেচিত মতামতকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। আপনার পত্রের ফলে একটি সংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং এই সংকটের মধ্যে আমার উচিত অকপটে নিজের বক্তব্য— প্রকাশ করা। সেজন্যে আগেই আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আমি সোজাসুজি মূল কথায় যাই। বিতর্কিত বিষয়টি সম্পর্কে মৌলানা সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে আমার মৌলিক পার্থক্য আছে। পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় আসামে মন্ত্রিত্ব নিয়ে সংকট যখন আমাদের সামনে এসে পড়ে। সম্ভবত এখন আমি দাবি করতে পারি যে, আমার কোনও ভুল হয়নি, মৌলানা সাহেবই ভুল করেছিলেন। তবে, সর্দার প্যাটেল যদি সৌভাগ্যক্রমে আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে না আসতেন, মৌলানা সাহেব শিলং-এ কখনওই নিজের ভুল স্বীকার করতেন না এবং সম্ভবত আপনিও দিল্লিতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের সময় মৌলানা সাহেবের মতের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্যের সমর্থন করতেন না। সে ক্ষেত্রে আসামে জোট মন্ত্রিসভা স্থাপিত হত না।

সিন্ধু প্রদেশের বিষয়ে এক দিকে মৌলানা সাহেব এবং আরেক দিকে ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যের (তার মধ্যে আমি একজন) মধ্যে মত-বিরোধ ছিল। এখন আবার বঙ্গদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের মতামত পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী।

মনে হচ্ছে মৌলানা সাহেবের মতে বঙ্গদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাধিক্যের প্রদেশে সাম্প্রদায়িক মুসলিম মন্ত্রিসভাকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে দেওয়া উচিত। হক মন্ত্রিসভা এবং সিকান্দার হায়াৎ মন্ত্রিসভাকে কাজ চালিয়ে যেতে দেওয়া কর্তব্য। স্পষ্টত সিন্ধুতে আমাদের আল্লাহ বক্স মন্ত্রিসভাকে সমর্থনে তিনি অসন্তুষ্ট।

পক্ষান্তরে আমি মনে করি জাতীয় স্বার্থে হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো আমাদের অবশ্য কর্তব্য এই প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভা যত বেশি দিন বহাল থাকবে, বঙ্গদেশের আবহাওয়া তত সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠবে, কংগ্রেস তত দুর্বল হবে মুসলিম লিগের তুলনায়। একই যুক্তি সিকান্দার হায়াৎ মন্ত্রিসভা সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

এতদিন পরে, নভেম্বরের প্রথম দিকে শ্রীযুত নলিনী সরকার বুঝতে পেরেছেন যে, হক মন্ত্রিসভা থেকে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। শেষবারের মতো, ৯ ডিসেম্বর আমি কলকাতা থেকে ওয়ার্ধা রওনা হওয়ার আগে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেন যে আগামী বাজেট অধিবেশনের আগে তিনি পদত্যাগ করবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে কী কারণে তাঁকে সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসতে হল আমি জানি না। আপনার প্রভাব কাজে লাগানো হবে, নলিনীবাবুকে পদত্যাগে রাজি করানোর জন্যে নয়, যখন হক মন্ত্রিসভা থেকে তাঁর পদত্যাগ তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরা চাইছেন, তখন যাতে তিনি মন্ত্রিপদে বহাল থাকেন সেইজন্যে এই রকম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আপনি যে আমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করাও প্রয়োজন মনে করলেন না, তাতে আমি বিস্মিত।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে শুধু দুটি রাস্তা খোলা আছে। আপনি যদি এখনও মনে করেন আপনার চিঠিতে আপনি যে-সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন, সেটিই সঠিক এবং সেই সিদ্ধান্তই মেনে চলা উচিত, আমাকে আমার অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে হবে। স্পষ্টত যে নীতি আমি মনে করি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আমি তার জন্যে কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি না।

অন্যথায় বঙ্গদেশে যাঁরা কংগ্রেস সংগঠনের দায়িত্বে আছেন তাঁদের প্রতি আরও সুবিবেচনা প্রদর্শন করা উচিত এবং তাঁরা যে কাজ করছেন অন্য যারা সুযোগ পেলেই প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের অগ্রাহ্য করে আনন্দ পান, তাঁদের উচিত নয় সে কাজের ক্ষতি সাধন করা।

আমার সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন কেন আমি বঙ্গদেশের মতো প্রদেশে জোট মন্ত্রিসভা কাম্য বলে মনে করি। আপনার স্মরণ থাকতে পারে সেবাগ্রামে আমি আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলছিলাম। আমার বক্তব্য আমি আবার বলছি।

আজকের যা পরিস্থিতি, তাতে সিন্ধু, বঙ্গদেশ ও পঞ্জাবে জোট মন্ত্রিসভার রাজনীতি কার্যকর। এই পরিবর্তন যদি সম্ভব হয় (আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হচ্ছে সম্ভব হবে) কংগ্রেস এগারোটি প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে পারবে, তার অর্থ এই হবে যে হিন্দু-মুসলিম মীমাংসা ছাড়াই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে কথাবার্তা এবং কাজকর্মে কংগ্রেস ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদের স্বীকৃত প্রতিনিধির মর্যাদা লাভ করবে। মুসলিম লিগের সঙ্গে কোনও মীমাংসা না হওয়ার কারণে সমাজের কোনও গুরুতর অসুবিধা হবে না।

অবশিষ্ট তিনটি প্রদেশে জোট-মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে যখন আমরা চেষ্টা করব, কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের মধ্যে আলাপ আলোচনা হলে যে সব হিন্দু-মুসলিম সমস্যা উত্থাপিত হত, সেগুলির বিষয়েও আমাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে আমরা বিলম্ব করব না। একই সঙ্গে বিভিন্ন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিবিধ অভিযোগের বিষয়েও আমরা অনুসন্ধান করব। এই দুটি পদক্ষেপের ফলে যুক্তিবোধসম্পন্ন মুসলিমদের বোঝানো সহজ হবে যে আমরা তাদের অভাব-অভিযোগ বুঝতে এবং মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব তার প্রতিকার করতে আগ্রহী।

ত্রিপুরি কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের আগে আমাদের উপরোক্ত কার্যসূচি যদি সম্পন্ন করি, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের জাতীয় দাবি (পূর্ণ স্বরাজ) আমরা পেশ করতে পারব এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট উত্তর দাবি করতে পারব। তীব্র আন্তর্জাতিক উত্তেজনার পশ্চাদপটের কারণে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমাদের দাবি হেলায় অগ্রাহ্য করতে পারবে না। আর যদি তারা অগ্রাহ্যই করে, কিংবা আমাদেরকে অসন্তোষজনক উত্তর দেয়, উপযুক্ত নোটিশ দিয়ে

আমাদের উচিত হবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করা। যত দূর মনে হচ্ছে, বর্তমান আন্তর্জাতিক উত্তেজনা আরও ১২-১৩ মাস চলবে, এ রকম সংকটের সময়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতে বড় সংগ্রাম চলতে দিতে পারে না। তারা যদি ইউরোপে নিজেদের হীনবল করতে না চায় ভারতে তাদের শান্তি বহাল রাখতেই হবে। অতএব ১৯৩৯ সালে বৃহৎ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অনিবার্য ফল হবে কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মধ্যে শান্তি বৈঠক, যার ফলে আসবে আমাদের জয়।

এতক্ষণ যে পরিকল্পনার কথা বললাম, তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে অবশিষ্ট তিন প্রদেশের জোট সরকারকে। ব্যক্তিগতভাবে আমার এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে বঙ্গদেশ ও পঞ্জাবে যদি জোট সরকার থাকে এবং দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ হয়, কংগ্রেসের মুখোমুখি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অতিশয় হীনবল হয়ে পড়বে। আমরা সবাই জানি এখন তাদের ভরসা ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গদেশ ও পঞ্জাবের সমর্থন এবং দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের সমর্থন। ১৯৩৯-এর সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হয়ে অতিশয় অনুকূল পরিস্থিতিতে দেশের ভিতরের এবং বাইরের দু'দিক থেকেই।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্যে আমি অবশিষ্ট তিনটি প্রদেশে জোট সরকারকে বেশি মূল্যবান মনে করি কিন্তু ওসব কারণের কথা বাদ দিলেও, আমার বিবেচনায়, জোট সরকার বাঞ্ছনীয়।

আরও বলি, ওয়ার্কিং কমিটির এক বা একাধিক সদস্যকে যদি এখন দায়িত্ব দেওয়া হয়, ত্রিপুরিতে কংগ্রেস অধিবেশনের আগে আমাদের আরও তিনটি জোট মন্ত্রিসভা হতে পারে। ওয়ার্কিং কমিটির যোগ্যতর সদস্যেরা যদি এগিয়ে আসতে না চান, সে-দায়িত্ব নিতে আমি প্রস্তুত।

পরিশেষে, আমি বলতে পারি, এ বিষয়ে আমার মনোভাব এত প্রবল যে এর অন্যথা করে কোনও নীতি গৃহীত হলে আমার মনে হয়, সেটা আত্মহত্যার সামিল হবে। আমি আশা করি, বিষয়টি পুনির্বিবেচনা করে উপরোক্ত নীতি আমাদের অনুসরণ করে চলতে দেওয়া এবং আমাদেরকে আশীর্বাদ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে আপনার চিঠিতে ব্যক্ত সিদ্ধান্তে যদি আপনি অনড় থাকেন আমি অনুরোধ করছি আমার বর্তমান দায়িত্ব থেকে অবিলম্বে আমাকে অব্যাহতি দিন, কেননা যে নীতি জাতীয় স্বার্থের হানিকর বলে আমি মনে করি তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে আমি অক্ষম।

১৯ তারিখে আমার মাদ্রাজ রওনা হবার কথা ছিল। কিন্তু গলার অসুখের জন্যে আমার ২-৩ দিন দেরি গেল।

প্রণাম নেবেন।

আপনার
সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা)

জিয়ালগোরা, ২৪ মার্চ ১৯৩৯। মহাত্মা গান্ধী— বিড়লাভবন, নতুন দিল্লি।

কংগ্রেসের কাজ সম্পর্কে শরতের নিকট আপনার প্রস্তাব স্মরণে রাখিয়া এবং খুব শীঘ্র আপনার সহিত আমার সাক্ষাতের সম্ভাবনা না থাকায় পত্রযোগে আপনার সহিত আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। আমি লিখিতেছি।

—সুভাষ

বসুকে (তারবার্তা)

নূতন দিল্লি, ২৫ মার্চ ১৯৩৯। সভাপতি বোস— জিয়ালগোরা

তোমার তারবার্তা। মৌলানা আজাদ আমার সহিত আলাপ করিতে ব্যগ্র হওয়ায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গতকাল আমি এলাহাবাদ যাই এবং ট্রেনে যাইবার সময় একটি পত্র দিই। তোমার পত্র প্রত্যাশিত। আশা করি স্বাস্থ্যোন্নতি অব্যাহত আছে। ভালবাসা।

—বাপু

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা)

জিয়ালগোরা, ২৫ মার্চ ১৯৩৯। মহাত্মা গান্ধী— বিড়লাভবন, নূতন দিল্লি।

আপনার অদ্যকার তারবার্তা। আপনার পত্র না পাওয়া অবধি আমি আমার পত্র পাঠাইলাম না।

—সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা)

জিয়ালগোরা, ২৫ মার্চ ১৯৩৯। মহাত্মা গান্ধী— নূতন দিল্লি।

আপনার পত্র পাইলাম না। অতএব আমারটি পাঠাইতেছি।

-সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীকে

জিয়ালগোরা
২৫ মার্চ ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজি,

কংগ্রেসের কার্যকলাপে অচলাবস্থা সৃষ্টি করছি বলে যাঁরা আমাকে দোষারোপ করছেন তাঁদের জবাবে আজ (শনিবার, ১৫ মার্চ) যে বিবৃতি দিয়েছি আশা করি আপনি তা দেখেছেন। আপাতত আমাদের জরুরি সমস্যা নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন। এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করতে হলে, তার আগে আরও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ কিছু সমস্যা বিবেচনা করা প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও আগের সমস্যাটি নিয়েই আমি প্রথমে আলোচনা করব।

এই সমস্যা সম্পর্কে আপনি যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর আপনার মতামত অনুগ্রহ করে আমাকে জানান, আমি কৃতজ্ঞ থাকব :

(১) ওয়ার্কিং কমিটির গঠন সম্পর্কে বর্তমানে আপনার ধারণা কী? এতে কি সমমতাবলম্বীরাই থাকবে, না, এতে কংগ্রেসের ভিতরকার বিভিন্ন দল বা পার্টির লোক থাকা উচিত, যাতে কমিটি মোটামুটিভাবে যতখানি সম্ভব সংস্থার সাধারণ গঠনের অনুরূপ হতে পারে?

(২) আপনি যদি এই অভিমত এখনও পোষণ করেন যে কমিটি সমমতাবলম্বী হবে, তা হলে স্পষ্টতই একদিকে আমার মতো লোকেরা এবং অপরদিকে সর্দার প্যাটেল ও অন্যেরা একই কমিটিতে থাকতে পারেন না। (এইখানে আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, ওয়ার্কিং কমিটিকে সমমতাবলম্বী হতেই হবে, বরাবর আমি এই ধারণার বিরোধিতা করে আসছি)।

(৩) আপনি যদি মেনে নেন ওয়ার্কিং কমিটিতে বিভিন্ন দল ও পার্টির লোকদের থাকা উচিত, তারা সংখ্যায় কতজন করে থাকবে? আমার মতে কংগ্রেসের মধ্যে দুটি প্রধান পার্টি বা গোষ্ঠী আছে। খুব সম্ভব তারা কম বেশি সমান সমান। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আমরা ছিলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ। ত্রিপুরিতে হল অন্যরকম, তবে তা হয়েছিল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মনোভাবের দরুণ। সি এস পি যদি নিরপেক্ষ না থাকত, তা হলে নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও (পরবর্তী চিঠিতে অথবা আপনার সঙ্গে দেখা হলে আমি তার উল্লেখ করব।) উন্মুক্ত অধিবেশনে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারতাম।

(৪) আমি যদি সাতজন সদস্যের নাম প্রস্তাব করি এবং আপনি যদি সর্দারকে সাতজনের নাম প্রস্তাব করতে বলেন, তা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হবে বলে আমার মনে হয়।

(৫) অধিকন্তু, আমাকে যদি প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকতে হয় এবং ঠিকভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হয় তা হলে আমার পছন্দমতো কোনও একজনের সাধারণ সম্পাদক হওয়া দরকার।

(৬) কোষাধ্যক্ষের নাম সর্দার প্যাটেল প্রস্তাব করতে পারেন।

এবার আমি পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবে প্রধান প্রধান যে দুটি বিষয় জড়িত আছে তার একটির কথা উল্লেখ করব। (পৃথক চিঠিতে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে লিখে জানাব।) প্রথমত, আপনি কি এটিকে আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব বলে মনে করেন এবং আপনি কি চান, এর

ফলে আমার পদত্যাগ করা উচিত? আমি এই প্রশ্ন করছি, তার কারণ, এই প্রস্তাবের কয়েকপ্রকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এমনকী যাঁরা প্রস্তাবটির সমর্থক তাঁরাও তা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর প্রেসিডেন্টের অবস্থা ঠিক কী দাঁড়াচ্ছে। কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের ১৫ নং ধারায় ওয়ার্কিং কমিটি নিয়োগ করা বিষয়ে প্রেসিডেন্টের উপর কিছু ক্ষমতা অর্পণ করা আছে এবং গঠনতন্ত্রের সেই ধারা আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে। একই সঙ্গে পণ্ডিত পন্থর প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ওয়ার্কিং কমিটি আপনার ইচ্ছানুযায়ী গঠিত হবে। তা হলে মোট ফল কী দাঁড়াচ্ছে? আমাকে কি আদৌ গণ্য করা হচ্ছে? আপনি কি আপনার নিজের মনোমতো ও ইচ্ছামতো ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করবেন এবং আমি কেবলমাত্র আপনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করব? তার ফল হবে কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের ১৫ নং ধারাকে সংশোধন না করে অকার্যকর করা।

এই প্রসঙ্গে আমি না বলে পারছি না যে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের উক্ত প্রকরণটি স্পষ্টতই গঠনতন্ত্রবিরোধী এবং বিধিবহির্ভূত। আসলে পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবটাই নিয়মসম্মত ছিল না, কারণ অনেক বিলম্বে তা পাওয়া গিয়েছিল। পণ্ডিত পন্থের সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি অনিয়মিত বলে অগ্রাহ্য করবার অধিকার আমার ছিল, ঠিক যেমন কংগ্রেসের উন্মুক্ত অধিবেশনে মৌলানা আজাদের অধিকার ছিল জাতীয় দাবির প্রস্তাবের উপর শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর সংশোধনটি অনিয়মিত বলে অগ্রাহ্য করবার। অধিকন্তু পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবটি গ্রহণ করার পরও বিশুদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক দিক থেকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কিত শেষ প্রকরণটিকে অনিয়মিত বলে আমার অগ্রাহ্য করা উচিত ছিল, যেহেতু তা গঠনতান্ত্রিক বলে কেতা বা নিয়মপালনের খুঁটিনাটি ত্রুটির উপরে আমি গুরুত্ব আরোপ করি না। অধিকন্তু, যে সময় আমি বুঝেছিলাম বিরুদ্ধ ভোটের সম্ভাবনা রয়েছে তখন গঠনতন্ত্রের আড়ালে আশ্রয় নেওয়া কাপুরুষোচিত হবে বলে আমি বোধ করেছিলাম।

এই চিঠি শেষ করবার আগে আরেকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করব। সব কিছু বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমাকে যদি প্রেসিডেন্টরূপে বহাল থাকতে হয়, তা হলে আপনি আমাকে কীভাবে চলতে বলেন? আমার মনে আছে, গত এক বছর মাঝে মাঝে (হয়তো বা প্রায়ই) আপনি আমাকে বলেছেন, পুতুল প্রেসিডেন্ট হয়ে থাকি আপনি তা চান না এবং আপনি চান আমি আমার নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠিত করি। ১৫ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধায় যখন আমি দেখলাম আপনি আমার কার্যক্রমে সম্মত নন, তখন আমি আপনাকে বলেছিলাম, আমার সম্মুখে দুটো পথ খোলা আছে— হয় নিজেকে মুছে ফেলা, নয়তো, আমার যা আন্তরিক বিশ্বাস তাতে অটল থাকা। যদি আমার সঠিক স্মরণে থাকে, আপনি তখন জবাবে আমাকে বলেছিলেন, স্বেচ্ছায় আমি আপনার মত যদি মেনে নিতে না পারি, তা হলে নিজেকে মুছে ফেলা মানে দাঁড়াবে নিজেকে দমন করা এবং নিজেকে দমন আপনি অনুমোদন করতে পারেননি। আমাকে যদি প্রেসিডেন্ট হয়ে থাকতে হয় তা হলে গত বছর আমাকে আপনি যেরকম উপদেশ দিয়েছিলেন আপনি কি এখনও সেইরকমই বলবেন, পুতুল প্রেসিডেন্ট হয়ে আমি যেন না থাকি?

যা কিছু বললাম তাতে আমি ধরে নিয়েছি, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর থেকে, বিশেষ করে ত্রিপুরি কংগ্রেসে যা কিছু ঘটেছে সব সত্ত্বেও কংগ্রেসের ভিতরকার সব দল ও পার্টির মিলিতভাবে কাজ করা সম্ভবপর।

আমার পরের চিঠিতে সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করব। আজ সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়েছি তাতে ওইগুলির কয়েকটি উল্লেখ করেছি।

আমার স্বাস্থ্যোন্নতি অব্যাহত আছে তবে খুবই ধীরে ধীরে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার পথে প্রধান অন্তরায় মনে হয় যথেষ্ট নিদ্রার অভাব।

আপনার কাজের গুরুভার সত্ত্বেও আশা করি আপনার শারীরিক উন্নতি হচ্ছে। প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ,
সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীর পত্র

ট্রেনে
(বিড়লা ভবন, নূতন দিল্লি)
২৪ মার্চ ১৯৩৯

প্রিয় সুভাষ,

আমি নিশ্চিত আশা করি এই পত্র যখন তোমার হস্তগত হইবে সম্পূর্ণ আরোগ্যের পথে তখন তুমি অগ্রসর হইতেছ।

ইহার সহিত আমাকে লেখা শরতের পত্রের একটি নকল এবং আমার উত্তর পাঠাইলাম। ইহাতে যদি তোমার মনোভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে একমাত্র তখনই আমার প্রস্তাবগুলি প্রযোজ্য। যাহাই হউক না কেন কেন্দ্রের অরাজকতার অবসান দরকার। তোমার অনুরোধমতো আমি একেবারে মুখ বন্ধ করিয়া আছি যদিও সংকট সম্পর্কে আমার মতামত দিবার জন্য আমার উপর চাপ দেওয়া হইতেছে।

প্রস্তাবটি সর্বপ্রথম আমি এলাহাবাদে দেখি। ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট বলিয়া আমার মনে হয়। প্রাথমিক প্রয়াস তোমাকেই করিতে হইবে। জাতীয় কাজের দায় বহন করিতে কতখানি তুমি সমর্থ হইয়াছ আমার জানা নাই। যদি না হও, আমার মনে হয় যে— একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পন্থা তোমার নিকট খোলা আছে তাহাই গ্রহণ করা উচিত হইবে।

আমাকে এখনও আরও কয়েকদিন দিল্লিতে থাকিতে হইবে।

ভালবাসা জানিও।

বাপু।

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা)

জিয়ালগোরা
২৬ মার্চ ১৯৩৯

আপনার পত্র প্রতীক্ষিত। আমার বিবৃতি মতো আমাদের সাক্ষাৎ বাঞ্ছনীয়।

—সুভাষ

বসুকে (তারবার্তা)

২৬ মার্চ ১৯৩৯

রাজকোটের ব্যাপার আমাকে দিল্লিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে অন্যথা দুর্বলতা সত্ত্বেও তোমার নিকট ছুটিয়া যাইতাম। তোমাকে বলিতেছি এখানে আসিয়া আমার সহিত থাক। তোমাকে সেবা করিয়া সুস্থ করিয়া তুলিবার ভার লইতেছি, তাহারই ফাঁকে ধীরগতিতে আমাদের আলোচনা চলিবে। ভালবাসাসহ।

—বাপু

মহাত্মা গান্ধীকে

জিয়ালগোরা
২৯ মার্চ ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজি,

দু-একদিনের মধ্যে আমি আপনাকে আবার লিখব; ইতিমধ্যে একটি জরুরি ব্যাপার দেখা দিয়েছে। এ. আই. সি. সি'র কর্মরত সাধারণ সম্পাদক শ্রীনরসিং লিখে জানিয়েছেন যে, এ. আই. সি. সি.'র মিটিং-এর জন্য তিনি ২০ দিনের নোটিশ চান।

নিয়ম অনুযায়ী এ. আই. সি. সি.'র সদস্যদের ১৫ দিনের নোটিশ দিতেই হবে। তার পরেও, তাঁর মতে, আরও ৪।৫ দিন দরকার যাতে দেশের দূরতম প্রান্তে নোটিশ পৌঁছতে পারে। ফলত আমাদের মোট ২০ দিনের সময় চাই।

আমার মনে হয় ২০ এপ্রিল নাগাদ একটি তারিখ সুবিধাজনক হবে, অবশ্য আপনার অনুমোদন সাপেক্ষ। কিন্তু তাতে একটু মুশকিল আছে। আমি জানতে পারলাম ২০ এপ্রিল নাগাদ বিহারে গান্ধী সেবা সংঘের সম্মেলন বসবে। তাতে দুটি মিটিং একই সময়ে পড়ে যাচ্ছে। এ. আই. সি. সি.'র, সেই সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকও কলকাতায় হবে। সেই সময় সেখানে আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। আমি কি প্রস্তাব করতে পারি, গান্ধী সেবা সংঘের সম্মেলনের আগে বা পরে এ. আই. সি. সি.'র বৈঠক বসুক। আগে হলে আপনি প্রথমে কলকাতায় এসে পরে বিহার যাত্রা করতে পারেন। পরে হলে আপনি প্রথমে বিহারে গিয়ে পরে কলকাতায় আসতে পারেন। প্রথম ক্ষেত্রে সঙ্ঘের সম্মেলন এক সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ. আই. সি. সি.'র বৈঠক এপ্রিলের শেষের দিকে ধার্য করতে হবে।

বিষয়টি বিবেচনা করে এ. আই. সি. সি.'র বৈঠক কখন বসানো উচিত হবে সেই বিষয়ে দয়া করে আমাকে উপদেশ দেবেন। শেষ কথা, এ. আই. সি. সি. বৈঠকের সময় আপনাকে আমরা একান্তভাবে চাই।

আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। আপনার ব্লাডপ্রেসার আবার বৃদ্ধি পেয়েছে শুনে উদ্বেগে আছি। আমার আশঙ্কা হয়, আপনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করছেন।

প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীকে

জিয়ালগোরা
২৯ মার্চ ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজি,

আমি আপনার ২৪ তারিখে ট্রেন থেকে লেখা চিঠি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পেয়েছি।

প্রথমত, আমার দাদা শরৎ নিজে থেকেই আপনাকে লিখেছিলেন। আপনি তাঁর চিঠি থেকে দেখতে পাবেন, তিনি এখান থেকে কলকাতায় পৌঁছেই আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছেন এবং তারপরে আপনাকে লিখেছেন। যদি তিনি আপনার টেলিগ্রাম না পেতেন তিনি লিখতেন কিনা সন্দেহ।

তাঁর চিঠিতে অবশ্য কিছু কথা আছে যা আমারও মনের কথা। কিন্তু সেকথা অন্য। আমার কাছে আসল সমস্যা এই যে, উভয় পক্ষ অতীতের কথা ভুলে গিয়ে একত্রে কাজ করতে পারবে কিনা, তা সম্পূর্ণভাবে আপনার উপর নির্ভর করে। যথার্থ অপক্ষপাত মনোভাবের দ্বারা আপনি যদি উভয়পক্ষের আস্থাভাজন হতে পারেন, তা হলে আপনি কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে তুলতে এবং জাতীয় একতা ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

প্রতিহিংসাপরায়ণতা আমার ধাতে নেই এবং আমি অভিযোগ পুষে রাখি না। কতকটা বলা যায় আমার মানসিকতা বক্সিং খেলোয়াড়ের মতো— অর্থাৎ বক্সিং খেলা শেষে হাসিমুখে করমর্দন করা এবং খেলার মনোভাব নিয়ে খেলার ফল মেনে নেওয়া।

দ্বিতীয়ত, আমি অনেক আবেদন পাচ্ছি, তা সত্ত্বেও পন্থ প্রস্তাব যে রূপে কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছে আমি তাই স্বীকার করে নিচ্ছি। একেই আমাদের কার্যকর করতে হবে। বিধিবহির্ভূত অংশটি থাকা সত্ত্বেও প্রস্তাবটি যাতে উত্থাপিত ও আলোচিত হয় তার জন্য আমি নিজেই অনুমতি দিই। আমার পক্ষে এখন তা কীভাবে অগ্রাহ্য করা সম্ভব?

তৃতীয়ত, আপনার সম্মুখে এখন দুটি উপায় খোলা আছে (১) নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে আমাদের অভিমতকে গ্রহণ করা, অথবা (২) সম্পূর্ণভাবে আপনার অভিমতে চালিত হওয়া। শেষোক্ত ক্ষেত্রে, আমাদের পক্ষে একসঙ্গে চলা সম্ভব নাও হতে পারে।

চতুর্থত, আমার সাধ্যমতো যতদূর তাড়াতাড়ি নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন এবং ওয়ার্কিং কমিটি ও এ. আই. সি. সি.'কে তলব করা সম্ভব আমি তা করতে প্রস্তুত। কিন্তু এখন আমার পক্ষে দিল্লি যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত (ডাক্তার সুনীল[১] আজ সকালে আপনাকে এই বিষয়ে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন)। মাত্র গতকাল আমি আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছি।

পঞ্চমত, আপনার চিঠিতে জেনে অবাক হলাম যে, এ. আই. সি. সি. আপিস আপনাকে পন্থ প্রস্তাবের একটি নকল পাঠায়নি। (পরে পাঠানো হয়েছে।) আপনি এলাহাবাদে আসার আগে পর্যন্ত প্রস্তাবটি আপনার নজরে আনা হয়নি জেনে আমি আরও বেশি অবাক হয়েছি। অথচ ত্রিপুরিতে দারুণ গুজব রটেছিল যে প্রস্তাবটিতে আপনার পূর্ণ সমর্থন আছে। আমরা যখন ত্রিপুরিতে ছিলাম সেই সময়ে ওই মর্মে একটি বিবৃতি দৈনিক সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল।

ষষ্ঠত, আমার আসন দখল করে থাকার বিন্দুমাত্র অভিলাষ নেই। কিন্তু আমি অসুস্থ বলে আমার পদত্যাগ করা দরকার, এই যুক্তি আমি বুঝতে পারছি না। যেমন, কোনও প্রেসিডেন্টই জেলে থাকাকালে পদত্যাগ করেননি। আপনাকে জানাতে চাই যে, পদত্যাগ করবার জন্য

---

১. ডা. সুনীলচন্দ্র বসু

আমার উপর দারুণ চাপ দেওয়া হচ্ছে। আমি তা প্রতিরোধ করছি যেহেতু আমার পদত্যাগে কংগ্রেস রাজনীতিতে এক নূতন পর্বের সূচনা হবে এবং আমি শেষ পর্যন্ত তা পরিহার করতে চাই।

গত কয়েকদিন আমি এ. আই. সি. সি.'র জরুরি কাজকর্ম দেখছি।

আগামীকাল কিংবা পরশু আবার আপনাকে লিখব। আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। আশা করি আপনার রক্তচাপ শীঘ্র কমে আসবে। প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

পুনশ্চ: এই চিঠি আপনার চিঠির ঠিক উত্তর নয়। আমার মনে যেসব কথা জেগেছিল আমি তাই শুধু টুকে রেখেছি। আপনাকে তা জানাতে চাই বলে লিখে পাঠালাম।

মহাত্মা গান্ধীর পত্র

নূতন দিল্লি
৩০ মার্চ ১৯৩৯

স্নেহের সুভাষ,

তোমার নিকট হইতে আমার টেলিগ্রামের উত্তর পাইবার আশায় তোমার ২৬ তারিখের পত্রের জবাব দিতে বিলম্ব হইল। গত রাত্রে আমি সুনীলের তারবার্তা পাইয়াছি। আমি প্রাতঃকালীন প্রার্থনার পূর্বে উঠিয়া এই জবাব লিখিতে বসিয়াছি।

যেহেতু তুমি মনে কর, পন্থের প্রস্তাব নিয়মসম্মত হয় নাই এবং ওয়ার্কিং কমিটি সম্পর্কিত অংশটি স্পষ্টত নিয়মতন্ত্রবিরুদ্ধ ও বিধিবহির্ভূত, তোমার কর্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কমিটি গঠনে তোমার মনোনয়ন অবাধ হওয়া উচিত। অতএব এই প্রসঙ্গে তোমার অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

গত ফেব্রুয়ারিতে আমাদের মধ্যে সাক্ষাতের পর হইতে আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হইয়াছে যে, যেখানে মূল বিষয় লইয়া মতপার্থক্য, মতপার্থক্য যে ছিল সে বিষয়ে আমরা উভয়েই একমত ছিলাম, সেখানে একটি মিশ্র কমিটি অনিষ্টকর হইবে। অতএব তোমার নীতি এ. আই. সি. সি.'র সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন করে ধরিয়া লইয়া তোমার এমন একটি ওয়ার্কিং কমিটি হওয়া দরকার যাহাতে একমাত্র তাহারাই থাকিবে যাহারা তোমার নীতিতে বিশ্বাস করে।

হাঁ; ফেব্রুয়ারিতে সেবাগ্রামে আমাদের সাক্ষাতের সময় আমি যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম তাহা আমি বিশ্বাস করি। নিজেকে স্বেচ্ছায় মুছিয়া ফেলা পৃথক, তাহা না করিয়া নিজেকে তুমি কোনও ভাবে দমন করিলে তাহা সমর্থন করিয়া আমি দোষের ভাগী হইব না। যাহাতে দেশের সর্বাধিক মঙ্গল হইবে বলিয়া তোমার ধারণা তাহার কোনও প্রকার অপহ্নব নিজেকে দমন করার সামিল। অতএব তোমাকে যদি প্রেসিডেন্টের কাজ করিতে হয় তাহা হইলে তোমার হাত বাঁধা থাকিলে চলিবে না। দেশে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে তাহাতে মধ্যপন্থার কোনও স্থান নাই।

গান্ধীবাদীদের (আখ্যাটি যদিও ঠিক নয়) সম্পর্কে বলা যায়, তাহারা তোমাকে বাধা দিবে না।

তাহারা যেখানে পারিবে তোমাকে সাহায্য করিবে, যেখানে পারিবে না সেখানে বিরত থাকিবে। তাহারা যদি সংখ্যালঘু হয়, তাহাতে কোনওই অসুবিধা হইবে না। তাহারা যদি সুস্পষ্টভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তাহারা নিজেদের দমন করিতে নাও পারে।

আমাকে যাহা চিন্তিত করে তাহা এই যে কংগ্রেস নির্বাচক মণ্ডলীই ভুয়া, অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংখ্যালঘিষ্ঠতার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বিলুপ্ত। এতৎসত্ত্বেও, যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের ভিতরকার জঞ্জাল সাফ করা না যাইতেছে, আপাতত আমাদের সহায়সম্বল যাহা আছে তাহাতেই কাজ চালাইতে হইবে। অপর যে বিষয়ে আমি ভাবিত তাহা আমাদের নিজেদের মধ্যে নিদারুণ অবিশ্বাস। যেখানে কর্মীরা পরস্পরকে অবিশ্বাস করে সেখানে সম্মিলিত কাজ অসম্ভব।

আমার মনে হয় তোমার পত্রে উত্তর দিবার মতো আর কোনও বিষয় ছিল না। তুমি যাহাই কর, ভগবান তোমাকে চালিত করুন। ডাক্তারদের নির্দেশ মানিয়া শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠ। ভালবাসা জানিও।

বাপু

পুনশ্চ: আমার দিক হইতে যদি বল, আমাদের পত্রালাপ প্রকাশের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি যদি অন্যপ্রকার মনে কর, তোমাকে ইহা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিলাম।

বসুকে (তারবার্তা)

নূতন দিল্লি, ৩১ মার্চ ১৯৩৯

তোমার পত্র। প্রথম পত্রের জবাব গতকাল পাঠাইয়াছি। অল ইন্ডিয়া মিটিং অবশ্যই অগ্রগণ্য। কার্যপদ্ধতি নিয়ম ২ বলে জরুরি মিটিং-এ সাত দিনের নোটিশ আবশ্যক তাহা সংবাদপত্র মারফত দেওয়া যাইতে পারে। ভালবাসা।

—বাপু

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা)

জিয়ালগোরা, ৩১ মার্চ ১৯৩৯

আপনার অদ্যকার টেলিগ্রাম। আমার স্বাস্থ্যের দিক হইতে বিশের পর কোনও দিন ভাল হয়। অল ইন্ডিয়ার পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ধার্য। অল ইন্ডিয়ার পূর্বে গান্ধী সেবা সংঘ সম্মেলনে আপত্তি নাই। ব্যক্তিগতভাবে তাহাই আমার সুবিধা। সব সত্ত্বেও তারিখ বিষয়ে আপনার ইচ্ছাই মানিয়া লইব। প্রণাম।

—সুভাষ

বসুকে (তারবার্তা)

নতুন দিল্লি, ১ এপ্রিল ১৯৩৯

তোমার টেলিগ্রাম। তোমার সুবিধামতো তারিখ স্থির করো। তোমার তারিখ অনুযায়ী আমি ব্যবস্থা করিয়া লইব। ভালবাসা।

—বাপু

মহাত্মা গান্ধীকে

জিয়ালগোরা
৩১ মার্চ ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজি,

সুনীল আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে দীর্ঘ টেলিগ্রাম করেছিলেন তার জবাবে আপনি তাঁকে যে টেলিগ্রাম করেছেন তা আমি দেখলাম। আমাকে দিল্লি যাবার প্রস্তাব করে আপনি টেলিগ্রাম করাতে আমি ভাবলাম এ বিষয়ে ডাক্তারদের বক্তব্য তাঁদের নিজেদের বলতে দিলেই ভাল হবে। সেইজন্য সুনীল আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন।

২৪ তারিখে (ট্রেন থেকে) আমাকে লেখা আপনার চিঠিতে এবং ওই তারিখে দাদা শরৎকে লেখা চিঠিতে যে সব প্রসঙ্গ আছে সে সম্পর্কে এবং সাধারণ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি চিন্তা করছি। এই রকম সংকটের সময়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, বাস্তবিক এ আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ এমন দ্রুতগতিতে চলেছে যে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠবার সুযোগই আমি পাচ্ছি না। এ ছাড়া ত্রিপুরিতে এবং পরেও আমার প্রতি কোনও কোনও প্রভাবশালী মহলের (আমি পরিষ্কারভাবে বলে রাখতে চাই— এতে আপনি মোটেই পড়েন না) ব্যবহারে যে বিবেচনাটুকু আমার প্রাপ্য ছিল তা আমি পাইনি, কিন্তু আমার অসুস্থতার দরুন আমাকে পদত্যাগ করতে হবে, এ কোনও যুক্তি হতে পারে না। গতকাল আপনাকে লেখা চিঠিতে (আপনাকে লেখা আমার দ্বিতীয় চিঠি) আমি এই কথাই বলেছি, আমার জ্ঞানত কোনও প্রেসিডেন্ট দীর্ঘকাল জেলে থাকা কালেও পদত্যাগ করেননি। হতে পারে, শেষ পর্যন্ত আমাকে পদত্যাগ করতে হতে পারে— তবে যদি তা করতে হয় তা হবে ভিন্ন কারণে।

আমার মনে হয় আমি আমার দ্বিতীয় চিঠিতে বলেছি যে, যদিও পদত্যাগ করবার জন্য আমার উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে, আমি তা প্রতিরোধ করে চলেছি। আমার পদত্যাগের অর্থ হবে কংগ্রেস রাজনীতিতে এক নূতন পর্বের সূচনা, তা আমি শেষ পর্যন্ত পরিহার করতে চাই। যদি আমাদের একসঙ্গে চলা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তা হলে মর্মান্তিক এক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এবং তার পরিণাম যাই হোক— কংগ্রেস আগামী কিছুকালের জন্য দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তার সুযোগ নেবে ব্রিটিশ সরকার। এই দুর্বিপাক থেকে দেশ ও কংগ্রেসকে রক্ষা করা আপনার হাতের মধ্যে। নানা কারণে যারা সর্দার প্যাটেল ও তাঁর দলের দারুণ বিরোধী তাদের এখনও আপনার উপর আস্থা আছে এবং তারা বিশ্বাস করে আপনিই নিরপেক্ষভাবে ও আবেগে চালিত না হয়ে সব কিছু দেখতে পারেন। তাদের কাছে আপনি জাতির প্রতীক— সব দল ও গোষ্ঠীর

ঊর্ধ্বে— অতএব একমাত্র আপনিই কলহরত সবার মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনতে পারেন।

যদি কোনও কারণে, ভগবান না করুন, সেই আস্থা লোপ পায় এবং আপনাকে একজন দলীয় লোক বলে গণ্য করে, তা হলে ভগবান কংগ্রেস এবং আমাদের সহায় হোন!

আজ কংগ্রেসের দুটি প্রধান প্রধান দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ফাটলকে এখনও জোড়া দেওয়া যায়— এবং আপনিই পারেন। আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের মনোভাব সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে পারব না— তাঁদের সম্পর্কে ত্রিপুরিতে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা খুবই খারাপ। তবে আমাদের কথা আমি বলতে পারি। আমরা প্রতিহিংসাপরায়ণ নই এবং বিক্ষোভ পুষে রাখি না। আমরা সব বিবাদবিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলতে, ভুলে যেতে প্রস্তুত এবং সবার যা আদর্শ, ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি, সেই আদর্শের জন্য আবার আমরা হাতে হাত মেলাতে চাই। আমি যখন 'আমাদের' কথা বলছি সাংগঠনিক সি. এস. পি.'কে তা থেকে বাদ দিচ্ছি। ত্রিপুরিতে সর্বপ্রথম আমরা আবিষ্কার করি সাংগঠনিক সি. এস. পি.'র অনুগামীসংখ্যা কত কম। সি. এস. পি. দলে এখন ভাঙন ধরেছে এবং কয়েকটি প্রাদেশিক শাখা সাংগঠনিক নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তার কারণ নেতাদের তথাকথিত দ্বিধাগ্রস্ত নীতি। উপরকার নেতৃত্ব যাই করুক না কেন সি. এস. পি.'র একটা বিরাট অংশ ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গে থাকবে। এ বিষয়ে যদি আপনার সন্দেহ থাকে, কিছুকাল অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবেন।

আমার দাদা শরৎ আপনাকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে বোঝা যায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছেন। আমার অনুমান, এর প্রধান কারণ ত্রিপুরি রওনা হবার সময় তাঁর মনোভাব এরকম ছিল না। স্বভাবত ত্রিপুরিতে যা ঘটেছে সে সম্পর্কে আমার থেকে তিনি বেশি জানেন— যেহেতু তিনি যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়াতে, লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে ও খবরাখবর নিতে পারতেন। আমি শয্যাশায়ী থাকা সত্ত্বেও রাজনীতির দিক থেকে আমাদের বিরুদ্ধপক্ষীয় দায়িত্বশীল চক্রের মনোভাব সম্পর্কে কয়েকটি স্বতন্ত্র সূত্রে যতটুকু সংবাদ আমি পেয়েছি সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কে আমাকে বীতশ্রদ্ধ করার পক্ষে তা যথেষ্ট। আমি এও বলতে পারি যে, যখন আমি ত্রিপুরি ছেড়ে আসি তখন কংগ্রেস রাজনীতিতে এত ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা বোধ করি যে গত উনিশ বছরে কখনও তেমন বোধ করিনি। ভগবানের আশীর্বাদে আমার সেই মনোভাব এখন কেটে গেছে এবং আমি আমার মানসিক স্থৈর্য ফিরে পেয়েছি।

জওহরলাল তাঁর কোনও একটি চিঠিতে (এবং সম্ভবত সংবাদপত্রের বিবৃতিতে) মন্তব্য করেছেন যে, আমি প্রেসিডেন্ট থাকা কালে এ. আই. সি. সি. আপিসের অবনতি ঘটেছে। অন্যায় ও অন্যায্য বলে আমি ওই মন্তব্যে আপত্তি জানাচ্ছি। সম্ভবত তিনি বুঝতে পারেননি, আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টায় তিনি কৃপালনিজিকে এবং আপিসের সমস্ত কর্মীদের অপদস্থ করেছেন। সেক্রেটারি এবং তাঁর সহকর্মীদের উপর আপিসের ভার দেওয়া আছে, যদি আপিসের অবনতি ঘটে, তার জন্য তাঁরাই দায়ী। এই বিষয়ে জওহরকে আমি বিশদভাবে লিখছি।[১] আপনাকে আমার এই কথা বলার কারণ আপনি দাদা শরৎকে লেখা আপনার চিঠিতে অন্তর্বর্তী কার্য পরিচালন সম্পর্কে কিছু বলেছেন। একমাত্র যে উপায়ে আমরা আপিসের কাজে সাহায্য করতে পারি, তা এই, এক্ষুনি একজন স্থায়ী সেক্রেটারি নিয়োগ করা, ওয়ার্কিং কমিটির বাকি সদস্যদের নিয়োগে যদি দেরি থাকে তবুও তা করতে হবে। কিন্তু যদি ওয়ার্কিং কমিটি তাড়াতাড়ি গঠন করা হয়, আগেভাগে জেনারেল সেক্রেটারি নিয়োগ আমরা নাও করতে পারি।

পন্থ প্রস্তাবে আপনার প্রতিক্রিয়ার কথা যদি আমাকে জানান আমি কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার

১। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে এই চিঠি লেখা হয় ২৮ মার্চ ১৯৩৯। সম্ভবত এটি নেতাজির দীর্ঘতম চিঠি। চিঠিখানি এর পরেই উদ্ধৃত করা হল।

অবস্থার সুবিধা এই যে, আপনি সব কিছু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে পারেন— অবশ্য ত্রিপুরিতে সব ঘটনা আপনার জানা থাকলে। খবরের কাগজ দেখে বিচার করলে, এ যাবৎ যাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করেছেন, তাঁদের বেশির ভাগই একই মতাবলম্বী— অর্থাৎ যাঁরা পন্থ প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আপনার সঙ্গে যাঁরা দেখা করছেন তাঁদের বাদ দিয়েও আপনি সহজেই সবকিছুর সমুচিত মূল্য ধার্য করতে পারেন।

পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে আমার নিজের মতামত কী, আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন। তবে আমার ব্যক্তিগত মনোভাব ততটা ধর্তব্য নয়। লৌকিক জীবনে জনস্বার্থে আমাদের ব্যক্তিগত মনোভাবকে প্রায়ই নিবৃত্ত করতে হয়। আমি আগের এক চিঠিতেও একথা বলেছি যে, বিশুদ্ধ গঠনতান্ত্রিক দিক থেকে পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে যে যাই ভাবুক না কেন, একবার যখন তা কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছে, আমি তা মেনে নিতে বাধ্য। এখন আমার জিজ্ঞাস্য আপনি কি প্রস্তাবটিকে আমার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব বলে গণ্য করেন এবং এই কারণে, আপনি কি মনে করেন, আমার পদত্যাগ করা উচিত? এই বিষয়ে আপনার অভিমত আমাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করবে।

আপনি হয়তো অবগত আছেন ত্রিপুরিতে যাঁরা পন্থ প্রস্তাবের পক্ষে দল ভারী করবার জন্য প্রচার চালাচ্ছিলেন তাঁরা রটিয়েছিলেন যে রাজকোটের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা হয়েছে এবং প্রস্তাবটিতে আপনার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। ওই মর্মে একটি বিবরণ দৈনিক সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া ঘরোয়া আলোচনাতেও বলা হয়েছে, সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি যেমন আছে তার থেকে সামান্যও নড়চড় হলে আপনি বা আপনার গোঁড়া অনুগামীরা খুশি হবেন না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এইসব রটনা বিশ্বাস করিনি এবং করি না, কিন্তু ভোট সংগ্রহের দিক থেকে নিঃসন্দেহে তার মূল্য ছিল। পন্থ প্রস্তাবটি যখন সর্দার প্যাটেল আমাকে প্রথমবারে দেখান, আমি তখন তাঁকে প্রস্তাব করি (সেই সময় রাজেনবাবু ও মৌলানা আজাদও উপস্থিত ছিলেন) যে, কিছু অদলবদল যদি করা হয় তা হলে সংশোধিতরূপে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেসে পাস হয়ে যাবে। প্রস্তাবটি সংশোধিত রূপ সর্দার প্যটেলের কাছেও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁর তরফ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। মনে হয় তাঁদের মনোভাব ছিল— একটি শব্দ, একটি কমা-সেমিকোলনেরও হেরফের হলে চলবে না। আমার ধারণা রাজকুমারী অমৃত কাউর প্রস্তাবটির সংশোধিত রূপ আপনাকে দিয়েছেন। পন্থ প্রস্তাবের যদি লক্ষ্য হয়, আপনার নীতিতে আপনার নেতৃত্বে ও পরিচালনায় নূতন করে আস্থা প্রকাশ করা, সংশোধিত প্রস্তাবে তার ব্যবস্থা ছিল— কিন্তু যদি তার লক্ষ্য হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতিশোধ নেওয়া, তা হলে অবশ্য সংশোধিত প্রস্তাব দিয়ে তা হত না। পন্থের প্রস্তাব আপনার মর্যাদা প্রভাব ও প্রতিপত্তি কীভাবে বৃদ্ধি করেছে ব্যক্তিগতভাবে আমি তা বুঝি না। সাবজেক্টস্ কমিটিতে আপনার বিপক্ষে পঁয়তাল্লিশটি ভোট পড়েছিল এবং উন্মুক্ত অধিবেশনে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকেরা যাই বলুক না কেন, বিভিন্ন স্বতন্ত্র সূত্রে পাওয়া সংবাদ এই যে, প্রায় ২২০০ ভোটের মধ্যে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও কমপক্ষে ৮০০ ভোট হয়তো বেশিও হতে পারে আপনার বিরুদ্ধে পড়েছিল। এবং কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি সাবজেক্টস কমিটিতে যে রকম ভোট দিয়েছিল এখানেও যদি সেইরকম ভোট দিত, তা হলে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হত। যাই হোক না কেন ভোটের ফলাফল হত অনিশ্চিত। প্রস্তাবটি সামান্য পরিবর্তন করলে বিরুদ্ধে একটিও ভোট পড়ত না এবং আপনার নেতৃত্ব সমস্ত কংগ্রেস সদস্যের একবাক্যে সমর্থন লাভ করত। ব্রিটিশ সরকারের কাছে এবং সারা দুনিয়ার কাছে আপনার মর্যাদা নিমেষে শতগুণ বেড়ে যেত। তার পরিবর্তে, যারা আমাদের উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল তারা আপনার সুনাম ও মর্যাদা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করল। এর ফলে, আপনার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা দূরের কথা তারা তা এমন

অতলে নামিয়ে এনেছে যে তা কল্পনা করা যায় না। কারণ আজ সারা দুনিয়া জানল যে, যদিও ত্রিপুরিতে আপনি ও আপনার অনুগামীরা কোনওক্রমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন, এক শক্তিশালী বিরোধীপক্ষের অস্তিত্ব সেখানে রয়েছে। ঘটনাপ্রবাহকে যদি এইভাবে চলতে দেওয়া হয়, পরিমাণে ও শক্তিতে বিরোধিতা নিশ্চয় বৃদ্ধি পাবে। যে পার্টিতে বৈপ্লবিক, প্রগতিশীল যুবশক্তি নেই, সেই পার্টির ভবিষ্যৎ কী? গ্রেট ব্রিটেনের লিবারেল পার্টির মতো তার ভবিষ্যৎ।

পন্থ প্রস্তাবে আমার কী প্রতিক্রিয়া তা আপনাকে জানাতে গিয়ে অনেক কথাই বললাম। আমি কৃতজ্ঞ থাকব আপনি যদি অনুগ্রহ করে আপনার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা আমাকে জানান। আপনি কি পন্থের প্রস্তাব অনুমোদন করেন, না আমরা যেমন বলেছিলাম সেইভাবে সংশোধিত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হলেই আপনি বেশি খুশি হতেন।

আর একটি বিষয় আছে যা আমি এই চিঠিতে উল্লেখ করব— তা আমাদের কার্যক্রমের প্রশ্ন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধায় আমি আমার মতামত আপনাকে জানিয়েছি। তারপর যা ঘটেছে তাতে আমার ধারণাই সমর্থিত হয়েছে এবং আমার ভবিষ্যদ্ববাণীর ন্যায্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে। বেশ কয়েকমাস ধরে আমি বন্ধুবান্ধবদের বলে আসছি যে, ইউরোপে শীতের শেষে এক সংকট দেখা দেবে এবং তা গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত চলবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সেইসঙ্গে স্বদেশে আমাদের যা অবস্থা তাতে ৮ মাস আগে আমার এই দৃঢ় ধারণা জন্মে যে আমাদের সেই সময় এসেছে যখন আমরা পূর্ণ স্বরাজ দাবি করতে পারি। আমাদের এবং দেশের দুর্ভাগ্য, আপনি আমাদের এই আশাবাদ সমর্থন করেন না।

কংগ্রেসের ভিতরে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে এই ধারণা আপনাকে পেয়ে বসেছে। এ ছাড়া হিংসার মিথ্যা ভয়ে আপনি আতঙ্কিত। কংগ্রেসের ভিতর থেকে সমূলে দুর্নীতি দূর করবার জন্য আপনার যে সংকল্প যদিও তাতে আমি আপনার সঙ্গে একমত, আমার মনে হয় না ভারতকে সমগ্রভাবে দেখলে আগের চাইতে দুর্নীতি এখন বেশি, এবং হিংসার কথা যদি বলেন আমার নিশ্চিত মনে হয় তা আগের তুলনায় অনেক কম। আগে বাংলা, পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশকে সংগঠিত বৈপ্লবিক হিংসার ঘাঁটি বলে গণ্য করা যেতে পারত। এখন সেইসব জায়গায় অহিংসভাব অনেক বেশি প্রবল। বাংলাদেশ সম্পর্কে তো আমি সম্পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে বলতে পারি, এই প্রদেশ এখন যতখানি অহিংস, গত ৩০ বৎসরে কখনও তেমন হয়নি। এইসব এবং আরও অন্যান্য কারণে, ব্রিটিশ সরকারের কাছে চরমপত্রের আকারে আমাদের জাতীয় দাবি পেশ করতে আমাদের আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। চরমপত্রের ব্যাপারটা আপনার বা পণ্ডিত জওহরলালের মনোমত নয়। কিন্তু আপনার সমগ্র কর্মজীবনে আপনি কর্তৃপক্ষের কাছে কতবারই না চরমপত্র দিয়েছেন এবং এই উপায়ে জনস্বার্থকেও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই ক'দিন আগে রাজকোটেও আপনি একই কাজ করেছেন। তা হলে চরমপত্রের আকারে আমাদের জাতীয় দাবি পেশ করতে কী আপত্তি থাকতে পারে? যদি আপনি তাই করেন এবং একই সঙ্গে আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন, আমি দৃঢ় নিশ্চয়, আমরা অতি শীঘ্র পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করতে সমর্থ হব। ব্রিটিশ সরকার হয় বিনা যুদ্ধে আমাদের দাবিতে সাড়া দেবে, নয়তো, যদি সংগ্রাম একান্তই হয়, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আমি এই বিষয়ে এত আশাবাদী এবং আমার এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার মনে হয় যদি আমরা সাহসে ভর করে অগ্রসর হই, খুব বেশি হলেও ১৮ মাসের মধ্যেই আমরা স্বরাজ লাভ করব।

এই বিষয়ে আমার বিশ্বাস এত প্রবল যে এই কারণে আমি যে কোনও স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত। আপনি যদি সংগ্রামের দায়িত্ব নেন আমি সানন্দে আমার সাধ্যমতো আপনাকে সাহায্য করব। যদি আপনি মনে করেন অপর কোনও প্রেসিডেন্টকে নিলে কংগ্রেস আরও ভালভাবে সংগ্রাম করতে পারবে, সানন্দে আমি সরে দাঁড়াব। আপনি যদি মনে করেন আপনার পছন্দমতো

ওয়ার্কিং কমিটি হলে কংগ্রেস আরও সার্থকভাবে সংগ্রাম চালাতে পারবে, সানন্দে আমি আপনার ইচ্ছাকে মেনে নেব। আমি শুধু এইমাত্র চাই, আপনি এবং কংগ্রেস এই সংকটময় মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উঠে স্বরাজের জন্য আবার সংগ্রাম শুরু করুন। যদি নিজেকে মুছে ফেললে জাতীয় লক্ষ্য ত্বরান্বিত হয়, আমি পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মুছে ফেলতে প্রস্তুত। আমি মনে করি, এইটুকু করতে পারার মতো যথেষ্ট ভালবাসা আমার দেশের প্রতি আছে।

আপনি সম্প্রতি যে ভাবে দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলন পরিচালনা করেছেন তা আমার মনোমত হয়নি— একথা বলার জন্য আমাকে মার্জনা করবেন। রাজকোটের জন্য আপনি আপনার মহামূল্য জীবন বিপন্ন করেছেন এবং রাজকোটের জনগণের জন্য লড়াই চালাবার সময় অন্যান্য রাজ্যের সংগ্রাম আপনি বন্ধ রাখলেন। কী কারণে আপনি তা করলেন? ভারতে ছয়শোর বেশি রাজ্য আছে এবং রাজকোট তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি রাজ্য। রাজকোট-লড়াইকে মশার কামড় বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেন আমরা দেশব্যাপী সর্বত্র একই সঙ্গে লড়াই করব না এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা স্থির করব না? দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই চিন্তাই করছে, যদিও আপনার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধায় তারা স্পষ্টভাবে তা বলতে দ্বিধা বোধ করছে।

পরিশেষে আমি বলতে পারি আমার মতো অনেকেই রাজকোট মীমাংসার শর্তে উৎসাহিত বোধ করেনি। একে আমরা বিরাট জয় বলে অভিহিত করেছি— এবং জাতীয়তাবাদী কাগজগুলিও আমাদের সায় দিয়েছে,— কিন্তু আমরা কতটুকু লাভবান হয়েছি? স্যার মরিস গয়ার আমাদেরও লোক নন, স্বাধীন প্রতিনিধিও নন। তিনি সরকারি ব্যক্তি। তাঁকে সালিস করায় কী যুক্তি থাকতে পারে? আমরা আশা করছি তিনি আমাদের সপক্ষে রায় দেবেন। কিন্তু যদি তিনি আমাদের বিপক্ষে রায় দেন, আমাদের অবস্থা তখন কী হবে?

এ ছাড়াও যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বরবাদ করবার সংকল্প আমরা নিয়েছি, স্যার মরিস গয়ার তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনও সংঘর্ষের ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনও হাইকোর্টের জজ বা দায়রা জজকে সালিস মানি তা হলে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সর্বদাই আমরা মীমাংসায় পৌঁছতে পারব। কিন্তু সে রকম মীমাংসায় আমরা কতটুকু লাভবান হব? তা ছাড়া অনেকেই বুঝতে পারছে না, বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের পরও আপনি কী কারণে দিল্লিতে অপেক্ষা করছেন। সম্ভবত, আপনার দুর্বল স্বাস্থ্যের দরুন আবার দীর্ঘ ট্রেনযাত্রা করবার আগে আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এবং তার সমর্থকদের এতে মনে হতে পারে আপনি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রধান বিচারপতিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং তার ফলে তাঁর মর্যাদাও বৃদ্ধি করছেন।

আমার চিঠি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেছে, অতএব এবার থামা দরকার। যদি আমি এমন কিছু বলে থাকি যা আপনার কাছে ভ্রান্ত মনে হয়, আশা করি আপনি আমাকে মার্জনা করবেন। আমি জানি আপনি চান লোকে মনের কথা স্পষ্টভাবে খুলে বলুক। তাই আমাকে অকপটে এই দীর্ঘ চিঠি লেখবার সাহস জুগিয়েছে।

ধীরে ধীরে হলেও ক্রমশ আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। আশা করি যখন এই চিঠি আপনার কাছে পৌঁছবে আপনার শরীর তখন আরও সুস্থ এবং আপনার রক্তচাপ আরও কম থাকবে।

সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা)

জিয়ালগোরা, ১ এপ্রিল ১৯৩৯। মহাত্মা গান্ধী, নূতন দিল্লি

ইতিপূর্বে বিঘোষিত গান্ধী সেবা সংঘ অধিবেশন তারিখ এড়াইতে ২৮-এ ওয়ার্কিং কমিটি এবং ৩০-এ অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ঘোষণা করিব কি?

—সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীর পত্র

বিড়লা ভবন, নূতন দিল্লি
২ এপ্রিল ১৯৩৯

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ৩১ মার্চের এবং তার আগেকার পত্র পাইয়াছি। তুমি অকপটে সব কথা বলিয়াছ। তোমার মতামত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছ বলিয়া তোমার পত্রগুলি আমার ভাল লাগিয়াছে।

যে অভিমত তুমি ব্যক্ত করিয়াছ তাহা অন্য সবার এবং আমার মতের এতই বিপরীত বলিয়া আমার মনে হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে যোগসাধনের কোনও সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি না। আমি মনে করি একই ভাবনায় ভাবিত প্রতিটি দলের দেশের সম্মুখে অবিমিশ্রভাবে নিজ নিজ মত উপস্থাপিত করিবার সামর্থ্য থাকা উচিত। এবং ইহা যদি সততার সহিত করা হয় তাহা হইলে আমি বুঝি না কেন এমন তিক্ততা দেখা দিবে যার পরিণতি হইবে গৃহযুদ্ধ।

গলদ আমাদের মতপার্থক্যের নয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাবে। সময়ে তার প্রতিকার হইবে, সময়ই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। আমাদের মধ্যে যথার্থ অহিংসা যদি থাকিয়া থাকে, গৃহযুদ্ধ কখনই হইতে পারে না। তিক্ততা তো নয়ই।

সব দিক বিবেচনার পর আমার এই অভিমত, তুমি পুরাপুরি তোমার মতাবলম্বীদের লইয়া অবিলম্বে তোমার নিজস্ব ক্যাবিনেট গঠন করো, অতঃপর সুস্পষ্টভাবে তোমার কার্যক্রম স্থির করিয়া আসন্ন এ. আই. সি. সি.-র নিকট উপস্থাপিত করো। কমিটি যদি তোমার কার্যক্রম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সব কিছু সহজ হইয়া যাইবে এবং তুমি সংখ্যালঘিষ্ঠদের দ্বারা ব্যাহত না হইয়া সেই অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইতে পারিবে। অপরপক্ষে যদি তোমার কার্যক্রম গৃহীত না হয়, তখন তোমাকে পদত্যাগ করিতে হইবে, সেই অবস্থায় কমিটি নিজস্ব প্রেসিডেন্ট ঠিক করিবে। এবং তখন দেশকে তোমার স্বমতে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে তোমার কোনও বাধা থাকিবে না। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের কথা বাদ দিয়াই আমি তোমাকে এই উপদেশ দিতেছি।

এইবার তোমার প্রশ্নে আসা যাক। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব যখন রচিত হইয়াছিল আমি তখন শয্যাশায়ী। মথুরাদাস সেইসময় ঘটনাচক্রে রাজকোটে উপস্থিত ছিল। একদিন সকালে সে আমাকে খবর দিল যে প্রাচীনপন্থীদের উপর আস্থা জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব লওয়া হইতেছে। প্রস্তাবের বয়ান আমার নিকট ছিল না। আমি বলিয়াছিলাম, ইহা দ্বারা যতটা সম্ভব ভালই হইবে, কারণ সেবাগ্রামে আমাকে জানানো হইয়াছিল। তোমার নির্বাচনে ততটা তোমার প্রতি আস্থা জানানো হয় নাই, যতটা জানানো হইয়াছিল প্রাচীন-পন্থীদের প্রতি অনাস্থা; বিশেষ করিয়া

সর্দারের প্রতি। ইহার পর আমি যখন মৌলানা সাহেবের সহিত দেখা করিতে এলাহাবাদ যাই তখনই মূল প্রস্তাবটি আমি দেখি।

আমার মর্যাদা ধর্তব্য নয়। ইহার নিজস্ব স্বকীয় মূল্য নাই। যখন আমার উদ্দেশ্যে সন্দেহ পোষণ করা হয় অথবা আমার নীতি বা কার্যক্রমকে দেশ প্রত্যাখ্যান করে, মর্যাদাও ঢলিয়া যাইতে বাধ্য। ভারতবর্ষ উঠিবে বা পড়িবে তাহা নির্ভর করে তাহার বহু কোটি জনমানবের সম্মিলিত চরিত্রের উপর। ব্যক্তি যতই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হোক, এই বহু কোটি জনসাধারণের যতখানি সে প্রতিনিধি ততখানি ছাড়া তাহার আর কোনও মূল্য নাই। অতএব ইহা আমাদের বিবেচ্য হইতে পারে না।

এ দেশ এখন যেমন অহিংস পূর্বে কখনও তেমন হয় নাই তোমার এই মত আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। যে বাতাসে আমি নিশ্বাস লইতেছি সেই বাতাসে আমি হিংসার আঘ্রাণ পাইতেছি। কিন্তু হিংসা সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করিয়াছে। আমাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস হিংসারই একটা কদর্য রূপ। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ব্যবধান বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাও একই পদার্থের ইঙ্গিত করে। আমি আরও দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

কংগ্রেসের ভিতরে দুর্নীতির পরিমাণ সম্পর্কেও মনে হয় আমাদের মতভেদ আছে। আমার ধারণা ইহা বাড়িতেছে। আমি অনেক মাস ধরিয়া সবকিছু বিশদভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কথা বলিয়া আসিতেছি।

এই পরিস্থিতির মধ্যে অহিংস গণ-আন্দোলনের পরিবেশ আমি দেখিতেছি না। কার্যকর প্রস্তুতি ছাড়া চরমপত্র কোনওই কাজের নয়।

কিন্তু তোমাকে আগেই বলিয়াছি, আমি বৃদ্ধ, সম্ভবত ভীরু ও অত্যধিক সাবধানি হইয়া উঠিতেছি এবং তোমার সামনে যৌবন ও যৌবনসুলভ বেপরোয়া আশাবাদ রহিয়াছে। আশা করি তুমিই ঠিক, আমিই ভুল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ কংগ্রেস যাহা হইয়াছে তাহাতে তাহার কাছ হইতে কিছু আশা করা যায় না, আইন অমান্য নামের যোগ্য কিছুই তার দ্বারা সম্ভব নয়। অতএব তোমার বিশ্লেষণ যদি ঠিক হয়, আমি তাহা হইলে অচল এবং সত্যাগ্রহের সেনাপতি হইবার পক্ষে অশক্ত।

তুমি যে ক্ষুদ্র রাজকোট ব্যাপারটি উল্লেখ করিয়াছ তাহাতে আমি খুশি হইয়াছি। ইহাতে আমাদের পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রকট হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমি যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছি তাহার কোনওটির জন্যই আমার আক্ষেপ নাই। আমার মনে হয় ইহার বিরাট জাতীয় গুরুত্ব আছে। আমি রাজকোটের জন্য অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করি নাই। কিন্তু রাজকোট আমার চোখ খুলিয়া দিয়াছে। ইহা আমাকে পথ দেখাইয়াছে। আমি স্বাস্থ্যের জন্য দিল্লিতে নাই। প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে দিল্লিতে থাকিতে হইয়াছে। বড়লাট তাঁহার শেষ তারবার্তায় আমার নিকট যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা যথাযথ পূরণের জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা অবধি দিল্লিতে উপস্থিত থাকা আমি কর্তব্য বলিয়া মনে করি। আমি কোনও ঝুঁকি লইতে চাই না। আমি যদি সর্বোচ্চ শক্তিকে তাহার কর্তব্য পালন করিতে আহ্বান করিয়া থাকি, সেই কর্তব্য সম্পূর্ণ পালিত হইয়াছে কিনা দেখিতে আমিও দিল্লিতে থাকিতে বাধ্য। যে দলিলের অর্থ সম্বন্ধে ঠাকোরসাহেব সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যাতা হিসাবে প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করায় আমি অন্যায় কিছু দেখি নাই। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, স্যার মরিস দলিলটি প্রধান বিচারপতি হিসাবে পরীক্ষা করিবেন না। তিনি তাহা পরীক্ষা করিবেন বড়লাটের আস্থাভাজন কুশলী এক আইনজ্ঞ হিসাবে। বড়লাটের মনোনীত ব্যক্তিকে বিচারক হিসাবে গ্রহণ করিয়া, আমার মনে হয় আমি বুদ্ধি ও শালীনতা দুয়েরই পরিচয় দিয়াছি এবং ইহার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ, আমি এ বিষয়ে বড়লাটের দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি করিয়াছি।

যদিও আমরা নিজেদের মধ্যকার তীব্র মতভেদ লইয়া আচোলনা করিলাম, আমি সুনিশ্চিত আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সামান্যও ক্ষুণ্ণ হইবে না। যদি তাহা আন্তরিক হয়, আমার বিশ্বাস তাহা আন্তরিকই, তবে তাহা এইসব মতভেদের ধাক্কা সহ্য করিতে পারিবে।

ভালবাসা জানিও।

বাপু

বসুকে (তারবার্তা),

নূতন দিল্লি, ২ এপ্রিল ১৯৩৯

তোমার পত্রের সম্পূর্ণ জবাব পাঠাইলাম। তাহাতে আমার উপদেশ পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব নিরপেক্ষ এবং দুই মতাবলম্বীদের ধারণা একেবারে বিপরীত হওয়ায় তুমি সম্পূর্ণভাবে তোমার নীতিতে বিশ্বাসী লোকদের লইয়া নিজস্ব ক্যাবিনেট গঠন করো। তোমার নীতি ও কার্যপদ্ধতি ঠিক করিয়া প্রকাশ করিবে এবং এ. আই. সি. সি'.র নিকট পেশ করিবে। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করো, বিনা বাধায় তোমার কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিতে সক্ষম হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করিলে, তোমার পদত্যাগ করা এবং এ. আই. সি. সি.'কে নূতন প্রেসিডেন্ট মনোনীত করিতে বলা উচিত হইবে। সততা ও সদিচ্ছা থাকিলে গৃহযুদ্ধের ভয় আমি করি না।

ভালবাসা।

—বাপু

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা),

জিয়ালগোরা, ৩ এপ্রিল ১৯৩৯

আমার পত্রের উত্তরে আপনার পত্র এবং টেলিগ্রাম। আমি তাহা বিবেচনা করিতেছি। ইতিমধ্যে মনে হয় পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে আমার বক্তব্য আপনি ও জনসাধারণের এক অংশ ভুল বুঝিয়াছেন। যদিও শেষ প্রকরণ সম্পূর্ণ গঠনতন্ত্র বিরোধী, তবু তাহা উত্থাপনের অনুমতি দিয়াছিলাম এবং আমি কংগ্রেসের রায় মানিতে বাধ্য। অবস্থাটি ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমি মনে করি সংবাদপত্রের ছোট একটি বিবৃতি প্রয়োজন। আপনার কোনও আপত্তি আছে কিনা জানাইয়া দয়া করিয়া টেলিগ্রাম করিবেন।

প্রণাম।

—সুভাষ

বসুকে (তারবার্তা),

নূতন দিল্লি, ৪ এপ্রিল ১৯৩৯

সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা আমাদের পত্রালাপ সম্পর্কে সর্বপ্রকার প্রশ্ন করিতেছে। আমি তাহাদের তোমার সহিত যোগাযোগ করিতে বলিয়াছি। আমার সহযোগী ও সহকর্মীদের নিকট ছাড়া কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করি নাই।

ভালবাসা।

—বাপু

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা),

জিয়ালগোরা, ৫ এপ্রিল ১৯৩৯

ইউনাইটেড প্রেস পূর্বাভাস প্রকাশ করিতেছে বলিয়া গতকাল অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস প্রামাণিক রিপোর্টের জন্য অনুরোধ করে। তাহাদের বলিয়াছি এখন কিছু প্রকাশ করা অসম্ভব, কাগজপত্র মাত্র একজনকে দেখাইয়াছি, এই সপ্তাহে আরও তিন বন্ধুকে দেখাইতে পারি। আমার মতে আমাদের উভয়ের সম্মতিতে পুরা প্রচারের ব্যবস্থা উচিত। নূতন দিল্লির সংবাদপত্রের খবর, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ২৮-এ স্থির, কিন্তু আপনার কাছ হইতে জবাব নাই।

—সুভাষ

বসুকে (তারবার্তা),

নূতন দিল্লি, ৫ এপ্রিল ১৯৩৯

তোমার তার। এখান হইতে তারিখ জানানো হয় নাই। তোমার টেলিগ্রাম স্বীকার করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মার্জনা। আজ খবর পাইলাম প্লেগের দরুণ গান্ধী সেবা সংঘ মুলতুবি। তোমার সুবিধামতো যে কোনও তারিখ স্থির করো। প্রকাশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ তোমার দায়িত্ব রহিল। ভালবাসা।

—বাপু

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা),

জিয়ালগোরা, ৫ এপ্রিল ১৯৩৯

দিল্লি হইতে অমৃতবাজার পত্রিকা আমাদের পত্রালাপের এক রিপোর্ট আজ প্রকাশ করিয়াছে। যদিও ঠিকমতো নয়, স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে ওখান হইতে খবর বাহির হইতেছে।

—সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা),

জিয়ালগোরা, ৫ এপ্রিল ১৯৩৯

আমার শেষ টেলিগ্রামের পর 'লিডার' সমেত অন্যান্য কাগজ দেখিয়াছি। স্পষ্ট লক্ষণ আমাদের পত্রালাপের রিপোর্ট দিল্লি হইতে বাহির হইতেছে। অনুগ্রহ করিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করুন।

—সুভাষ

বসুকে (তারবার্তা),

নূতন দিল্লি, ৫ এপ্রিল ১৯৩৯

সংবাদপত্র সত্যগোপনের ফন্দি জানে। তাহারা উদ্ভবের স্থানের নাম তৈয়ারি করে এবং অনেক কিছু মনে মনে ঠিক করে। কী ঘটিয়াছে জানি না। তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি আমার জ্ঞানত এখানকার কেহ খবরের জন্য দায়ী নয়। তুমি আমাকে কী করিতে বল, জানাইও। ভালবাসা।

—বাপু

মহাত্মা গান্ধীকে

জিয়ালগোরা,
৬ এপ্রিল ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজি,

মেজদাদাকে, আমার দাদা শরৎকে লেখা কোনও এক চিঠিতে আপনি বলেছিলেন, ভবিষ্যতে মিলিতভাবে কাজ করবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য উভয় পক্ষের নেতাদের মধ্যে খোলাখুলি কথা বলা দরকার। প্রস্তাবটি চমৎকার এবং অতীতে যাই ঘটুক না কেন এ বিষয়ে আমি আমার যথাসাধ্য করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। অনুগ্রহ করে আমাকে কি জানাবেন এ সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু করতে বলেন কিনা, যদি বলেন, তা কী? ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ঐক্যবদ্ধ করার এই প্রয়াসে আপনার প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব অনেক কিছুই করতে পারে। আমরা মেলবার সকল আশা ত্যাগ করার আগে আপনি কি আমাদের সবাইকে মেলাতে শেষবারের মতো একবার চরম চেষ্টা করবেন না? সারা দেশ এখনও আপনাকে কতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখে আর একবার আপনাকে তা স্মরণ করতে অনুরোধ করি। আপনি কোনও দলীয় নন, সেইজন্য দ্বন্দ্বরত সকলকে একত্রিত করবার জন্য জনসাধারণ এখনও আপনার উপরেই ভরসা রাখে।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে আপনি যে পরামর্শ দিয়েছেন সেই সম্পর্কে আমি গভীরভাবে চিন্তা করছি। আমার মনে হচ্ছে আপনার উপদেশ নৈরাশ্যের উপদেশ। এই উপদেশ একতার সব আশাকে ধূলিসাৎ করে। দ্বিখণ্ডিত হওয়া থেকে কংগ্রেসকে এ রক্ষা করবে না— অপরপক্ষে তা সেই সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে একমতাবলম্বীদের নিয়ে ক্যাবিনেট

গঠনের উপদেশ দেওয়ার অর্থ দাঁড়াবে দলগুলিকে এখনই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বলা। তা নিদারুণ দায়িত্বের ব্যাপার নয় কি? আপনি কি সুনিশ্চিত যে মিলিতভাবে কাজ করা অসম্ভব? আমাদের দিক থেকে আমরা কিন্তু তা ভাবি না। আমরা ভুলচুক সব মিটিয়ে ফেলে সাধারণ আদর্শের স্বার্থে হাতে হাত মেলাতে প্রস্তুত এবং সম্মানজনক একটি আপস মীমাংসার জন্য আমরা আপনারই মুখাপেক্ষী। এর আগে আপনাকে বলেছি এবং লিখে জানিয়েছি, কংগ্রেসের গঠন এখন যেমন আছে— এবং নিকট ভবিষ্যতে তার লক্ষণীয় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনাও নেই, তাতে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হবে মিশ্র ক্যাবিনেট গঠন, এমন ক্যাবিনেট, যেখানে যতদূর সম্ভব সব দলেরই প্রতিনিধি থাকবে।

আমি জানি আপনি মিশ্র ক্যাবিনেট গঠনের বিরোধী। আপনার বিরোধিতার কারণ কি মূলনীতিগত (যথা, আপনার মতে মিলিত-ভাবে কাজ করা অসম্ভব) অথবা যেহেতু আপনি মনে করেন, ক্যাবিনেটে "গান্ধীবাদীদের" (যোগ্যতর কোনও শব্দের অভাবে আমি এই শব্দটি ব্যবহার করছি, এইজন্য অনুগ্রহ করে আমাকে মার্জনা করবেন) আরও অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি থাকা উচিত? দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন যাতে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখবার সুযোগ পাই। প্রথম ক্ষেত্রে, আমি এই চিঠিতে যা বলছি সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আপনি আগে যে উপদেশ দিয়েছেন অনুগ্রহ করে তার পুনর্বিবেচনা করবেন। হরিপুরায় যখন আমি ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সমাজবাদীদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব করি, আপনি তখন আমাকে সুস্পষ্টভাবে জানান, আমরা প্রস্তাবে আপনার সমর্থন আছে তখন থেকে পরিস্থিতির কি এতই মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে যার জন্য আপনাকে সমমতাবলম্বী ক্যাবিনেটের জন্য জিদ করতে হচ্ছে?

আপনি আপনার চিঠিগুলিতে দুইপক্ষ "একেবারে বিরুদ্ধভাবাপন্ন" বলে উল্লেখ করেছেন। আপনি এই বিষয়টি আরও বিশদ করে বলেননি এবং যে-বিরোধিতার আপনি উল্লেখ করেছেন, তার ভিত্তি কার্যক্রমে না ব্যক্তিগত সম্পর্কে, তাও স্পষ্ট নয়। আমার মতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী ঘটনা। আমরা ঝগড়া বিবাদ করতে পারি এবং আমরা হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের বিরোধ মিটিয়েও ফেলতে পারি। কংগ্রেসের সাম্প্রতিক ইতিহাসে স্বরাজ্য দলের ঘটনায় এর দৃষ্টান্ত পেতে পারেন। যতদূর আমি জানি কিছুকাল বিরোধিতার পর দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলালজির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক যতদূর মধুর হওয়া সম্ভব তা হয়েছিল। গ্রেট ব্রিটেনে যখনই জরুরি অবস্থা দেখা দেয় প্রধান প্রধান দল তিনটি সর্বদা একই ক্যাবিনেটে মিলিতভাবে কাজ করে। ফ্রান্সের মতো ইউরোপের দেশগুলিতে ক্যাবিনেট মাত্রই সাধারণত মিশ্র ক্যাবিনেট। আমরা কি ফরাসি বা ইংরেজদের থেকে কম দেশপ্রেমিক? যদি তা না হই তা হলে আমরাই বা কেন কার্যকর হতে পারে এমন মিশ্র ক্যাবিনেট গঠন করতে পারব না?

যদি আপনি মনে করেন আপনার বিরোধিতার মূলে কার্যক্রম ইত্যাদি যতটা আছে ব্যক্তিগত কারণ ততটা নেই, এই বিষয়ে আপনার অভিমত জানালে খুশি হব।

আমাদের কার্যক্রম কোনখানে আলাদা বলে আপনি মনে করেন এবং তা কি এতই মৌলিক যে মিলিতভাবে কাজ করা অসম্ভব? আমি জানি আমাদের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু আমার মতে আমাদের মতভেদের দিকগুলি থেকে মতৈক্যের দিকগুলি অনেক বেশি, এই কথাই ওয়ার্কিং কমিটির আমার প্রাক্তন সহকর্মীদের পদত্যাগ পত্রের জবাবে আমি বলেছিলাম। ত্রিপুরিতে যাই ঘটুক, আমি এখনও এইমত পোষণ করি।

আপনার কোনও এক চিঠিতে, স্বরাজের প্রশ্নে আমার চরমপত্র দেবার প্রস্তাব সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে অহিংস গণ-আন্দোলনের উপযোগী পরিবেশ নেই। কিন্তু রাজকোটে কি আপনি অহিংস গণ-আন্দোলনের আশ্রয় নেননি? আরও কোনও কোনও দেশীয় রাজ্যেও কি

আপনি তাই করবেন না? এইসব দেশীয় রাজ্যের লোকেরা সত্যাগ্রহের প্রয়োগে তুলনায় কম দক্ষ। অন্তত তাদের তুলনায় ব্রিটিশ ভারতের আমরা বেশি অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দাবি করতে পারি। যদি নাগরিক স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল সরকারের জন্য সংগ্রামে দেশীয় রাজ্যের লোকদের সত্যাগ্রহের আশ্রয় নিতে দেওয়া যেতে পারে, ব্রিটিশ ভারতের আমাদের তা দেওয়া যাবে না কেন?

গান্ধীবাদীদের সমর্থনে ত্রিপুরি কংগ্রেসে যে জাতীয় দাবির প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে তার কথাই ধরা থাক। যদিও এতে সুন্দর সুন্দর ধোঁয়াটে কথার বিন্যাস ও কিছু সদুক্তি আছে, একদিক থেকে এর সঙ্গে আমি যে-চরমপত্রের কথা ও আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার কথা বলেছিলাম, তার অনেক মিল আছে। এখন, এই প্রস্তাব কি আপনি অনুমোদন করেন? যদি করেন, তা হলে কেনই বা আপনি আরও এক ধাপ এগিয়ে এসে আমার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন না?

এইবার আমি পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু বলব। তার গুরুত্বপূর্ণ অংশের (মানে শেষের অংশটির) বক্তব্য দুটি। প্রথমত, ওয়ার্কিং কমিটিকে আপনার আস্থাভাজন হতে হবে—এই আস্থা নির্বিবাদ আস্থা। দ্বিতীয়ত, আপনার ইচ্ছানুযায়ী তা গঠন করতে হবে। আপনি যদি একমতাবলম্বী ক্যাবিনেটের উপদেশ দেন এবং সেইরূপ ক্যাবিনেট গঠিত হয়, তা হলে হয়তো একথা বলা যেতে পারে যে তা "আপনার ইচ্ছানুযায়ী" গঠিত হয়েছে। কিন্তু তাকে আপনার আস্থাভাজন বলে কি দাবি করা যেতে পারে? এ. আই. সি. সি-র মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে সদস্যদের কাছে একথা কি আমি বলতে পারব যে, আপনি সমমতাবলম্বী ক্যাবিনেট গঠন করবার পরামর্শ দিয়েছেন এবং নতুন ক্যাবিনেট আপনার আস্থাভাজন হয়েছে? অপরপক্ষে, আপনার আস্থাভাজন নয় এইরকম ক্যাবিনেট গঠন করবার যদি উপদেশ দেন, আপনি কি তা হলে পন্থ প্রস্তাবকে কার্যকর করছেন বলবেন এবং আপনার দিক থেকে বিচার করলেও আপনি কি ঠিক কাজ করবেন? আমি প্রশ্নটির এই দিক আপনাকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। পন্থ প্রস্তাবকে আপনি যদি স্বীকৃতি দেন, নতুন ওয়ার্কিং কমিটি সম্পর্কে আপনার মনোগত ইচ্ছাই শুধু জানালে হবে না, সেইসঙ্গে এমন একটি কমিটি গঠনের জন্য আপনাকে উপদেশ দিতে হবে যা আপনার আস্থাভাজন হবে।

পন্থ প্রস্তাবের গুণাগুণ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত আপনি কিছু বলেননি। আপনি কি তা অনুমোদন করেন? অথবা আমরা যেভাবে বলেছিলাম মোটের উপর সেইভাবে, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কোনও প্রস্তাবে বিতর্কমূলক ধারাগুলি বাদ দিয়ে যদি আপনার নীতি ও নেতৃত্বের প্রতি নতুন করে বিশ্বাস ও আস্থাজ্ঞাপন করা হত, তা হলে কি তা আপনার বেশি মনোমত হত না? তারপর, প্রস্তাবটি গৃহীত হবার পর ওয়ার্কিং কমিটি নিয়োগের ব্যাপারে সভাপতির অবস্থা কী দাঁড়ায়? আমি আবার এই প্রশ্ন করছি কারণ বর্তমান গঠনতন্ত্রটি কার্যত আপনারও হাতে তৈরি এবং এ-বিষয়ে আপনার মতামতের মূল্য আমার কাছে অত্যধিক। এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন আছে যা আপনাকে বারেবারে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে। আপনি কি প্রস্তাবটিকে আমার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব বলে মনে করেন? যদি তাই হয়, আমি এখনই পদত্যাগ করছি এবং তা বিনাশর্তে। সংবাদপত্রে দেওয়া বিবৃতিতে আমার এই প্রশ্ন কিছু কিছু পত্রিকা এই বলে সমালোচনা করেছে যে, প্রস্তাবটির কী তাৎপর্য আমার নিজেরই বুঝে ঠিক করা উচিত। নিজস্ব ব্যাখ্যা দেবার মতো যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে, তা সত্ত্বেও এমন অনেক সময় আসে যখন নিজস্ব ব্যাখ্যার উপর ভরসা করে চলা উচিৎ হয় না। খোলাখুলি ভাবে বলতে গেলে আমি মনে করি সভাপতি নির্ধারণের ফলাফল প্রমাণিত করেছে আমার পথ ন্যায্য। আমার এখন আসন দখল করে একদিনও থাকবার ইচ্ছা নেই যদি না তার দ্বারা সাধারণের স্বার্থ বলতে আমি যা বুঝি

তা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমার তরফে যে দ্বিধা বা বিলম্ব দেখা দিয়েছে তার কারণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। আমার সমর্থকদের মধ্যে দুই দল দু'ভাবে ভাবছেন— একদলের বক্তব্য, কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া বৃথা, অতএব এখনই তা বন্ধ করে আমি যেন পদত্যাগপত্র দাখিল করি। এই দল আমার উপর অত্যধিক চাপ দিয়ে চলেছে, কিন্তু আমি তা প্রতিরোধ করছি। আমি আমার বিবেকের কাছে দ্বিধাহীন থাকতে চাই যে, আমি শেষ পর্যন্ত আমাদের দলের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিলাম। এছাড়াও, আমি জানি বর্তমান অবস্থায় আমার পদত্যাগের অর্থ কী দাঁড়াবে এবং তার পরিণাম কী হবে। এখানে আমি এ-কথাও বলতে চাই যে, প্রথম দলটি অর্থাৎ যাঁরা আপোসের সর্বপ্রকার সম্ভাব্য চেষ্টা চালাবার জন্য আমাকে বলছেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন আপনিই সব কিছু নির্দলীয় দৃষ্টিতে দেখতে সক্ষম এবং সেইজন্য দুই দলের মিলন ঘটাতেও পারেন।

আপনি যদি বলেন পন্থ প্রস্তাবের তাৎপর্য আমার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপন তা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমি পদত্যাগ করব— কেন আমি একথা বলেছি আমার তা আরও ব্যাখ্যা করে বলা দরকার। আপনি ভালমতোই জানেন, আপনি যা বলেন, বা বিশ্বাস করেন আমার দেশবাসীর অনেকেই যেমন অন্ধভাবে তা অনুসরণ করে, আমি তা করি না। তা হলে আপনি যদি মনে করেন প্রস্তাবটি অনাস্থাজ্ঞাপক, আমি পদত্যাগ করব কেন? এর কারণ সহজ ও সরল। আজকের, ভারতে যিনি শ্রেষ্ঠ মানব তিনি খোলাখুলি না বললেও যদি মনে করেন প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার ফলে আমার পদত্যাগ আপনিই আসে, তখন আসন দখল করে থাকা আমি মনে করি আমার বিবেকের বিরোধিতা করা। এই মনোভাবের মূলে হয়তো আছে আপনার প্রতি এবং এই বিষয়ে আপনার অভিমতের প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা।

কোনও কোনও সংবাদপত্র বলতে চাইছে, হয়তো আপনিও ভাবছেন যে পুরোনপন্থীদের আবার দায়িত্ব দেওয়া উচিত। তাই যদি হয় আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি সক্রিয় রাজনীতিতে আবার ফিরে আসুন, কংগ্রেসের চার আনার সভ্য হয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সরাসরি ভার নিন। আপনি ও আপনার পার্শ্বচরদের মধ্যে, এমনকী আপনি ও আপনার যাঁরা প্রিয়পাত্র তাঁদের মধ্যেও আকাশপাতাল পার্থক্য রয়েছে— এই কথা বলার জন্য আমাকে মার্জনা করবেন, কাউকে আক্রমণ করবার জন্য এ কথা বলছি না। এমন অনেক লোক আছে আপনার জন্য যারা সব কিছু করতে পারে— কিন্তু নিজেদের জন্য কিছুই পারে না। আমার এই কথা কি আপনি বিশ্বাস করবেন যে সভাপতি নির্বাচনের সময় কয়েকটি প্রদেশের কিছু কিছু গান্ধীপন্থীও প্রাচীনপন্থীদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আমাকে ভোট দিয়েছিল? এই ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিত্বকে যদি জড়ানো না হত, প্রাচীনপন্থীরা সত্ত্বেও আমাকে তাঁরা সমর্থন করে যেতেন। ত্রিপুরিতে প্রাচীনপন্থীরা কৌশল করে সরে পড়লেন এবং আরও কৌশল করে আমাকে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। (কিন্তু আমার ও আপনার মধ্যে কোনও বিবাদ ছিল না।) পরে তাঁরা বললেন ত্রিপুরিতে তাঁদের বিরাট জয় হয়েছে এবং আমার পরাজয় ঘটেছে। আসলে তাঁদেরও জয় হয়নি, আমারও পরাজয় ঘটেনি। জয় হয়েছিল আপনার (আপনার সঙ্গে লড়াইয়ের কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও) তবে অনিশ্চিত জয়— কিছু পরিমাণে মর্যাদা খুইয়ে জয়লাভ।

কিন্তু আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। আপনি যাতে এগিয়ে এসে সরাসরি ও খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসের কার্যসমূহ পরিচালনা করেন, আমি আপনাকে সেই আবেদন করতে চেয়েছিলাম। তাতে সব কিছু সহজ হয়ে যাবে। প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে যে বিরোধিতা— এবং বিরোধিতা যে আছে তাতে সন্দেহ নেই— তার অনেকটাই আপনি চলে যাবে।

যদি আপনি তা না পারেন, আমার একটি বিকল্প প্রস্তাব আছে। আমরা যা দাবি করে আসছি সেই অনুযায়ী অনুগ্রহ করে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রাম শুরু করে দিন এবং তার সূত্রপাত

করুন ব্রিটিশ সরকারকে চরম পত্র দিয়ে। তা যদি করেন আমরা সকলে সানন্দে আমাদের পদাধিকার ছেড়ে চলে আসব। যদি চান আমরা ওই সব আসন আপনি যাঁকে বলবেন বা বিশ্বাস করবেন তাঁকেই ছেড়ে দেব। কিন্তু আমাদের একমাত্র শর্ত থাকবে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতে হবে। আমার মতো অনেকেই মনে করে যে আজ আমাদের যে সুযোগ এসেছে তা কোনও জাতির জীবৎকালে দুর্লভ। এই কারণেই সংগ্রাম শুরু করতে সাহায্য করতে পারে এমন যে কোনও আত্মত্যাগ করতে আমরা প্রস্তুত।

যদি শেষ পর্যন্ত আপনি বলতে থাকেন যে মিশ্র ক্যাবিনেট অকার্যকর এবং সমমতাবলম্বী ক্যাবিনেট ছাড়া আমাদের অন্য কোনও উপায় নেই, এবং যদি আপনি চান আমি আমার পছন্দমতো ক্যাবিনেট গঠন করি, আমি তা হলে আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করব পরবর্তী কংগ্রেস পর্যন্ত আপনি আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোট আমাকে দিন। ইতিমধ্যে আমরা যদি আমাদের সেবা ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে না পারি, তা হলে কংগ্রেসের কাছে আমরা হব ধিক্কৃত এবং স্বাভাবিক ও সমুচিতভাবে আমাদের দায়িত্বের পদ থেকে বিতাড়িত হব। বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোটের অর্থ এ. আই. সি. সি.-র আস্থাজ্ঞাপক ভোট। আপনি যদি আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোট আমাদের না দেন, এবং একই সঙ্গে আমাদের বলেন একমতাবলম্বী ক্যাবিনেট গঠন করতে, আপনি তা হলে পন্থ প্রস্তাবকে কার্যকর করবেন না।

আরেকবার আমি আপনাকে জানাতে অনুরোধ করছি, মিশ্র ক্যাবিনেট গঠনে আপনার বিরোধিতার কারণ নীতিগত, না ২৫ মার্চ তারিখের আমার প্রথম চিঠিতে আমি ক্যাবিনেটে প্রাচীনপন্থীদের যত সংখ্যক প্রতিনিধি রাখার কথা বলেছিলাম আপনি তার চাইতে আরও বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি রাখতে চান।

আমি এই চিঠি শেষ করবার আগে দু-একটি ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই। আপনি একটি চিঠিতে মন্তব্য করেছেন, আপনি আশা করেন, যাই ঘটুক "আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অটুট থাকিবে।" আমিও মনেপ্রাণে সেই আশা পোষণ করি। এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলতে চাই, জীবনে যদি আমার গর্ব করবার মতো কিছু থাকে তা এই যে, আমি ভদ্রলোকের সন্তান এবং সেই কারণে আমিও ভদ্রলোক। দেশবন্ধু দাশ প্রায়ই আমাদের বলতেন "জীবন রাজনীতি থেকে অনেক বড়।" এই শিক্ষা আমি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমি এক দিনের জন্যও থাকব না যদি থাকার ফলে ভদ্রতার মানদণ্ড থেকে আমার পতন ঘটে। এই ভদ্রতা বোধ শিশুকাল থেকে আমার মজ্জাগত এবং তা আমার রক্তের মধ্যে মিশে আছে, আমি মনে করি। আমার জানার উপায় নেই মানুষ হিসাবে আপনি আমাকে কিভাবে দেখেন, আপনি আমাকে কতটুকুই বা দেখেছেন। তা ছাড়া আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা আমার নামে কত না কাহিনী আপনার কানে তুলে চলেছে। কয়েক মাস হল আমি জানতে পেরেছি, কিছুকাল থেকে আমার নামে মুখে মুখে সূক্ষ্ম অথচ দুরভিসন্ধিমূলক রটনা চলেছে। বহু আগেই আমি এই বিষয়টি আপনার নজরে আনতাম কিন্তু কে বলছে এবং কী বলা হচ্ছে তার যথেষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে আমি তা পারিনি। কী বলা হয়েছে সে সম্পর্কে সম্প্রতি অনেক কিছু আমি জানতে পেরেছি, যদিও রটনাকারী কারা সঠিকভাবে এখনও তা জেনে উঠতে পারিনি।

আবার আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছি। একটি চিঠিতে আপনি আশা প্রকাশ করেছেন, আমি যাই করি না কেন, আমি "ভগবানের নির্দেশে যেন চালিত হই।" মহাত্মাজি, আপনি বিশ্বাস করুন, এই ক'দিন ধরে আমি কেবল একটি প্রার্থনা করে চলেছি— একটু আলোর প্রার্থনা— যে আলো আমায় দেখিয়ে দেবে আমার দেশ ও দেশের স্বাধীনতার পক্ষে কোন পথ শ্রেষ্ঠ। সেরকম প্রয়োজন ও কারণ দেখা দিলে যাতে নিজেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারি তারজন্য শক্তি ও

প্রেরণা কামনা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একটি জাতি বেঁচে থাকতে পারে, যতক্ষণ যে ব্যক্তিদের নিয়ে সেই জাতি গঠিত তারা যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে জাতির স্বার্থে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত থাকবে। এই নৈতিক (অথবা আত্মিক) হারাকিরি সহজ নয়। কিন্তু দেশের স্বার্থে যখনই প্রয়োজন দেখে দেবে ভগবান যেন তা করবার মতো শক্তি আমাকে দেন।

আশাকরি আপনার স্বাস্থ্যের যেরকম উন্নতি হচ্ছে তা বজায় থাকবে। ধীরে ধীরে আমি সুস্থ হয়ে উঠছি।

সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা)

লগোরা, ৭ এপ্রিল ১৯৩৯

আজ রাজেনবাবুর সহিত আপনার টেলিফোনে কথার সূত্র ধরিয়া আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই দিল্লি ছাড়িয়া রাজকোট রওনা হইবার পূর্বে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন। ইহাতে খুব বেশি হইলেও আপনার তিন দিন দেরি হইবে। আমাদের পত্রালাপ মীমাংসার দিকে যাইতেছে না এবং আমার মনে হয় সামনাসামনি আলাপে ব্যাপারটা খুবই সহজ হইবে। সাক্ষাতের স্থান সম্পর্কে স্বাস্থ্যের কারণে আপনার এখানে আসা সম্ভব না হইলে আমি ত্রিপুরির ক্ষেত্রে যেরূপ করিয়াছিলাম ডাক্তারদের অমান্য করিয়া দিল্লি আসিতে প্রস্তুত আছি। আমি মনে করি ওয়ার্কিং কমিটির সমস্যা মীমাংসা করিতে এবং কংগ্রেস ঐক্য রজায় রাখিতে স্বাস্থ্য বিপন্ন করিয়াও আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করা আবশ্যক। পরবর্তী এ. আই. সি. সি. পর্যন্ত ব্যাপারটি অমীমাংসিত রাখিলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিবে এবং অনিশ্চয়তা ও বিলম্ব সাধারণের মনে আরও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবে।

—সুভাষ

বসুকে (তারবার্তা)

নূতন দিল্লি, ৭ এপ্রিল ১৯৩৯

তোমার টেলিফোন বার্তা। রাজকোট-কাজের তাগিদে আজ রাতে রাজকোট যাইতেছি। অব্যবহিত কর্তব্যে অবহেলা হইবে বলিয়া স্থগিত রাখা গেল না, কিন্তু যে মুহূর্তে রাজকোট হইতে ছুটি পাইব তুমি যাহা বলিবে করিব। ইতিমধ্যে আমি বলিতেছি আমার উপদেশ মানিয়া ক্যাবিনেট গঠন করো এবং তোমার কার্যক্রম জানাইয়া দাও। রবিবার প্রাতে রোজকোট পৌঁছাইতেছি। ভালবাসা।

—বাপু

বসুকে (তারবার্তা)

৭ এপ্রিল ১৯৩৯

তোমার তারবার্তা। আমি অসহায়। রাজকোট আমাকে যাইতেই হইবে। শরৎকে বা তোমার অন্য কোনও প্রতিনিধিকে রাজকোট পাঠাইবার প্রস্তাব করি। সে বিমানে যাইতে পারে। দশদিনের আগে রাজকোট হইতে অব্যাহতি আশা করি না। ভালবাসা।

—বাপু

মহাত্মা গান্ধীকে

জিয়ালগোরা
১০ এপ্রিল ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজি,

সাধারণভাবে কংগ্রেসের ব্যাপারে এবং বিশেষ করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে অনেকগুলি টেলিগ্রাম ও ছোট ছোট চিঠি ছাড়াও আমি আজ অবধি ২৫ মার্চ (২৬ তারিখে ডাকে দেওয়া হয়েছে), ২৯ মার্চ, ৩১ মার্চ ও ৬ এপ্রিল তারিখে চারটি জরুরি চিঠি আপনাকে লিখেছি। এতদিন ধরে চিঠিপত্র চালাতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত। একটি দীর্ঘ চিঠিতে সব কথা বলতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু তাতে দুটি অসুবিধা ছিল—প্রথমত, একটি দীর্ঘ বিস্তারিত চিঠি লেখার আনুষঙ্গিক পরিশ্রম এবং দ্বিতীয়ত, আপনার চিঠিগুলিতে নতুন নতুন প্রসঙ্গ, যার উত্তর দেওয়া আমার দরকার। আশা করি এই পর্যায়ে এটিই আমার শেষ চিঠি হবে। এটিতে আমি চেষ্টা করব এমন কিছু বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করতে যেসব বিষয়ে আমাকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে এবং সেইসঙ্গে আমার আগেকার চিঠিগুলির প্রধান প্রধান বক্তব্যের সারাংশ আরেকবার বলতে এবং আপনার কাছে আমার চূড়ান্ত আবেদন ও নিবেদন জানাতে।

(১) **প্রসঙ্গ: হিংসা ও দুর্নীতি:** যদি আপনাকে আমি ঠিকমতো বুঝে থাকি, আপনি চরমপত্র দেবার এবং অবিলম্বে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার বিপক্ষে; যেহেতু আপনি মনে করেন আমাদের মধ্যে দুর্নীতি ও হিংসার মনোভাব প্রবল। আমরা ওয়ার্কিং কমিটিতে গত কয়েকমাস ধরে দুর্নীতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে আসছি এবং আমার মনে হয় এই প্রশ্নটিতে আমরা সাধারণভাবে সবাই একমত—তবে একটু তফাত আছে, আমি মনে করি না তার মাত্রা এতখানি যে তার ফলে পূর্ণ স্বরাজের জন্য অবিলম্বে সংগ্রাম করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। অপরপক্ষে নিয়মতান্ত্রিকতার স্রোতে যতই আমরা গা ভাসিয়ে দেব, যতই আমাদের লোকেরা সরকারি আয়েস ও আরামের স্বাদ পাবে, তত বেশি দুর্নীতি বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। অধিকন্তু আজকের ইউরোপের রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছুটা জানি, হয়তো একথা আমি বলতে পারি এবং কোনও প্রতিবাদের আশঙ্কা না করে আমি দাবি করতে পারি, নৈতিক দিক থেকে বিচার করলে আমরা কোনও অংশে তাদের চেয়ে হেয় নই, বরঞ্চ কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমাদের স্থান তাদের উঁচুতে। অতএব দুর্নীতির ভূত আমার কাছে তেমন ভয়াবহ বলে মনে হয় না। বরঞ্চ দেশের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে আরও বেশি স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণ করার আহ্বানই হবে দুর্নীতির প্রতিবিধান এবং আমাদের দলের মধ্যে কোনও দুর্নীতিকারী যদি অনুপ্রবেশ বা প্রাধান্য লাভ করে থাকে এরই মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের কাছে তার স্বরূপ প্রকাশ

হয়ে পড়বে। নজির হিসাবে বলা যেতে পারে, ইতিহাসে এমন অনেক বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিবিদের দৃষ্টান্ত আছে যাঁরা ঘরের শত্রুকে উচ্ছেদ করবার জন্য বাইরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

(২) প্রসঙ্গ: হিংসার মনোভাবের অস্তিত্ব: আমার আগের বিবৃতিতে যা বলেছি এখনও তাই বলছি। যাঁরা কংগ্রেসসেবী এবং কংগ্রেসের সমর্থক তাঁদের মধ্যে মোটের উপর আগের চাইতে এখন হিংসা কম। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে মতভেদের ক্ষেত্রে আমার দিক থেকে যা কিছু যুক্তি আমি এর আগেই আপনাকে বলেছি, তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। হতে পারে, কংগ্রেস-বিরোধীদের মধ্যে আজ হিংসার মনোভাব রয়েছে যার ফলে দাঙ্গা হচ্ছে এবং কংগ্রেস সরকারগুলিকে তা সবলে দমন করতে হচ্ছে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় এবং তা থেকে এই ধারণা পোষণ করা সমীচীন হবে না যে, কংগ্রেসসেবী বা তাদের সমর্থকদের মধ্যে হিংসার মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য যে সকল সংগঠনের সঙ্গে আমাদের কোনওই সম্পর্ক নেই—যেমন মুসলিম লিগ—তারা যতদিন পর্যন্ত মনোভাবে এবং কাজে অহিংস না হয়ে উঠছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে স্থগিত রাখতে হবে, এটা বাড়াবাড়ি নয় কি?

(৩) প্রসঙ্গ: পণ্ডিত পন্থ প্রস্তাব: আমি জানতে চেয়েছিলাম, পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ প্রস্তাবটি যে আকারে উত্থাপন করেছিলেন এবং যে আকারে তা শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে আপনি কি তা অনুমোদন করেন, না, আমরা যেমন বলেছিলাম, যেমন হলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হত, কমবেশি সেই আকারে প্রস্তাবটি হলে আপনি বেশি পছন্দ করতেন। আমি আরও জানতে চাই, আপনি প্রস্তাবটিকে আমার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট বলে গণ্য করেন কিনা। আপনার সুবিধার জন্য প্রস্তাবটির মূল রূপ এবং তার একটি সংশোধিত রূপ নীচে দিচ্ছি।

মূল রূপ

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাবলী লইয়া বাদ-প্রতিবাদের দরুন কংগ্রেসে এবং দেশের মধ্যে যে নানাপ্রকার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কংগ্রেসের পক্ষে অবস্থাটি বিশদভাবে বুঝাইয়া তাহার সাধারণ নীতি ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয়।

(১) বিগত বৎসরগুলিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে মৌলিক নীতি কংগ্রেসের কার্যক্রম পরিচালিত করিয়াছে কংগ্রেস তাহার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে এবং এই সুনিশ্চিত অভিমত পোষণ করিতেছে যে এইসব মূলনীতি হইতে সরিয়া যাওয়া কখনওই উচিত হইবে না এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কার্যক্রম তাহার দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। এই কংগ্রেস গত বৎসর যে ওয়ার্কিং কমিটি কার্যরত ছিল তাহার কাজে আস্থা প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করা হইয়া থাকিলে দুঃখিত।

(২) আগামী বৎসরে যে সংকটাপন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং এইরূপ সংকটে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই দেশকে ও কংগ্রেসকে জয়লাভের পথে চালিত করিতে পারেন, ইহাও স্মরণে রাখিয়া কংগ্রেস আবশ্যিক বলিয়া মনে করে যে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক অঙ্গ তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হওয়া দরকার এবং প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছে, তিনি যেন গান্ধীজির ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাবলী লইয়া বাদ-প্রতিবাদের দরুণ কংগ্রেসের এবং দেশের মধ্যে যে নানাপ্রকার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কংগ্রেসের পক্ষে অবস্থাটি বিশদভাবে বুঝাইয়া তাহার সাধারণ নীতি ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয়।

(১) বিগত বৎসরগুলিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে মৌলিক নীতি কংগ্রেসের কার্যক্রম পরিচালিত করিয়াছে কংগ্রেস তাহার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে এবং এই সুনিশ্চিত অভিমত পোষণ করিতেছে যে এইসব মূল নীতি হইতে সরিয়া যাওয়া কখনওই উচিত হইবে না এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কার্যক্রম তাহার দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। এই কংগ্রেস গত বৎসর যে ওয়ার্কিং কমিটি কার্যরত ছিল তাহার কাজে আস্থা প্রকাশ করিতেছে।

(২) আগামী বৎসরে যে সংকটাপন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কংগ্রেস অতীতের মতো ভবিষ্যতেও মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনা ও সহযোগিতা অপরিহার্য বলিয়া মনে করে।

(৩) **প্রসঙ্গ: কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি:** ৩১ মার্চ তারিখের আমার চিঠিতে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি সম্পর্কে যে মন্তব্য ছিল তা সেই সময়কার সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও মতামত থেকে আমার যা ধারণা হয়েছিল তারই ভিত্তিতে করেছিলাম। আমরা ধারণা হয়েছিল সি এস পি-র পদস্থ নেতারা তাদের দ্বিধাগ্রস্ত নীতি চালিয়ে যাবে এবং তার ফলে ভবিষ্যতে তাদের নতুন এক নীতি গ্রহণ করতে হতে পারে, যথা, প্রাচীনপন্থীদের সমর্থন করার নীতি। আমি মনে করেছিলাম, আপনি হয়তো ভুল বুঝে ভাবতে পারেন, সম্পূর্ণ সি এস পি দলত্যাগ করে প্রাচীনপন্থীদের আওতায় চলে যাবে। এইজন্যই আমি আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম, উপরকার নেতৃত্ব যাই করুক তৎসত্ত্বেও সি এস পি-র একটি বিরাট অংশ আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমি একথা বলতে পেরেছিলাম তার কারণ ত্রিপুরিতে নেতাদের নিরপেক্ষ নীতির কী ফল তাদের অনুগামীদের উপর ফলেছিল আমি তা শুনেছিলাম। কয়েকটি প্রদেশ বিদ্রোহ করেছিল—সাধারণ কর্মীরাও তাতে ছিল—তাদের মধ্যে অনেককেই নৈতিক চাপে পড়ে অথবা নিয়মশৃঙ্খলাবোধে নেতাদের ফতোয়া মেনে নিতে হয়েছিল। আপনাকে চিঠি লেখার পরে আমার কাছে যে খবর এসে পৌঁছিয়েছে তাতে সি এস পি-র পদস্থ নেতাদের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে খবরের কাগজ থেকে আমি যে ধারণা করেছিলাম, তা আর টেকে না এবং তা হলে পার্টির ভিতরে ফাটলের প্রশ্ন একেবারেই ওঠে না।

(৪) **প্রসঙ্গ: সমমতাবলম্বী বনাম মিশ্র ক্যাবিনেট:** এই বিষয়ে আপনার যুক্তিগুলি আমি সযত্নে পড়েছি এবং বিবেচনা করে দেখেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি আপনার কথা মেনে নিতে পারিনি। সম্ভবত আপনার অন্য আরও যুক্তি আছে যা আপনার কথা মেনে নিতে আমাকে সাহায্য করত। আপনার প্রধান বক্তব্য, মৌলিক বিষয়ে আমাদের মধ্যে এত বেশি প্রভেদ যে মিলিতভাবে কাজ করা অসম্ভব। হরিপুরা কংগ্রেসে আপনার মত আমাদেরই মতো ছিল এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে পর্যন্ত মিলিতভাবে কাজ করা সম্ভবপর ছিল। তারপর কী এমন ঘটেছে যার দরুণ তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল? এবং আপনার মতে মৌলিক বিষয়ে আমাদের মধ্যে প্রভেদই বা কীসে?

আমি আরও জানতে চাই, মিশ্র ক্যাবিনেট সম্পর্কে আপনার আপত্তির কারণ কি সম্পূর্ণ নীতিগত, না, গত ২৫ মার্চ তারিখে আপনাকে লেখা আমার প্রথম চিঠিতে যে আধাআধি ভাগের কথা বলেছিলাম, তাও। সেই চিঠিতে আমি প্রস্তাব করেছিলাম, আপনার অনুমোদনের জন্য আমি সাতজনের নাম দিই, সর্দার প্যাটেলও সাতজনের নাম দিন। ওই অনুপাত যদি আপনি

মেনে নেন, পুরোপুরি চোদ্দোজনের নামও আপনি প্রস্তাব করতে পারেন। যদি আপনি ওই অনুপাত মানতে না পারেন এবং তাই যদি সর্বসম্মত মিশ্র ক্যাবিনেট গঠনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, অনুগ্রহ করে তা আমাকে জানালে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবার আমি একটা সুযোগ পাই।

(৫) **প্রসঙ্গ: শ্রীশরৎ বসুকে দেওয়া উপদেশ:** গত ২৪ মার্চ তারিখে আপনি আমার দাদাকে লেখা চিঠিতে লিখেছেন: "অতএব আমি প্রস্তাব করি হয় তোমরা সকলে একটি বৈঠকে মিলিত হও যাহাতে নিজেদের মনে যাহা কিছু আছে পরস্পরের কাছে খুলিয়া বলিয়া একটা বোঝাপড়ায় আসিতে পারো, অথবা বিভেদের বিষ যদি এতই গভীরে যাইয়া থাকে যে তাহা দূর করা অসম্ভব তাহা হইলে..." আপনার পরবর্তী চিঠিগুলিতে এই নিয়ে আর কিছু বলেননি। আমি একাধিকবার আপনাকে লিখে জানিয়েছি যে, কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনবার জন্যে চরম প্রয়াস করতে আমাদের দিক থেকে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি আরও বলেছি, আমাদের দিকে আমি ছাড়া আরও অনেকে আছে যারা আপনাকে কোনও দলীয় বলে মনে করে না এবং দ্বন্দ্বরত দলগুলিকে মেলাবার জন্যে আপনার উপরেই ভরসা করে। আমি আরও একটু বাড়িয়ে বলতে পারি, কেবল প্রাচীনপন্থী ও তাঁদের অনুগামীদের গান্ধীবাদী মনে করার কোনও কারণ আপনার নেই। সমস্ত কংগ্রেসকেই আপনি গান্ধীবাদী বলে মনে করতে পারেন, শুধু যদি আমাদের কিছু কিছু পরিকল্পনা ও ধারণাকে আপনি মেনে নেন।

(৬) **প্রসঙ্গ: আমার বিকল্প প্রস্তাব:** (ক) আমার প্রথম প্রস্তাব আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম পুনরায় শুরু করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। সে অবস্থায় আমরা এখন যে যে পদাধিকারে আছি তা ত্যাগ করা ছাড়াও আমাদের যে-কোনও প্রকার স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন বোধ করবেন, আপনি তা দাবি করতে পারেন। সংগ্রাম যদি আবার শুরু হয় বিনাশর্ত্তে আমরা তা সমর্থন করব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

(খ) যদি আপনি মনে করেন সংগ্রাম শুরু করা সম্ভব নয় এবং যদি আপনি প্রাচীনপন্থীদের গদিতে বসাতে চান—আমি তবে বলব আপনি আবার কংগ্রেসের চার আনার সদস্য হয়ে ওয়ার্কিং কমিটির ভার প্রত্যক্ষভাবে নিজে গ্রহণ করুন। তাতে অনেক অসুবিধার লাঘব হবে। আপনি যদি নিজেকে বাইরে রেখে কেবলমাত্র প্রাচীনপন্থীদের আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন তা হলে ওই অসুবিধাগুলি থেকে যেতে বাধ্য।

(গ) এই প্রস্তাবও যদি আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় এবং আপনি আমাকে এ-সত্ত্বেও যদি সমমতাবলম্বী ক্যাবিনেট গঠন করবার উপদেশ দিতে থাকেন তা হলে পরবর্তী কংগ্রেস পর্যন্ত আমাকে আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোট দেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করব। আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোটের ফলে এ. আই. সি. সি.-তে আপনার 'গোঁড়া' অনুগামীদের সমর্থন পাওয়া সুনিশ্চিত হবে। তাতে ভাঙন রোধ করা যাবে এবং অবাধে কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে। এই প্রসঙ্গে ৬ এপ্রিল তারিখে লেখা আমার শেষ চিঠিতে আমি আপনাকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটিকে কেবলমাত্র আপনার ইচ্ছানুসারেই গঠন করলে হবে না, তা এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে তা আপনার সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হয়। এই প্রস্তাব একবার যদি গ্রাহ্য করেন, আপনার পক্ষে এমন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেওয়া চলে না যা আপনার সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হবে না।

(ঘ) এই তিনটি প্রস্তাবই যদি আপনি প্রত্যাখ্যান করেন, তা হলে আপনার একটিমাত্র পথই খোলা রইল—ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নেওয়া। আপনার সিদ্ধান্ত জানবার পর আমাকেই তখন আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে নিতে হবে।

(৭) **প্রসঙ্গ: আপনার মৌনতা:** আপনি আপনার কোনও এক চিঠিতে বলেছেন, আপনি মৌন

অবলম্বন করছেন, যেহেতু আমি তা করতে আপনাকে অনুরোধ করেছি। কেন অনুরোধ করেছিলাম আমার বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। ত্রিপুরিতে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল, একজন কংগ্রেসকর্মীর সঙ্গে আর একজন কংগ্রেসকর্মীর ব্যবধান এত বিরাট হয়েছিল যে তখন আমি বোধ করছিলাম সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখবার একমাত্র ভরসা আপনি। সেসময় আমার মনে হয়েছিল, সমগ্র পরিস্থিতিটা নিরাবেগ ও নিরপেক্ষভাবে দেখা আপনার পক্ষে প্রয়োজন। পন্থ প্রস্তাবের সমর্থকদের নতুন দিল্লিতে যাবার তাড়া দেখে স্বভাবত আমি ভেবেছিলাম ত্রিপুরির ঘটনাবলীর একতরফা বিবরণ দিয়ে তারা আপনাকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করবে। সেই কারণে আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম ত্রিপুরির সম্পূর্ণ ব্যাপারটা—অর্থাৎ যা ঘটেছে তার বিভিন্ন ভাষ্য—শোনার আগে কোনও বিবৃতি যেন না দেন কিংবা প্রকাশ্য উক্তি না করেন। আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন বলে আমি আপনার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এর ফল হয়েছে এই যে, সারা দেশ এখনও আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে যাতে আপনি কোনওক্রমে আমাদের কর্মীদের মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনেন এবং কংগ্রেসকে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা করেন। ভগবান না করুন, দুর্ভাগ্যক্রমে যদি সেই সময় আসে যখন আপনি সবকিছু দলীয় দৃষ্টিতে দেখে বিচার করছেন, তা হলে ঐক্যের সব আশা ধূলিসাৎ হবে এবং যতদূর মনে হয় আমরা এক গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব।

কিন্তু এখন আমার বোধ হচ্ছে আপনার মুখ বন্ধ করে রাখা আমার উচিত হচ্ছে না। অতএব, যদি আপনি বোঝেন আপনার মুখ খোলা উচিত—অথবা আপনি মনে করেন ত্রিপুরির ঘটনা সম্পর্কে সবার বক্তব্য আপনার শোনা হয়ে গেছে—আপনার ইচ্ছামতো প্রকাশ্যে যেকোনও বিবৃতি দিতে বা উক্তি করতে পারেন। আমি কেবলমাত্র আপনাকে অনুরোধ করব, সকল পর্যায়ের কংগ্রেসকর্মীরা (কেবলমাত্র প্রাচীনপন্থীরাই নয়) আপনাকে কীভাবে দেখে এবং আপনার কাছ থেকে কী আশা করে তা মনে রাখবেন।

পরিশেষে, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ৭ তারিখে হঠাৎ আপনার রাজকোটে যাত্রার ঠিক আগে দিল্লি থেকে আপনার টেলিগ্রামগুলি পেয়ে আমি অত্যন্ত নিরাশ হই। আমার মনে হয়েছিল আমাদের মধ্যে পত্রালাপ কোনও মীমাংসার দিকে যাচ্ছে না এবং খোলাখুলি কথাবার্তা বলা দরকার। এই কারণে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হই। আমার এই অবস্থা আপনাকে জানাতে ৭ তারিখ সকালে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমার পক্ষ থেকে বিড়লা ভবনে টেলিফোন করেন। ওইদিনই আরও বেলায় আমার ডাক্তারও বিড়লা ভবনে টেলিফোন করেন। অপর প্রান্ত থেকে শ্রীমহাদেব দেশাই তাঁকে বলেন আপনি এখানে আসতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন এবং যাই হোক না কেন, পরের দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৮ তারিখের আগে আপনি দিল্লি ত্যাগ করছেন না। কিন্তু রাজকোট আপনাকে নিয়ে গেল দেখে আমি মর্মাহত হয়েছি। আমি শুধু এইটুকু কামনা করতে পারি, রাজকোটের পক্ষে যা আশীর্বাদ হবে তা কংগ্রেসের পক্ষে অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারিতে রাজকোট যদি হঠাৎ আপনাকে না নিয়ে যেত, তা হলে ত্রিপুরি কংগ্রেসের ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হত। সেই পরিস্থিতিতে সবদিক রক্ষা করবার ক্ষমতা আপনারই ছিল, কিন্তু আমার ও রিসেপশন কমিটির বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনাকে পাওয়া গেল না। সত্যি কথা বলতে কি, আপনি যখন ঠাকোর সাহেবকে চরমপত্র পাঠালেন, সারা দেশ তখন স্বভাবত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাকে সমর্থন জানিয়েছিল, ঠিকই, তবু কিন্তু আপনার দেশবাসীর একটি বড় অংশ তখন ভেবেছিল এবং এখনও ভাবে, রাজকোট রাজ্যের প্রজাদের স্বার্থের কোনও ক্ষতি না করেই আপনি রাজকোট সংগ্রামকে কয়েক সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখতে পারতেন।

স্যার মরিস গয়ারের রায় সম্পর্কে একটি বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই,

তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সামর্থ্যে রায়টি সই করেননি। করেছেন ভারতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে।

আমার চিঠি এরই মধ্যে অনেক বড় হয়ে গেছে; অতএব এখানেই আমার থামা উচিত। আশাকরি, পথের কষ্ট আপনি সহ্য করতে পেরেছেন এবং আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি অব্যাহত আছে। আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছি।

প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীর পত্র

রাজকোট
১০ এপ্রিল ১৯৩৯

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ৬ তারিখের পত্র এখানে ফেরত পাঠানো হইয়াছে। আমি চাহিয়াছিলাম প্রতিবাদীরা মিলিত হইয়া খোলাখুলিভাবে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করিয়া নিক। কিন্তু ইত্যবসরে এত কিছু ঘটিয়া গিয়াছে যে ইহাতে কোনও ফল হইবে কিনা আমি জানি না। তাহারা কেবল পরস্পরকে কটুকাটব্য করিবে এবং তিক্ততা যাহা আছে তাহা আরও তিক্ত হইয়া উঠিবে। ব্যবধান খুবই বিস্তৃত, সন্দেহ অত্যন্ত গভীর। সকলকে এক করিবার কোনও উপায় দেখিতেছি না। আমার নিকট একমাত্র পন্থা মনে হইতেছে বিভেদ স্বীকার করিয়া লওয়া এবং প্রতিটি দলকে নিজ মতে কাজ করিতে দেওয়া।

মিলিতভাবে কাজ করিবার জন্য বিবদমান সকলকে একত্রিত করার পক্ষে নিজেকে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে হইতেছে। সমুচিত মর্যাদা রক্ষা করিয়া তাহারা তাহাদের নীতিকে কার্যকর করুক আমার এইমাত্র আশা করা উচিত। যদি তাহারা তাই করে, তাহাতে দেশের মঙ্গল হইবে।

পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব আমি ব্যাখ্যা করিতে পারিব না। যতই তাহা পড়িতেছি ততই তাহা খারাপ লাগিতেছে। যাহারা রচনা করিয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্য ভালই ছিল। কিন্তু তাহা বর্তমান সংকটের উপযোগী নয়। অতএব তুমি ইহাকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করিও এবং বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সেইমতো কাজ করিয়া যাও।

আমি তোমার উপরে একটি ক্যাবিনেট চাপাইয়া দিতে পারি না, দিবও না। আরোপিত ক্যাবিনেট অবশ্যই তুমি মানিয়া লইবে না, তোমার ক্যাবিনেটকে এবং নীতিকে এ. আই. সি. সি. অনুমোদন করিবে এরূপ নিশ্চয়তাও আমি দিতে পারি না। তাহাতে অপরের মত দমন করা হইবে। সদস্যরা তাঁহাদের নিজেদের বিবেচনা বোধে চালিত হোন। তুমি যদি ভোট না পাও, সংখ্যাগরিষ্ঠকে যতদিন না স্বমতে আনিতে পারিতেছ ততদিন বিরোধীপক্ষকে পরিচালিত করো।

তুমি কি জানো না, যেখানে আমার প্রভাব আছে, আমি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়াছি? জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত ত্রিবাঙ্কুর এবং জয়পুর। এমনকী রাজকোটের (আন্দোলনও) আমি এখানে আসিবার পূর্বে বন্ধ করিয়া দিয়াছি। আমি আবার বলিতেছি, বাতাসে আমি হিংসার

আঘ্রাণ পাইতেছি। অহিংসভাবে কিছু করিবার পরিবেশ আমি দেখিতেছি না। রামপুরের শিক্ষা কি তুমি পাও নাই? আমার মতে তাহাতে আদর্শের নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি তাহা ছিল পূর্বকল্পিত। তাহার জন্য কংগ্রেস কর্মীরাই দায়ী, ওড়িশার রামপুরেও যেমন তাহারাই দায়ী ছিল। দেখিতেছ না আমরা দুইজনে অকপটভাবে একই বস্তু ভিন্নরূপে দেখিতেছি, এমনকী ভিন্ন সিদ্ধান্তেও আসিতেছি? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কী উপায়ে আমরা মিলিত হইতে পারি? ওই ক্ষেত্রে আমাদের মতপার্থক্য আমাদের মানিয়া লওয়াই উচিত। আমরা সামাজিক, নৈতিক ও পৌরক্ষেত্রে মিলিত হইতে পারি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র আমি যোগ করিতে পারিলাম না, কারণ সে ক্ষেত্রেও আমাদের মধ্যে যে মতভেদ আছে তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি।

আমরা দৃঢ় বিশ্বাস, যেসব বিষয়ের মধ্যে আপস অসম্ভব, জোর করিয়া তাহা হইতে সাধারণ একটি নীতি ও কার্যক্রম খাড়া করিয়া বিভিন্ন দলকে সেইভাবে কাজ করিতে বলিবার চাইতে আমরা যদি আমাদের নিজস্ব মতে নিজ নিজ ধারায় কাজ করিয়া যাই, তাহা হইলে আরও ভালভাবে দেশের সেবা করতে পারিব।

ধানবাদ যাইতে যে আমি একেবারেই অক্ষম—দিল্লি হইতে তাহা তোমাকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছি, রাজকোটকে অগ্রাহ্য করিবার আমার উপায় নাই।

আমি ভাল আছি। বা ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। আজ পঞ্চম দিন। আমি তাঁহাকে আমার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, আসার আগেই জ্বর শুরু হইয়াছে।

আমি কামনা করি, স্থির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিয়া তুমি তোমার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবে। ফলের ভাবনা ভগবানের উপর ছাড়িয়া দাও। তোমার পিতার সম্পর্কে যাহা বলিয়াছ তাহা মর্মস্পর্শী। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হইয়াছিল। একটি জিনিস আমি ভুলিয়া যাইতেছি। কেহ আমাকে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করায় নাই। আমি সেবাগ্রামে তোমাকে যাহা বলিয়াছি তাহা আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য। যদি তুমি মনে করো, প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে তোমার ব্যক্তিগত শত্রু একজনও আছে, তাহা হইলে তুমি ভুল করিবে।

ভালবাসা জানিয়ো।

বাপু

মহাত্মা গান্ধীকে

পোঃ জিয়ালগোরা
জেলা মানভূম
১৩ এপ্রিল ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজি,

ভেবেছিলাম আমার ১০ তারিখের চিঠিই শেষ চিঠি হবে, কিন্তু হবার নয়। আজ আমি অনেক ভোরে উঠেছি এবং যেহেতু ঘুম আমাকে ত্যাগ করেছে ভোরের আলো-আঁধারি নিস্তব্ধতায় আমাদের সাধারণ সমস্যাগুলির কথা মনে আসছে। আমাদের সমস্ত চিঠিপত্র আবার আমি পড়ে দেখলাম। দেখছি আরও কয়েকটি বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

৩০ মার্চ তারিখের আপনার চিঠিতে আপনি বলেছেন যে, ১৫ ফেব্রুয়ারি সেবাগ্রামে আমরা মেনে নিয়েছিলাম মৌলিক প্রশ্নে আমাদের মতভেদ আছে। আমাদের আলোচনা সূত্রে কিছু কিছু মতপার্থক্য আমরা আবিষ্কার করি ঠিকই, তবে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না তাকে মৌলিক প্রশ্নে মতভেদ বলা যায় কিনা। আপনি এখন আপনার চিঠিগুলিতে যে বিষয়গুলির কথা বলেছেন তার অধিকাংশ বা অনেকগুলি আপনি তখন বলেছিলেন। যেমন, দুর্নীতি, হিংসা, ইত্যাদি সম্পর্কে আপনার যা মত তখন তা বলেছিলেন এবং চরমপত্র দেওয়া ও স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করা বিষয়ে আমার বক্তব্যকে আপনি তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন—যেহেতু আপনার মনে হয়েছিল অহিংস গণ-আন্দোলনের উপযোগী পরিবেশ নেই। কিন্তু এই মতপার্থক্যগুলি কি মৌলিক এবং সেগুলি কি এমনই যার দরুণ আমাদের মিলিতভাবে কাজ করবার সব আশা ত্যাগ করতে হবে? কার্যক্রমের প্রশ্নে কংগ্রেসই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমরা স্বতন্ত্রভাবে আমাদের ধারণা ও পরিকল্পনা পেশ করতে পারি— তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার কংগ্রেসের। চরমপত্র দেওয়া ও স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করা বিষয়ে আমার আসল প্রস্তাবটি ত্রিপুরি কংগ্রেসেই নাকচ হয়ে গেছে, কিন্তু সেই কারণে আমার কোনও আক্ষেপ নেই। এই প্রকার বিলম্ব গণতন্ত্রের সহজাত। আমি এখনও বিশ্বাস করি, আমি ঠিকই করেছিলাম এবং কংগ্রেস একদিন তা উপলব্ধি করবে। আমি কেবল এইটুকু আশা করি, তখন বড় বেশি দেরি না হয়ে যায়। এইসব মতপার্থক্য রয়েছে স্বীকার করেও কেন আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারব না? এই মতপার্থক্যগুলি আজ হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। সেগুলি কিছুকাল থেকেই আছে, তা সত্ত্বেও আমরা মিলেমিশে কাজ করেছি। এইসব বা এইরকম মতপার্থক্য ভবিষ্যতেও থাকবে এবং তখনও আমাদের একইভাবে চলতে হবে (অর্থাৎ সাধারণ স্বার্থে মিলেমিশে কাজ করতে হবে)।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, সেবাগ্রামে আমরা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে কেবলমাত্র মিশ্র বনাম সমমতাবলম্বী ক্যাবিনেট প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, কিন্তু আমাদের মতের মিল হয়নি তা মেনে নিতে হয়েছিল। আমাদের তিন ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনার শেষের দিকে আমি বলেছিলাম, সব সত্ত্বেও সর্দার প্যাটেল ও আর সবার সঙ্গে পরে যখনই আমার দেখা হবে তাঁদের সহযোগিতা লাভের জন্য আমি একবার শেষ চেষ্টা করব। আমি যদি অসুস্থ হয়ে না পড়তাম এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আমাদের যদি দেখা হত তা হলে মিলিতভাবে কাজ করা হয়তো অনেক সহজসাধ্য হত।

আপনার ৩০ মার্চ তারিখের চিঠিতে আরও একটি মন্তব্য আছে যার সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। আগে সে সম্পর্কে উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। আপনি কার্যত এই কথাই বলেছিলেন যে, আমার নীতি যদি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশের সমর্থন লাভ করে থাকে, যারা সেই নীতিতে বিশ্বাসী, কেবলমাত্র তাদেরই নিয়ে আমার ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা উচিত। আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত কিন্তু এ. আই. সি. সি.-তে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও আমাদের মিশ্র ক্যাবিনেট থাকা উচিত, কারণ ক্যাবিনেটের গঠন যতদূর সম্ভব সাধারণভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের গঠনের মতোই হওয়া বিধেয়, এবং তা যত বেশি সম্ভব কংগ্রেসের ভিতরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন হওয়া উচিত। আজ ভারতের ভিতরে এবং বাইরে আমরা যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, তাতে আমাদের মতে, কংগ্রেসের পক্ষে সমমতাবলম্বী ক্যাবিনেট গঠনের নীতি মূলত ভুল। এই সময় আমাদের উচিত জাতীয় ভিত্তিকে বিস্তৃত করা। আমরা কি তার সূত্রপাত করব আমাদের জাতীয় কার্যনির্বাহক সংস্থা—ওয়ার্কিং কমিটিকে সংকীর্ণ দলীয় ভিত্তিতে গঠন করে?

দুর্নীতির প্রশ্নে সাধারণভাবে আমরা একমত, তবে আমি মনে করি আপনি ব্যাপারটিকে কিছুটা বড় করে দেখছেন। আমি জানি না ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে দেখলে দুর্নীতির মাত্রা

লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে কিনা। যতই হোক, আমি কিন্তু মনে করি, যদি তা বেড়েও থাকে তার ফলে, জাতীয় সংগ্রাম করবার সামর্থ্য আমাদের এখনও লোপ পায়নি। এবং দুর্নীতির কারণ অনুসন্ধান করার সময় আমাদের ভেবে দেখতে হবে, সংগ্রাম স্থগিত রাখার এবং সেইসঙ্গে সরকারি নানারূপ আয়েস ও আরাম ভোগ করার ফলে প্রধানত তা হয়েছে কিনা। আগের চিঠিতে যা বলেছি তারই পুনরুক্তি করে বলছি, হয়তো আরও বেশি স্বার্থত্যাগ ও দুঃখ বরণ করার আহ্বান এর যথার্থ প্রতিষেধক হবে এবং জাতিকে উচ্চতর এক নৈতিক স্তরে উন্নীত করবে।

৬ তারিখে রাজেনবাবু অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমাদের উভয়ের আগ্রহের বিষয় শ্রমিক প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আলোচনা করি—পরে কংগ্রেস প্রসঙ্গে আসি। আপনার সঙ্গে প্রথমে যখন আমি চিঠিপত্র লিখতে শুরু করি, আমার আশা ছিল চিঠিপত্রের মারফতই আমরা ওয়ার্কিং কমিটির সমস্যাটি মীমাংসা করতে পারব এবং বৃহত্তর সমস্যাগুলি আমাদের পরবর্তী বৈঠকের জন্য আমরা স্থগিত রাখতে পারি। কিন্তু পত্রালাপ যতই চলতে থাকল আমি বুঝতে পারলাম কোনও সমাধানের দিকে তা যাচ্ছে না। যখন রাজেনবাবু এলেন আমার তখন মনে হচ্ছিল যেমন করে হোক ডাক্তারি নির্দেশ অমান্য করেও আপনার সঙ্গে দেখা করি, হয়তো তাতে আমাদের মধ্যে একটা মিটমাটে আসা যেতে পারে। সেইজন্যেই রাজেনবাবু আমার অনুরোধে বিড়লা ভবনে টেলিফোন করেন এবং একটি বৈঠকের প্রস্তাব করেন। রাজেনবাবুর কাছ থেকে উৎসাহজনক সংবাদ না পেয়ে আমি ভাবলাম, আমার আর একবার চেষ্টা করা উচিত। তাই আমার ডাক্তার বিকেলে আবার বিড়লা ভবনে টেলিফোন করেন এবং আমি নিজে এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম করি— দুই ক্ষেত্রেই আপনি জবাবে জানান যে রাজকোটের ব্যাপারে আপনাকে অবিলম্বে বাধ্য হয়ে দিল্লি ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আমার তখন মনে হয়েছিল এবং এখনও আমি মনে করি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষতিসাধন করে, হয়তো কংগ্রেসের অশেষ দুর্ভাগ্য, তাই রাজকোট আপনার উপর ভর করেছিল। আমার মতো লোকদের কাছে কংগ্রেসের প্রয়োজন—বিশেষ করে সেই সংকটের সময়ে—রাজকোটের ডাকের থেকে ছিল হাজার গুণ বেশি জরুরি। একথা স্বভাবত মনে আসে যে, স্যার মরিস গয়ারের রায়ের পর সর্দার প্যাটেলকে দিয়েই রাজকোট পরিস্থিতি সামলানো যেত, তার জন্য সেখানে এত দীর্ঘকাল আপনার ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না। যাইহোক, আপনি যখন ইতিকর্তব্য স্থির করে যা করবার তা করেছেন এখন আপসোস করে লাভ নেই।

৭ এপ্রিল আপনার এক টেলিগ্রামে আপনি প্রস্তাব করেছিলেন আমার দাদা শরৎ বা অন্য কোনও প্রতিনিধি রাজকোটে প্লেনে বা অন্য উপায়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সসংকোচে আমাকে বলতে হচ্ছে প্রস্তাবটি কাজের ছিল না। সরাসরি চিঠিপত্রে যদি সন্তোষজনক কোনও মীমাংসায় পৌঁছানো না যায়, বিশেষ করে সমস্যাটি যখন এত কঠিন ও জটিল না, আমি মনে করি রাজকোটে প্রতিনিধি পাঠিয়ে অবস্থার কোনও উন্নতি হবে না। তা হতে পারে একমাত্র আমাদের মধ্যে সরাসরি আলোচনাতেই।

আপনার ১০ তারিখের চিঠি এইমাত্র পেলাম, সে সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বলতে হচ্ছে, বেশিরভাগ প্রশ্নের যে জবাব আপনি দিয়েছেন তা আমাকে নিরাশ করেছে। সমস্ত চিঠিটিতে হতাশার ভাব ছড়িয়ে আছে, আমার পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সসংকোচে আমাকে এ কথাও বলতে হচ্ছে যে, আপনি ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলির উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছেন। জাতীয় সংকট দেখা দিলে আমরা এইসব প্রশ্ন কাটিয়ে উঠতে পারব, এই ভরসাটুকু রাখবার জন্যে আমাদের দেশাত্মবোধের উপর আপনার যথেষ্ট আস্থা রাখা উচিত ছিল। কংগ্রেসের মধ্যে একতা যদি আমরা ফিরিয়ে আনতে না পারি, দেশের একতা

আমরা কি করে আশা করতে পারি। পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে কার্যত আপনি আমাকে কোনওই উপদেশ দেননি।

দেশীয় রাজ্যগুলিতেও অহিংস গণ-আন্দোলন সম্পর্কে আপনি যদি এতই নিরাশ হন তা হলে কী করে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের জন্য নাগরিক স্বাধীনতা ও দায়িত্বপূর্ণ সরকারের দাবি আদায় করার আশা করেন? যতই বলুন আমাদের একমাত্র অস্ত্র অহিংস গণ-আন্দোলন বাদ দিলে বিশুদ্ধ নরমপন্থী নীতি বা আপনার পরার্থে আত্মদান নীতি ছাড়া আমাদের আর কিছু সম্বল থাকে না। আপনি বলেছেন, যেখানে আপনার প্রভাব আছে সেখানেই আপনি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা জানি আপনি রাজকোটে তাই করেছেন এবং সেখানে সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে এই কারণে নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন। আপনার দেশবাসীর বা রাজকোট রাজ্যের জনসাধারণের প্রতি কি তাই করে সুবিচার করেছেন?

আপনার ইচ্ছামতো আপনার জীবন বিপন্ন করবার অধিকার আপনার নেই। রাজকোট থেকে আরও বড় ক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্ব ও সাহায্য আপনার দেশবাসী ন্যায়সংগতভাবে আপনার কাছে দাবি করতে পারে। এবং রাজকোটের জনগণ সম্পর্কেও একথা সত্য যে, যদি তারা নিজেদের চেষ্টায় স্বরাজ অর্জন না করে, করে আপনার আত্মনিগ্রহের ফলে, রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে তারা অপরিণতই থেকে যাবে এবং যে স্বরাজ আপনি তাদের জন্য অর্জন করে দেবেন তাও তারা রক্ষা করতে পারবে না। সবার শেষে এত দিকে এবং এতগুলি লড়াই যখন চালাতে হবে, কতবার এইভাবে আপনার মূল্যবান জীবন বিপন্ন করতে পারবেন?

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছেন। অর্থনৈতিক কথাটি আপনি যোগ করেছেন সম্ভবত এই কারণে যে, আপনি আমাদের সর্বভারতীয় শিল্প পরিকল্পনার চিন্তা অনুমোদন করেননি, যদিও আমরা শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে উপযোগী কুটিরশিল্পকে উৎসাহ দেবার কথা বলেছি। রাজনৈতিক মতভেদের বিষয়ে আমি এখনও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না এমন কী মতভেদ আছে যা ঐক্যের ও সম্মিলিতভাবে কাজ করার পথে মৌল ও অলঙ্ঘনীয় বাধা বলে মনে করেন। আপনার যদি এখনও এই ধারণা থাকে যে এইভাবে কাজ করা অসম্ভব, তা হলে কংগ্রেসের ভবিষ্যত—অন্তত আসন্ন ভবিষ্যত—বাস্তবিকই অন্ধকারাচ্ছন্ন। এতদিন ধরে আমি আশা করে আসছিলাম যে আপনার মারফত এই বিভেদ কোনওরকমে জোড়া লাগবে এবং তার ফলে নিদারুণ এক জাতীয় সংকটকে এড়ানো যাবে।

আপনি যাদের মীমাংসার উর্ধ্বে বলেছেন, তারা ভাল হোক, মন্দ হোক, ভালমন্দ কিছুই না হোক, তারা টিকে থাকবে। অতএব মিলিত আন্দোলন আজ যদি অসম্ভব হয়, তা হলে সব সময়েই তা অসম্ভব হবে। তার অর্থ ভবিষ্যতে আমাদের ভাগ্যে শূন্য হতাশা ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের মধ্যে যখন তারুণ্যের বলিষ্ঠ আশাবাদ রয়েছে এবং সেই সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনির্বাণ বিশ্বাস আছে আমরা কি করে এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারি?

আপনি কয়েকটি চিঠিতে আমাকে বলেছেন, আমার নীতি ও কার্যক্রম প্রণয়ন করে অবিলম্বে তা যেন এ. আই. সি. সি.-র কাছে পেশ করি। কিন্তু কংগ্রেসের কাছ থেকে আমি যে নির্দেশ পেয়েছি তাতে একটি বিশেষ প্রণালীতে আমাকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে এবং তাই আমার আশু কর্তব্য। ত্রিপুরি কংগ্রেসে প্রেসিডেন্টের ভাষণে আমার কার্যক্রম উপস্থাপিত হয়েছিল কিন্তু তা গৃহীত হয়নি। ঠিক এই মুহূর্তে ওয়ার্কিং কমিটির বিষয়টি যখন অমীমাংসিত রয়েছে আমি এ. আই. সি. সি.-র কোনও কার্যক্রম পেশ করবার তাগিদ বোধ করছি না।

আপনি আপনার প্রথম চিঠিতে বলেছিলেন, আমাকেই উদ্যোগী হতে হবে। সেই অনুযায়ী আপাতত আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি সে সম্পর্কে আমার সমাধান এবং আমার যা

কিছু ধারণা আমি আপনাকে জানিয়ে আসছি। আমি দেখছি আমার সব প্রস্তাব বা তার অধিকাংশই আপনার অনুমোদন লাভ করেনি। অতএব এবার আপনাকে উদ্যোগী হতে হবে। ওয়ার্কিং কমিটি কাদের নিয়ে গঠিত হবে সে সম্পর্কে আপনার অভিপ্রায় জানাবার সময় এখন এসেছে। পন্থ প্রস্তাবের নির্দেশ ছিল, ওয়ার্কিং কমিটি কেবল আপনার ইচ্ছানুযায়ীই গঠিত হবে না, তাকে আপনার আস্থাভাজনও হতে হবে।

আপনার বিবেচনার জন্য আমি কিছু বিকল্প প্রস্তাব পেশ করছি। প্রথমত আমি জাতীয় সংগ্রাম আবার শুরু করবার কথা বলেছিলাম, তাতে আমাদের বর্তমান বাধাবিপত্তির অধিকাংশ নিরসিত হত। এই প্রস্তাব আপনার গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত আমি প্রস্তাব করেছিলাম, আপনার উপদেশ মতো আমি যদি সমমতাবলম্বী একটি ক্যাবিনেট গঠন করি, আপনি অনুগ্রহ করে আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোট আমাকে দেবেন। এও সম্ভব নয় আপনি বলেছেন। তৃতীয়ত, আমি প্রস্তাব করেছিলাম, আপনি নিজে এগিয়ে এসে ওয়ার্কিং কমিটির সরাসরি পরিচালনভার গ্রহণ করুন, এতেও অনেক বাধা অপসারিত হত এবং অনেক কিছু সহজ হয়ে যেত। আপনি আমার এই প্রস্তাবের কোনও জবাব দেননি। আপনি যদি এটাও নাকচ করে দেন তা হলে আমার আর করবার কিছু নেই, আমার জায়গায় আপনাকেই উদ্যোগী হতে হবে এবং ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবার দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

আমার ক্ষেত্রে একটি ব্যাপার স্পষ্ট। আপনার উপদেশমতো আমার দিকের সদস্যদের নিয়ে সমমতাবলম্বী ক্যাবিনেট গঠন করা পারতপক্ষে আমার পক্ষে সম্ভব নয় এবং সেইজন্য আমি দুঃখিত। আপনার উপদেশ কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যায়। সেই প্রস্তাবে বলা আছে, ওয়ার্কিং কমিটিকে আপনার সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হতে হবে। তা ছাড়া, আমার বিনীত অভিমত এই যে, বর্তমান অবস্থায় সমমতাবলম্বী ক্যাবিনেট দেশের সর্বাধিক স্বার্থের প্রতিকূল হবে। সাধারণভাবে তা কংগ্রেস সংস্থার যথার্থ প্রতিনিধি স্থানীয় হবে না তো বটেই, অধিকন্তু, এর ফলে তীব্র কলহের সূত্রপাত হবে এবং সম্ভবত আমাদের নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দেবে।

আশাকরি, ত্রিপুরি কংগ্রেস আপনার উপর যে কাজের ভার অর্পণ করেছে আপনি এখন তা পালন করবেন। আপনি যদি তাও করতে অস্বীকার করেন, তা হলে আমি তখন কী করব? বিষয়টি কি তখন আমি এ. আই. সি. সি.-র কাছে জানাব এবং তাদেরই বলব ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচন করতে? অথবা আমাকে বলবার অন্য কোনও নির্দেশ আপনার আছে কি?

আশাকরি বা এখন আগের থেকে ভাল আছেন এবং শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আপনার স্বাস্থ্য, বিশেষ করে আপনার ব্লাড প্রেসার এখন কীরকম? আমার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে।

সশ্রদ্ধ প্রণাম সহ

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

পুনশ্চ: আপনার যে চিঠির (১০ তারিখের) জবাব দিচ্ছি তাতে আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোটের জন্য আমার অনুরোধের জবাবে আপনি বলেছেন যে, আমি যে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করব সে সম্পর্কে এ. আই. সি. সি.-র উচিত হবে আপনার নির্দেশ বা মতামতে চালিত না হয়ে, নিজস্ব বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করা। অনেক বেশি ভাল হত যদি ওয়ার্কিং কমিটিকে গঠন করা নিয়েই নিজেদের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী তাদের কাজ করতে দেওয়া হত। আমি যদি আপনার উপদেশ কার্যকর করতে না পারি, কার্যকর করলে পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হবে এবং আপনি নিজে যদি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন না করেন, তা হলে এ. আই. সি. সি.-কে ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচিত করবার দায়িত্ব নিতেই হবে। আপনি অন্য কোনও উপায়ের কথা কি বলতে পারেন?

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা)

জিয়ালগোরা
১৪ এপ্রিল ১৯৩৯

নিয়মিত সংবাদপত্র রিপোর্টে উদ্বিগ্ন যে কলিকাতায় এ. আই. সি. সি. মিটিংয়ে আসিতেছেন না এবং গান্ধী সেবা সংঘ কনফারেন্স মে-র দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত মুলতুবি থাকিতেছে। এ. আই. সি. সি. মিটিংয়ের সময় আপনার উপস্থিতি একান্ত দরকার। এ. আই. সি. সি. মিটিং মে-র প্রথম সপ্তাহে কি আপনার সুবিধা হইবে? অনুগ্রহ, টেলিগ্রাম করিবেন।

—সুভাষ

বসুকে (তারবার্তা)

রাজকোট
১৪ এপ্রিল ১৯৩৯

তোমার চিঠি আমার চিঠিকে পথে অতিক্রম করিয়াছে। সুরাহা হইতে পারে এমন কিছুই যোগ করিবার নাই। দৃঢ়নিশ্চিত, জাতীয় স্বার্থে তোমার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তোমার অবাধ পছন্দমতো ক্যাবিনেট গঠন এবং কার্যক্রম প্রণয়ন করা। ভালবাসা

—বাপু

বসুকে (তারবার্তা)

রাজকোট
১৪ এপ্রিল ১৯৩৯

তোমার টেলিগ্রাম। গান্ধী সেবা সংঘ ৩ হইতে ১০ মে। ভাল হয় ওয়ার্কিং কমিটি ২৮, এ. আই. সি. সি. ২৯-এ হইলে। যাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বা'র জ্বর কম, বিপদ নাই।

ভালবাসা

—বাপু

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা)

জিয়ালগোরা
১৫ এপ্রিল ১৯৩৯

গতকালের দুইটি টেলিগ্রাম পায়িাছি। আপনার কলিকাতায় আসা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইতেছি না বলিয়া দুঃখিত। এ. আই. সি. সি. মিটিংয়ের সময় আপনার উপস্থিতি একান্ত দরকার। আপনার সুবিধার জন্য প্রয়োজন হইলে মিটিং স্থগিত থাকিবে। সমমতাবলম্বী ক্যাবিনেট সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কার্যকর করিতে পারিতেছি না—দুঃখিত। অগত্যা, একমাত্র বিকল্প আপনি ক্যাবিনেট মনোনীত করিবেন। ১৩ আপনাকে চিঠি দিয়াছি। আজ আবার লিখিতেছি। কোনও কারণে মনোনীত যদি না করেন, বিষয়টি এ. আই. সি. সি.-তে পেশ হইবে। আমি অনিশ্চিত। তাহার পূর্বে ব্যক্তিগত আলাপের মধ্য দিয়া মীমাংসার শেষ চেষ্টা আমাদের করা উচিত। আপনার সুবিধার্থে ইহার জন্য এ. আই. সি. সি. মুলতুবি থাকিতে পারে। ১৩ ও ১৫ তারিখের আমার চিঠি বিবেচনা করিয়া অনুগ্রহ করিয়া টেলিগ্রাম করিবেন।

প্রণাম
—সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীকে

জিয়ালগোরা
১৫ এপ্রিল ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজি,

আজ আপনাকে আমি টেলিগ্রাম করে জানিয়েছি যে, এ. আই. সি. সি. মিটিংয়ের সময় কলকাতায় আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। এটি এতই জরুরি যে, আপনার সুবিধার জন্য প্রয়োজন হলে এ. আই. সি. সি. মিটিং স্থগিত রাখা হবে। অনুগ্রহ করে সুনিশ্চিতভাবে আমাকে জানাবেন, নির্দিষ্ট কোন তারিখের মধ্যে আপনি আসতে পারবেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে বলেছেন যে, এ. আই. সি. সি.-র মিটিংয়ের আগেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা উচিত। এ বিষয়ে তাঁরা এতই দৃঢ়মত পোষণ করেন যে তাঁরা বলছেন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত না হলে এ. আই. সি. সি.-র মিটিং ডেকে কোনও লাভ নেই। তাঁদের আরও ধারণা, চিঠিপত্রের মারফত যদি মীমাংসায় না পৌঁছানো যায়, ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা মারফত আমাদের একবার শেষ ও চরম চেষ্টা করা উচিত। আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্ভবপর করার জন্যে যদি প্রয়োজন হয়, এ. আই. সি. সি.-র মিটিং পিছিয়ে দিতে হবে।

ব্যক্তিগতভাবে পিছিয়ে দেওয়ায় আমার ভয় আছে, (কারণ আমার উপর কালাপহরণের অভিযোগ আসতে পারে) যদি না আপনি অনুমোদন করেন। আমি কিন্তু গভীরভাবে উপলব্ধি করছি, চিঠিপত্রে যদি সন্তোষজনক ফল না পাওয়া যায়, তা হলে আমাদের সাক্ষাৎ করতেই হবে এবং এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা এ. আই. সি. সি. মিটিংয়ের আগে করতে হবে। ব্যক্তিগত

আলোচনার ফলেও যদি মীমাংসায় পৌঁছানো না যায়, তখন অন্তত এইটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল।

এখন একেবারে সাম্প্রতিক অবস্থাটা সংক্ষেপে বলছি। সমমতাবলম্বী ক্যাবিনেট গঠন সম্পর্কে আপনার উপদেশ পালন করতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত। (আমি কারণগুলি বলছি না, তা আমার আগেকার চিঠিগুলিতে বিশদভাবে বলেছি)। অতএব পন্থ প্রস্তাবের ফলে আপনার উপর যে দায়িত্ব বর্তিয়েছে তা আপনাকে নিতেই হবে। অর্থাৎ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম আপনাকে ঘোষণা করতে হবে। আপনি যদি তা করেন, তা হলে অচলাবস্থার অবসান হবে—ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসবে এবং ওয়ার্কিং কমিটির পর এ. আই. সি. সি.-ও বসবে। আশা করা যায় তারপর সবই ঠিক হয়ে যাবে এবং অন্য কোনও আপদ দেখা দেবে না।

যদি কোনও কারণে আপনি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে নারাজ হন, আমাদের তখন হবে ত্রিশঙ্কু অবস্থা। বিষয়টিতে তা হলে অনিশ্চিত অবস্থায় এ. আই. সি. সি.-র নিকট উপস্থাপিত করতে হবে। আমি মনে করি, সবাই স্বীকার করবেন যে, এ. আই. সি. সি. বৈঠকের আগেই ওয়ার্কিং কমিটির সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত, যাতে ত্রিপুরির মতো এ. আই. সি. সি. যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয়।

বর্তমানে আপনি কীভাবে চিন্তা করছেন আমার জানা নেই, তবে আমি আশা করছি আপনি এবারে ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যদের নাম ঘোষণা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এবং তাই করে অচলাবস্থার অবসান ঘটাবেন। আপনি যদি অন্যপ্রকার ভাবেন, ওয়ার্কিং কমিটির সমস্যা সমাধান না করে কলকাতায় এ. আই. সি. সি.-র বৈঠক বসলে কী সাংঘাতিক পরিণাম দেখা দেবে তা আপনাকে অনুমান করতে অনুরোধ করি। যদি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, প্রয়োজন হলে আমাদের সাক্ষাৎ করতে হবে এবং যাতে আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্ভব হয়, এ. আই. সি. সি. মিটিংকে মুলতুবি রাখতে হবে।

সম্প্রতি আমার একটি কথা মনে হচ্ছে। সমমতাবলম্বী ক্যাবিনেট নিয়ে আমরা প্রচুর আলোচনা করছি—কিন্তু সমমতাবলম্বী ক্যাবিনেট বলতে আমরা যথার্থ কী বুঝি সে বিষয়ে কি আমরা নিশ্চিত? যেমন, লক্ষ্ণৌ, ফৈজপুর এবং হরিপুরা কংগ্রেসের পর যে ওয়ার্কিং কমিটিগুলি গঠিত হয়েছিল—আপনি কি সেগুলিকে সমমতাবলম্বী বলবেন—তা হলে সমমতাবলম্বী বনাম মিশ্র ক্যাবিনেটের সমস্যা নিয়ে বিতর্ক করবার কোনওই যুক্তি নেই। আপনি যদি তাদের মিশ্র বলেন তা হলে তিন বছর সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে আসার পর এই বছর মিশ্র ক্যাবিনেট কাজ চালাতে পারবে না কেন? আমার মনে হচ্ছে সমমতাবলম্বী ও মিশ্র ক্যাবিনেটের তাত্ত্বিক আলোচনা বাদ দিলে এমন কয়েকজনের নাম আমরা মেনে নিতে পারি যারা সর্বতোভাবে এ. আই. সি. সি.-র এবং সাধারণভাবে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের মোটামুটি আস্থাভাজন হবেন। অনুগ্রহ করে সমস্যার এই দিকটি বিবেচনা করবেন।

এর পরে দুর্নীতি, হিংসা ইত্যাদির মতো সমস্যা নিয়ে আপনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সম্ভবত আপনি এই প্রশ্নগুলিকে মৌলিক বলে মনে করেন। এখন কতখানি দুর্নীতির প্রসার হয়েছে অথবা কী পরিমাণে হিংসার মনোভাব ছড়িয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা কি সবাই একমত নই যে, দুর্নীতি, হিংসা ইত্যাদির অবসান দরকার এবং সেই উদ্দেশ্যে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত? যদি তাই হয়, তবে আপনি কেন একথা ভাববেন যে, কাজের সময় আমরা একসাথে কাজ করব না কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা একমত হতে পারব না?

চিঠি আর দীর্ঘ করব না। আমার মনে যা ছিল সব আপনাকে খুলে বলেছি। আমি আবার শুধু বলতে চাই, যতদূর মনে হয় সামনা-সামনি আলোচনার পর আমরা দেখতে পাব, ক্যাবিনেটের

প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের তত্ত্বগত অভিমত যাই হোক না কেন, তাতে কার কার নাম থাকবে সে সম্পর্কে আমরা একমত হতে পারব এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমাদের তত্ত্বগত মতভেদ যতই হোক, কর্মক্ষেত্রের ডাক এলে আমরা একমত হতে সক্ষম হব।

আশাকরি বা দ্রুত উন্নতির পথে যাচ্ছেন এবং অত্যধিক পরিশ্রম সত্ত্বেও আপনার স্বাস্থ্য সন্তোষজনক আছে। আমি ধীরগতিতে উন্নতিলাভ করছি। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

বসুকে (তারবার্তা)

রাজকোট
১৭ এপ্রিল ১৯৩৯

তোমার চিঠি এবং টেলিগ্রাম। এ. আই. সি. সি. মিটিংয়ের তারিখ ২৮ ঠিক রাখিয়ো, উপস্থিত থাকিব। তোমার উপর কমিটি চাপাইয়া দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি নিজে গঠন না করিলে, এ. আই. সি. সি. বুঝিবে। মিশ্র ক্যাবিনেট আমার কাছে অকার্যকর মনে হয়। যেহেতু তোমার আপত্তি নাই, সময় পাইলে আমি সাধারণ বিবৃতি দিবার চেষ্টা করিব। ভালবাসা।

—বাপু

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা)

জিয়ালগোরা
১৮ এপ্রিল ১৯৩৯

যদি আপনি বিবৃতি দেন, চিঠিপত্র প্রকাশ করিবার অনুমতি দয়া করিয়া দিবেন। আমার শেষ চিঠি ১৫ই ডাকে দিয়াছি।

—সুভাষ

বসুকে (তারবার্তা)

রাজকোট
১৮ এপ্রিল ১৯৩৯

অবশ্যই চিঠিপত্র প্রকাশ করিবে, তাহাতে বিবৃতি দান প্রয়োজন হইবে না। ভালবাসা।

—বাপু

বসুকে (তারবার্তা)

রাজকোট
১৯ এপ্রিল ১৯৩৯

২৪-এ যাত্রা ঠিক। ২৭-এ সকালে কলিকাতা পৌঁছিতেছি। সোদপুরে থাকিতে পারি। হেমপ্রভা দেবীর বরাবরকার ইচ্ছা। চিকিৎসার দিক হইতে ডাক্তার রায়ের আর একটি প্রস্তাব ছিল। গতকাল হইতে জ্বরে শয্যাশায়ী এবং জ্বর বাড়িতেছে। যাত্রার পূর্বে ইহা আয়ত্তে আসিবে আশা করি। তোমার চিঠিগুলিতে অনেক প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহের পরিবেশে এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে সুস্পষ্ট মতভেদের মধ্যে পন্থ প্রস্তাব পালন করিতে নিজেকে অসহায় বোধ করিতেছি। আমি এখনও আশা করি সাহসের সহিত তুমি কমিটি গঠন করিবে। তুমি যে মত পোষণ করো তাহাতে অন্য কিছুতে তোমার প্রতি অবিচার হইবে। ভালবাসা।

—বাপু

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা)

জিয়ালগোরা
২০ এপ্রিল ১৯৩৯

আপনি ২৭-এ কলিকাতায় আসিতেছেন জানিয়া অত্যন্ত খুশি। আপনার যেখানে ইচ্ছা থাকিবেন, কোনওই আপত্তি নাই। আপনার ব্যক্তিগত আরাম এবং সাধারণের সুবিধার জন্য শহরের প্রান্তে নদীতীরে কোনও বাগানবাড়িতে আপনি থাকুন, আমার ইচ্ছা। যাহাই হোক সতীশবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া কলিকাতা হইতে আবার আপনাকে টেলিগ্রাম করিব। জওহরলালজি গতকাল এখানে আসিয়াছিলেন। আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি, কলিকাতার নিকটবর্তী এমন কোনও স্থানে একদিনের জন্য আপনি যাত্রাভঙ্গ করুন যেখানে ব্যক্তিগত আলাপের জন্য দু'জনে আপনার সহিত দেখা করিতে পারি। ইহা যদি অনুমোদন করেন এবং আপনি কোন পথে আসিবেন জানান, সুবিধাজনক মধ্যবর্তী কোনও স্টেশনে আপনার থাকিবার ব্যবস্থা করিব। ২১-এ কলিকাতা যাত্রা করিতেছি।

—সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা)

২০ এপ্রিল ১৯৩৯

আপনার জ্বরের জন্য গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। শীঘ্র নিরাময় প্রার্থনা করি। জওহরলালজি এবং আমি ঐকান্তিক আশা করি আমাদের বৈঠকে সুফল ফলিবে এবং সাধারণ স্বার্থে সকল কংগ্রেস কর্মীর সহযোগিতা সম্ভব করিবে। কলিকাতায় শীঘ্রই আমাদের সাক্ষাৎ হইতেছে বলিয়া উভয়েই মনে করি বৈঠকের পূর্বে পত্রালাপ প্রকাশ করা অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত। প্রণাম।

—সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীকে

পোঃ জিয়ালগোরা
জেলা মানভূম, বিহার
২০ এপ্রিল ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজি,

আজ আপনাকে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম করেছি:

মহাত্মা গান্ধী, রাজকোট। আপনার জ্বরের জন্য গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। শীঘ্রই নিরাময় প্রার্থনা করি। জওহরলালজি এবং আমি ঐকান্তিক আশা করি আমাদের বৈঠকে সুফল ফলিবে এবং সাধারণ স্বার্থে সকল কংগ্রেস কর্মীর সহযোগিতা সম্ভব করিবে। কলিকাতায় শীঘ্রই আমাদের সাক্ষাৎ হইতেছে বলিয়া উভয়েই মনে করি বৈঠকের পূর্বে পত্রালাপ প্রকাশ করা অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছনীয়। প্রণাম।

গত তিন সপ্তাহ ধরে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ পত্রালাপ হয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে এ পর্যন্ত এই পত্রালাপ থেকে প্রত্যক্ষ কোনও লাভ হয়নি। তা সত্ত্বেও ভিন্নভাবে হয়তো এ ফলপ্রসূ হয়েছে, আমাদের ধারণাগুলিকে পরিচ্ছন্ন করতে সহায়তা করেছে। কিন্তু আপাতত এখনকার প্রশ্নটির মীমাংসা করা দরকার, কারণ আমাদের এখন ওয়ার্কিং কমিটি আর না হলেই নয়। দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তাতে কংগ্রেস কর্মীদের পক্ষে সব বিরোধ মিটিয়ে ফেলে মিলিতভাবে অগ্রসর হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিনে দিনে কীভাবে অবনতি ঘটেছে তা আপনার সম্পূর্ণ জানা আছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় যে সংশোধনী বিলটি রয়েছে তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাদেশিক সরকারগুলির যতটুকু ক্ষমতা আছে, যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থা দেখা দিলে ব্রিটিশ সরকার তা কেড়ে নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সবদিক থেকে বিবেচনা করে দেখলে আমরা যে অভূতপূর্ব এক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছি তা সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট। আমরা এই অবস্থার সঙ্গে একমাত্র তখনই যুঝতে পারব বলে আশা করতে পারি যদি আমরা নিজেদের মধ্যে যা কিছু মতান্তর সব কিছু এখনই ভুলে গিয়ে একতা ও নিয়মনিষ্ঠা ফিরিয়ে আনতে যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করি। একমাত্র আপনি যদি এগিয়ে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তবেই তা সম্ভব হবে। যদি তা করেন, আপনি দেখতে পাবেন আমরা সকলে আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং আপনার নির্দেশমতো চলতে আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা

করছি। আপনি আরও দেখবেন, দুর্নীতি নির্মূল করার এবং হিংসার প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনের দিক থেকে, আমাদের মতের মিল রয়েছে, যদিও আজ কতখানি দুর্নীতি রয়েছে অথবা হিংসার মনোভাবের মাত্রা কতটা সে সম্পর্কে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে। কার্যক্রমের বিষয়ে, তা স্থির করার ভার কংগ্রেসের বা এ. আই. সি. সি.-র—যদিও এই সংস্থা দুটির কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা উপস্থাপিত করবার অধিকার নিঃসন্দেহে আছে। কার্যক্রম সম্পর্কে আমার মনে হচ্ছে, যে সংকট আমাদের উপর শীঘ্রই এসে পড়ছে মুখ্যত তাই তা নির্ধারণ করবে এবং এরপরে এই বাবদে যথার্থ কোনও বিরোধের অবকাশ থাকবে না।

এ. আই. সি. সি. মিটিংয়ের আগে কলকাতায় বা কলকাতার আশেপাশে কোথাও আমাদের মধ্যে যে বৈঠক স্থির আছে আমি সাগ্রহে ও অত্যন্ত আশার সঙ্গে তার প্রতীক্ষা করছি। অন্যান্য প্রদেশেও যেমন বাংলাদেশেও তেমনই দিনে দিনে এই জনমত গড়ে উঠছে যে, তত্ত্বগত বিভেদ যাই থাক না কেন এবং অতীতে যতই ভুল বোঝাবুঝি বা মতবিরোধ হোক না কেন ওয়ার্কিং কমিটির সমস্যা পারস্পরিক মতৈক্য দ্বারা সমাধান করা আবশ্যক। পন্থ প্রস্তাব অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব আপনার এবং আপনি যখন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, আপনি দেখতে পাবেন আমরা আমাদের যথাসাধ্য সহযোগিতা করছি।

জওহর গতকাল এখানে এসেছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আমি দেখে খুশি হলাম যে আমাদের মধ্যে মতের মিল আছে।

আমাদের মতে কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয় এমন কোনও স্থানে একদিনের জন্য যাত্রা ভঙ্গ করে নিরিবিলিতে আলোচনা করলে ভাল হয়। আপনি যদি নাগপুর হয়ে আসেন তা হলে মেদিনীপুর (খড়্গপুর) হবে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। আপনি যদি চেওকি হয়ে আসেন তা হলে বর্ধমানের কাছাকাছি জায়গার কথা আমাদের ভাবতে হবে। এই বিষয়ে আমি আপনাকে একটি টেলিগ্রাম করেছি এবং আপনার জবাবের জন্য অপেক্ষা করছি। যদি তা না হয়, কলকাতায় আমাদের সাক্ষাৎ হবে। আমি জওহরকে আমাদের আলোচনায় যোগ দিতে বলেছি এবং তিনি তাতে রাজি আছেন।

আপনার জ্বর সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন বোধ করছি। প্রার্থনা করছি যাতে তা শীঘ্র দূর হয়।

সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা)*

কলিকাতা
২২ এপ্রিল ১৯৩৯

সতীশবাবুর সহিত আলোচনা করিয়াছি। সেখানকার নিরিবিলি পরিবেশে আপনার থাকা অনুমোদন করিয়াছেন। অতএব পথে যাত্রাভঙ্গ অনাবশ্যক। সংবাদপত্রে জানিতেছি আপনি দিল্লি হইয়া আসিতেছেন কিন্তু আপনার টেলিগ্রামে জানিয়াছিলাম নাগপুর হইয়া। কোন পথে, টেলিগ্রামে দয়া করিয়া জানাইবেন।

—সুভাষ

মহাত্মা গান্ধীর পত্র

প্রিয় সুভাষ,

তুমি আমাকে পন্থ-প্রস্তাব অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম তোমাকে দিতে বলেছ। আমি একাধিকবার আমার পত্রে এবং টেলিগ্রামে বলেছি আমি নিজেকে একান্তভাবে সে-কাজে অক্ষম বলে মনে করি। ত্রিপুরির পরে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। তোমার নিজের মতামত যেহেতু আমি জানি, এবং তোমার সঙ্গে অন্য সদস্যদের মৌলিক মতভেদের কথাও জানি, আমার মনে হচ্ছে, আমি সদস্যদের নাম যদি তোমাকে দিই, সেটা তোমার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে। আমার চিঠিতে আমি এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বলেছি। তিন দিন আমাদের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ আলোচনাতেও এমন কিছু ঘটেনি যাতে আমার মত বদলে যায়। অতএব, তোমার নিজের কমিটি তোমার নিজেরই বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। আমি তোমাকে এ-কথাও বলেছি যে, প্রাক্তন সদস্যদের সঙ্গে তুমি পরস্পরের সহমতের ভিত্তিতে সে-কাজ করবার সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করতে পারো এবং তোমরা মতভেদ দূর করতে পেরেছ শুনলে আমি যার-পর নাই খুশি হব। তারপরে যা-যা ঘটেছে তার মধ্যে এখন আর আমার যাওয়ার দরকার নেই। তুমি এবং উপস্থিত প্রাক্তন সদস্যেরা এ. আই. সি. সি.-র সামনে তোমাদের মতামত বুঝিয়ে বলবে। আমার শুধু এই নিয়ে গভীর মনোবেদনা যে, পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা সম্ভব হয়নি। তবু, আমি আশা করব, যা কিছু করা হোক পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছা সহকারে করা হবে। ভালবাসা নিও।

সোদপুর
২৯. ৪. ৩৯

তোমার
বাপু

---

* উল্লিখিত পত্রালাপ এবং ৫ এবং ৬ মে ১৯৩৯-এর দুটি শেষ টেলিগ্রাম বিনিময়ের মধ্যবর্তী সময়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা কলিকাতায় নির্দিষ্ট তারিখে বসে। সেই সভায় নেতাজি তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। এ. আই. সি. সি.-তে প্রদত্ত তাঁর মূল বিবৃতিটি পরে দ্রষ্টব্য।

মহাত্মা গান্ধীকে (তারবার্তা)

কলিকাতা, ৫ মে ১৯৩৯

আমাদের পত্রালাপ প্রকাশ করিতে চাই। অনুগ্রহ করিয়া মতামত জানাইবেন।

—সুভাষ

বসুকে (তারবার্তা)

বৃন্দাবন (চম্পারণ), ৬ মে ১৯৩৯

পত্রালাপ প্রকাশ করো। ভালবাসা।

—বাপু

বসু-নেহরু পত্রালাপ

(এপ্রিল ১৯৩৮ — এপ্রিল ১৯৩৯)

জওহরলাল নেহরুর পত্র

আনন্দভবন

এলাহাবাদ, ২৩ এপ্রিল ১৯৩৮

প্রিয় সুভাষ,

মন্ত্রীদের বৈঠক এবং ওয়ার্কিং কমিটি সম্পর্কে তোমার পত্র এবং টেলিগ্রাম আমি পেয়েছি। ওইসব বৈঠকের জন্যে নিমন্ত্রণ প্রেরণের বিষয়ে নির্দেশ দয়া করে আমার অফিসে পাঠাবে কি? মন্ত্রীদের বৈঠকে কাদের নিমন্ত্রণ করা হবে?

প্রধানমন্ত্রীদের অবশ্যই এবং সংসদীয় কমিটির সদস্যদেরও। আমার প্রস্তাব, ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সদস্যদের ও মন্ত্রীদের বৈঠকের বিষয়ে জানানো উচিত এবং বলা উচিত, যদি ইচ্ছা করেন, তাঁরাও স্বাগত। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীদেরও* অনুরোধ করা উচিত, তাঁরা যেন অন্য মন্ত্রীদের জানান বৈঠকে যদি আসতে পারেন, তাঁদেরও স্বাগত জানান হচ্ছে।

আমি তিন দিনের জন্যে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি, ২৭ তারিখে এলাহাবাদ ফিরব। পাঁচ দিন থেকে

---

* ব্রিটিশ যুগে বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী— (ইংরেজিতে Prime Minister, Premier) বলা হত।

তারপর গাড়োয়াল যাব। তুমি তোমার উত্তর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির নামে অফিসে পাঠাবে? তা হলে তোমার নির্দেশ পালন করতে কোনও দেরি হবে না

প্রীত্যর্থী
জওহর

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বোস
৩৮/২ এলগিন রোড,
কলকাতা

জওহরলাল নেহরুর প্রতি

ট্রেনে
১৯ অক্টোবর ১৯৩৮

প্রিয় জওহর,

তুমি হয়তো ভাবছ, আমি কী অদ্ভুত জীব, তোমার চিঠির উত্তর দিচ্ছি না, সে সব চিঠি কিন্তু আমি ঠিকই পেয়েছি। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের লেখা তোমার পত্রগুলি সবাই মিলে দেখেছেন। এখানকার ঘটনাবলীর কথা কৃপালনি এবং অন্য বন্ধুরা তোমাকে জানিয়েছেন। যুদ্ধের সংকটের সময়। তোমার বিবৃতিগুলি সময়োপযোগী হয়েছে এবং আমাদের পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

এই ক'মাস তোমার অভাব আমি কতখানি বোধ করেছি, তুমি কল্পনা করতে পারবে না। অবশ্য আমি বুঝি, একটু পরিবর্তন তোমার খুব দরকার ছিল। আমার শুধু এটাই খারাপ লেগেছে যে, নিজের শরীরকে তুমি যথেষ্ট বিশ্রাম দাওনি।

সব মিলিয়ে সংবাদপত্রে এখানে তোমার কথা খুব ভালই লিখেছে। তার জন্যে রয়টারকে ধন্যবাদ। ইউরোপে কোথায় কোথায় তুমি গিয়েছ, কী কী করেছ লোকে তা জানতে পেরেছে এবং তুমি যা যা বলছ সবাই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তার খবর রাখছে। ইউরোপে তুমি যে অত ভাল কাজ করতে পেরেছ, সেজন্যে আমি যারপরনাই খুশি। যদিও এখানে তোমার অভাব আমরা খুবই অনুভব করেছি।

কয়েকটি সমস্যার সমাধান তোমার ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে। যেমন, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা, মি. জিন্না যুক্তি মানছেন না, অনমনীয়। এ. আই. সি. সি.-তে দক্ষিণ এবং বামপন্থীদের মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে। বামপন্থীরা বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং তাতে মহাত্মাজি আঘাত পেয়েছেন, তা ছাড়া আন্তর্জাতিক বিষয়ের প্রশ্ন আছে।

আমি আশা করি পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতিত্ব তুমি গ্রহণ করবে; তাকে যদি সফল হতে হয়, তোমাকে সভাপতি হতেই হবে।

তোমার
সুভাষ

পুঃ আমি কাল বোম্বাই থেকে কলকাতা পৌঁছচ্ছি।

জওহরলাল নেহরুর পত্র

এলাহাবাদ
৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়

প্রিয় সুভাষ,

শান্তিনিকেতনে আমাদের মধ্যে এক ঘণ্টা কি তার বেশি কথা হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয়, পরিস্থিতিটা আমরা পরিষ্কার করে উঠতে পারিনি। সত্যিই পারিনি, কেননা এতগুলো বিষয় অনিশ্চিত থেকে গেছে, আমি জানি না, শেষ পর্যন্ত সেগুলো কী রকম দাঁড়াবে। কী হয় দেখবার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, আবার কী হয়, না হয়, তা আমাদের ওপর নির্ভর করবে, বিশেষত তোমার ওপর।

আমি আগেই তোমাকে বলেছি, তোমার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় কিছু ভাল হয়েছে। কিছু খারাপও হয়েছে। ভাল যেটুকু হয়েছে আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু এর পরে খারাপ যা হবে তা নিয়ে একটু আশঙ্কায় আছি। আমার এখনও মনে হচ্ছে, ওই বিশেষ সংঘাতটি ওভাবে না হলে মোটের ওপর ভালই হত। কিন্তু সে যা হবার হয়ে গেছে, এখন আমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে। সেই ভবিষ্যতের দিকে আমাদের তাকাতে হবে উদারতর দৃষ্টিভঙ্গিতে, ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। স্পষ্টতই আমরা যেমনটি চেয়েছিলাম ঠিক তেমনিভাবে সবকিছু হয়নি বলে আমাদের কারওর মাথা গরম করলে চলবে না। যাই ঘটুক না কেন, আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমাদের যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করতে হবে। সেটি মেনে নেবার পরও তার সঠিক পথটি দেখতে পাওয়া সহজ নয়। ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার মন বিচলিত রয়েছে।

প্রথম যে কাজটি আমাদের করতে হবে, তা হল পরস্পরের দৃষ্টিকোণ যতটা সম্ভব ভাল করে বোঝা। তা হলে প্রস্তাব রচনা করা সহজ হবে। কিন্তু আরেকজন কী করতে চাইছে তাই নিয়ে আমাদের মন যদি সংঘাত ও সন্দেহে পূর্ণ থাকে, ভবিষ্যৎ গড়া সহজ কাজ নয়। গত কয়েক বছর গান্ধীজি এবং সর্দার প্যাটেল এবং গান্ধীজির মতো যাঁদের চিন্তা ভাবনা, তাঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বারে বারে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়, এবং যদিও আমরা পরস্পরকে স্বমতে আনতে পারিনি, পরস্পরকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত করতে পেরেছি এবং আমার মনে হয়, আমরা পরস্পরকে অনেকটাই বুঝতে পেরেছি। অনেকদিন আগে, ১৯৩৩ সালে জেল থেকে বেরিয়ে আমি গান্ধীজিকে দেখতে পুনা গিয়েছিলাম। তখন তিনি তাঁর অনশনের পর সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। আমাদের সংগ্রামের নানা দিক নিয়ে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল এবং তারপরে আমাদের মধ্যে পত্রালাপও হয়। সেসব চিঠি পরে প্রকাশিত হয়েছিল। ওইসব আলোচনা এবং চিঠিপত্র দেখা গেল, আমাদের স্বভাবগত ও মৌলিক পার্থক্য এবং অনেক বিষয়ে মিল। তারপর থেকে একান্তে এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে ঘন ঘন আলোচনা হয়েছে। কয়েক বার আমি সভাপতির পদ থেকে এমনকী ওয়ার্কিং কমিটি থেকেও পদত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু পদত্যাগ করিনি কারণ আমার মনে হয়েছিল তাতে একটা সংকট এসে পড়বে, যখন ঐক্য অপরিহার্য ছিল। বোধহয় আমি ভুল করেছিলাম।

এখন সংকট এমনভাবে এসে পড়েছে, যা দুর্ভাগ্যজনক, আমি নিজে কী করব, সেটা ঠিক করবার আগে আমার জানা দরকার তুমি কংগ্রেসের কী হওয়া, কী করা চাও। সে-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থীদের এবং যুক্ত রাষ্ট্রীয়পন্থীদের নিয়ে অনেক কথাবার্তা

হয়েছে। তবু, আমি যত দূর স্মরণ করতে পারছি, এ সব প্রশ্ন সংক্রান্ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ওয়ার্কিং কমিটিতে তোমার সভাপতিত্বের সময় হয়নি। কাকে তুমি বামপন্থী মনে কর, কাকে দক্ষিণপন্থী মনে কর, আমি জানি না। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের সময়ে তোমার বিভিন্ন বিবৃতিতে শব্দগুলি যেভাবে তুমি ব্যবহার করেছিলে, তাতে মনে হয়েছিল, গান্ধীজি এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে যাঁদেরকে তাঁর দলভুক্ত মনে করা হয়, তাঁরাই দক্ষিণপন্থী নেতা এবং তাঁদের যাঁরা প্রতিপক্ষ, তাঁরা যেই হন, তাঁরা হলেন বামপন্থী। আমার মনে হয়, এই আখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। আমার মনে হয়, তথাকথিত বামপন্থীদের মধ্যে অনেকে তথাকথিত দক্ষিণপন্থীদের চেয়ে বেশি দক্ষিণপন্থী। কড়া ভাষায় এবং পুরনো কংগ্রেস নেতাদের সমালোচনা ও আক্রমণ করতে পারাটাই রাজনীতিতে বামপন্থার প্রমাণ নয়, আমার মনে হয়, নিকট ভবিষ্যতে আমাদের সামনে বড় বড় যে সব বিপদ দেখা দেবে তার মধ্যে একটি হল, বিভিন্ন পদের দায়িত্বে এবং দায়িত্বশীল পদে এমন সব ব্যক্তিদের উঠে আসা যাঁদের দায়িত্ববোধ বলে কিছু নেই, বর্তমান পরিস্থিতি ঠিকমতো অনুধাবন করতে যাঁরা অক্ষম এবং বুদ্ধিবৃত্তির গুণগত মানেও তাঁরা অসাধারণ কিছু নন। তাঁরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন, যে তার একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী, এবং প্রকৃত বামপন্থী সেই ঝড়ে উড়ে যাবেন। চিনের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে এবং যদি পারি, আমি চাই ভারত যেন সেই দুঃখজনক পথ অনুসরণ না করে।

আমার মনে হয়, দক্ষিণপন্থা এবং বামপন্থা, এই দুটি শব্দ যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা ভুল, এবং বিভ্রান্তিজনক। তার বদলে যদি আমরা রাজনীতির কথা বলতাম ভাল হত। তোমার নীতি কী? যুক্তরাষ্ট্র বিরোধিতা? ভাল কথা, আমার মনে হয়, ওয়ার্কিং কমিটির এক বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠও তাই চান, এবং এ-বিষয়ে তাঁদের দুর্বলতা নিয়ে কটাক্ষ করা অন্যায়। বরং, তুমি যদি ওয়ার্কিং কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে এবং সে সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে তার প্রতিক্রিয়া কী হয় লক্ষ করতে, তা হলেই কি ভাল হত না? বিষয়টি নিয়ে তোমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা না করে, সামগ্রিকভাবে তাঁদের সকলের নামে পুরনো অন্যায্য কৃতকর্মের প্রতি প্রবণ থাকার অভিযোগ আনা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মন্ত্রিপদগুলি ইতিমধ্যেই ভাগাভাগি করা হয়ে গেছে বলে তুমি যে অদ্ভুত অভিযোগটি করেছ তার সম্পর্কে আমি যা বলেছি, এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি হবে না। অনিবার্যভাবে অধিকাংশ লোক মনে করছে, কার্যনির্বাহী কমিটিতে তোমার সহকর্মীরাই দায়ী।

তোমার স্মরণ থাকবে, ইউরোপ থেকে তোমার কাছে এবং ওয়ার্কিং কমিটির কাছে আমি দীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাতাম। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কী হওয়া উচিত তা নিয়ে আমি সবিস্তারে আলোচনা করতাম এবং নির্দেশ চাইতাম। তোমরা কোনও নির্দেশ পাঠাওনি। এমনকী প্রাপ্তিস্বীকারও করোনি। আমার মনোভাব গান্ধীজি অনুমোদন করেছিলেন এবং আমাকে বলা হয়েছিল ওয়ার্কিং কমিটিও আমার সঙ্গে একমত হয়েছিল। তোমার প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল আমি আজও জানি না। কিন্তু আমাকে জানানোর কথা বাদ দিলেও, ওয়ার্কিং কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার এবং পক্ষে কি বিপক্ষে কিছু একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সেটা কি একটা সুযোগ ছিল না? দুঃখের বিষয়, এই প্রশ্নে এবং অন্যান্য প্রশ্নেও ওয়ার্কিং কমিটিতে তোমরা একটা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করালে; যদিও বাইরে তুমি তোমার মতামত ব্যক্ত করেছ, ফলত, তুমি পরিচালক-সভাপতির মত ততটা নয়, যতটা বক্তা হিসাবে কাজ করেছ।

গত এক বছরে এ. আই. সি. সি.-র অফিসের অনেক অবনতি হয়েছে। তুমি তা দেখনি। তোমাকে পাঠানো পত্র এবং টেলিগ্রামের জবাব পাওয়া গিয়েছে কদাচিৎ। তার ফলে অফিসের কাজ অনির্দিষ্টকাল আটকে থাকছে। ঠিক যখন আমাদের সংগঠনের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার, সদর দপ্তরে সে-রকম কাজ হচ্ছে না।

আমাদের সামনে এখন দেশীয় রাজ্যগুলির প্রশ্ন, হিন্দু-মুসলিম প্রশ্ন এবং কিষাণ-মজদুর প্রশ্ন। সেসব বিষয়ে নানারকম দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কিছু কিছু সংঘাত আছে। তোমার কি তার কোনওটি সম্পর্কে এমন কোনও মতামত আছে যা তোমার সহকর্মীদের মতামত থেকে আলাদা? বোম্বাই ট্রেড ডিসপিউট বিলের কথা ধরো। আর কোনও কোনও ধারার সঙ্গে আমি একমত নই। আমি এখানে থাকলে সেসব ধারা পরিবর্তনের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। তোমারও কি মতভেদ আছে? যদি থাকে, তুমি কি সেসব ধারার পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টা করেছ? বিভিন্ন প্রদেশে (বঙ্গদেশ-সহ) কৃষি-সংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমার সুনির্দিষ্ট মতামত আমি জানি না।

প্রাদেশিক কংগ্রেসি সরকারগুলি দ্রুত ছোট ছোট সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহেও যে আন্দোলন হচ্ছে তার ফলে একটি বৃহৎ সংকটের সৃষ্টি হবে এবং তাতে প্রাদেশিক সরকারগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও জড়িয়ে পড়ব। আমাদের এখন কী কার্যধারা অনুসরণ করা উচিত বলে তুমি মনে করো? বঙ্গদেশে তুমি যে জোট সরকার চাইছ, সাংবিধানিক পথের দিকে আমাদের সবে যাওয়ার সম্পর্কে তোমার আপত্তির সঙ্গে সেটা সংগতিপূর্ণ বলা যায় না। সাধারণভাবে মনে করা হবে, সেটা দক্ষিণপন্থী পদক্ষেপ, বিশেষত এখন, যখন পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে।

তারপরে আছে বিদেশনীতি। তুমি জানো তার ওপরে আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকি, বিশেষত বর্তমান পরিস্থিতিতে। আমি যত দূর বুঝেছি, তুমিও তাই কর। কিন্তু তুমি ঠিক কোন নীতিটি কাম্য বলে মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করছ, আমি জানি না। গান্ধীজির দৃষ্টিকোণটি আমি মোটামুটি জানি এবং তার সঙ্গে গত কয়েক বছরের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিবিধ সংকট বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং আমি সম্পূর্ণ একমত হতে না পারলেও আমার মত প্রায়ই তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

এইসব প্রশ্ন আমার মনে জাগে এবং আমি জানি এসব প্রশ্ন নিয়ে যাঁরা চিন্তিত তাঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা তোমাকে নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। এও খুবই সম্ভব যে, কংগ্রেসে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে এঁদের মধ্যে অনেকে আবার অন্য দিকে ভোট দেবেন। ফলে একটা নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন নিয়ে প্রচুর সমস্যা দেখা দেবে। শেষ পর্যন্ত সমস্যা হবে এমন একটি কমিটি গঠন করা যার ওপরে এ. আই. সি. সি.-র এবং সাধারণভাবে কংগ্রেসের আস্থা থাকবে। এই কাজটিও বর্তমান পরিস্থিতে অত্যন্ত দুরূহ। কিছু লোক আছেন যাঁদের দায়িত্বশীল মনে করা হয় না। একমাত্র যাঁদের তাঁরা দক্ষিণপন্থী মনে করেন, তাঁদের সমালোচনা করা ছাড়া এঁরা আর এমন কিছু করেননি যাতে তাঁরা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। তাঁদের সম্মতি লাভই কমিটি গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তেমন কমিটি বাম কিংবা দক্ষিণপন্থী কারওই আস্থা ভাজন হবে না। সে কমিটি হয় বরখাস্ত হয়ে যাবে, নয় মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

এমন হতেই পারে, যে দেশীয় রাজ্যগুলিতে আন্দোলন যত গড়ে উঠবে, বল্লভভাই প্যাটেল, এমনকী গান্ধীজিও তার সঙ্গে ক্রমে জড়িয়ে পড়বেন। ভারতীয় রাজনীতিতে সে আন্দোলন প্রধান হয়ে উঠবে, এবং তাকে বাদ দিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করলে তার কোনও কার্যকারিতা থাকবে না। গত এক দশক, কিংবা তার আর্থিক কাল কার্যনির্বাহী কমিটি ভারতে এবং বিদেশেও খুব উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং যেসব বিবৃতি দিয়েছে, তার তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে। আমার মনে হয় আমাদের তথাকথিত বামপন্থীদের মধ্যে অনেকে অন্যকিছুর চাইতে কড়া ভাষায় বেশি বিশ্বাস করেন। নরিম্যানের মতো রাজনীতিকদের আমি বিশেষ গুণগ্রাহী নই। তেমন অনেককে চারপাশে দেখা যায়।

আমরা একটা বেদনাদায়ক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি— এবং বেরিয়ে আসার কোনও

রাস্তাও সহজে চোখে পড়ছে না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে প্রস্তুত কিন্তু পরিস্থিতিটা তোমার পরিষ্কার করে দিতে হবে, নেতৃত্ব তোমায় দিতে হবে, তখন অন্যেরা ঠিক করতে পারবেন, এর মধ্যে তাঁদের স্থান আছে কিনা। অতএব আমি তোমাকে বলি, অবস্থাটা ভাল করে বিবেচনা করে দেখো, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী কী হতে পারে, এবং ওপরে যেসব সমস্যার কথা বললাম, ভেবে দেখো এবং সমস্ত বিষয়টির ওপরে একটা বিস্তারিত নোট লেখো। নোটটি প্রকাশ করার দরকার নেই, তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্যে যাঁদেরকে আহ্বান করবে, তাঁদের দেখালেই চলবে। তেমন একটি নোটকে ভিত্তি করে আলোচনা হবে এবং সেই আলোচনা বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদেরকে সাহায্য করবে। তবে, শুধু আলোচনাই যথেষ্ট নয়। প্রায়ই তা কোনও স্পষ্ট কথা বলে না, মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ধোঁয়াটে কথাবার্তা আমাদের অনেক হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারকে একটি চরমপত্র দেওয়ার যে কথা বলেছ, সেটা তুমি বিস্তারিত করে বললে আমি খুশি হব। সে-কাজটা আমাদেরকে তুমি ঠিক কীভাবে করতে বলছ? তারপরে কী করা হবে? তোমাকে আগেই বলেছি, এই চিন্তাটা আমার একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না, তবে তুমি যদি আরও খুলে বলো, আমি হয়তো আরেকটু ভাল করে বুঝতে পারব।

সংবাদপত্রে তোমার বিবৃতি আমি দেখেছি। বিবৃতিটি এত অস্পষ্ট যে, তুমি কী বলতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি না। তাই আমি ব্যাখ্যা চাইছি।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু থাকে মূলনীতি, আর কিছু থাকে পন্থা। তা ছাড়া প্রয়োজন হয় পরস্পরকে বোঝা এবং সহকর্মীদের সদিচ্ছা ও সততার উপরে বিশ্বাস। সেই পরস্পরকে বোঝা এবং পরস্পরের ওপর বিশ্বাসের যদি অভাব হয়, সহযোগিতা করে সুফল লাভ করা দুঃসাধ্য। আমার বয়স যত বেড়েছে, সহকর্মীদের মধ্যে বিশ্বাসের এবং পরস্পরকে বোঝার গুরুত্ব আমি তত বেশি উপলব্ধি করেছি। সর্বোৎকৃষ্ট নৈতিকতা নিয়ে আমি কী করব যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর আমার বিশ্বাস না থাকে? অনেক প্রদেশে বিভিন্ন দলের মধ্যে রেষারেষির মধ্যে আমরা তার দৃষ্টান্ত দেখি, এবং সাধারণত যেসব ব্যক্তি সৎ প্রকৃতির, কপটতাহীন, তাদের মধ্যে আমরা দেখি চূড়ান্ত তিক্ততা এবং উচিত অনুচিত বোধের অভাব। এ ধরনের রাজনীতি আমার বরদাস্ত হয় না, এবং এই কয়েক বছর আমি তাদের থেকে যতটা সম্ভব দূরে থেকেছি। আমি একা কাজ করি, আমার কোনও দল নেই, আমাকে সমর্থন করবার কেউ নেই, যদিও সুখের বিষয় আমার ওপর অনেকের আস্থা আছে। আমার মনে হচ্ছে, প্রাদেশিক স্তরে এই অবনতি এখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও প্রসারিত হচ্ছে। আমার কাছে এ এক গুরুতর চিন্তার বিষয়।

অতএব আবার আমরা ফিরে আসছি সেই সিদ্ধান্তে, রাজনৈতিক সমস্যাবলীর পিছনে আছে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা এবং তার মোকাবিলা করাই বেশি কঠিন, তার একটি মাত্র উপায়, পরস্পরের সঙ্গে খোলাখুলি আচরণ করতে হবে এবং আমার আশা, সবাই পুরোপুরি খোলাখুলি আচরণ করবেন।

তুমি এখনই এ পত্রের উত্তর দেবে, তা আমি প্রত্যাশা করি না। তার জন্যে কয়েক দিন লাগবে। তবে একটি প্রাপ্তিস্বীকার যদি পাঠাও আমি খুশি হব।

প্রীত্যর্থী

জওহর

জওহরলাল নেহরুর প্রতি

চৌরাম, জেলা গয়া
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

প্রিয় জওহর;

তোমার দীর্ঘপত্র আমি কলকাতায় পেলাম। তুমি আমার নানা দোষত্রুটির কথা বলেছ। অবশ্য আমি নিজেও সে বিষয়ে অবহিত, তা হলেও, আরেকটা দিকের কথাও ভাবা দরকার। তা ছাড়া, আমাকে যেসব বাধার সঙ্গে লড়তে হয়েছে, তার কথাও তোমার ভোলা উচিত নয়। সে সবের কথা আমি এই চিঠিতে কিছু বলতে চাই না, কিছুটা এই কারণে যে তার ফলে একটা বিতর্কের সৃষ্টি হবে এবং কিছু এই কারণে যে অন্যদের সম্পর্কে কিছু কিছু বিরূপ চিন্তা তাতে প্রতিফলিত হবে। এখন আসল বিষয় ত্রিপুরি কংগ্রেসের কার্যসূচি। জয়প্রকাশ ১২ তারিখ তোমার সঙ্গে দেখা করে কর্মসূচির বিষয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা তোমাকে জানাবে। সেই সঙ্গে আমিও তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু পারব বলে মনে হচ্ছে না। যাই হোক, ২০ তারিখে আমি (তোমার সঙ্গে) দেখা করব।

রাজকোট ইত্যাদি বিষয়ে তোমার বিবৃতি আমি পেয়েছি। ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজন্যবর্গের মাধ্যমে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করতে চায়। কিন্তু সে ফাঁদে আমাদের পা দিলে চলবে না। দেশীয় রাজাদের সঙ্গে দেশীয় রাজ্য সমূহের সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সামনে স্বরাজের প্রশ্নে আমাদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া উচিত। তোমার বিবৃতিতে আমি তার কোনও উল্লেখ দেখলাম না, আমার মনে হয়, স্বরাজের প্রশ্নটি বাদ দিয়ে আমরা যদি শুধু মাত্র দেশীয় রাজ্যের সমস্যা নিয়েই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এবং রাজন্যবর্গের সঙ্গে লড়াই করতে আরম্ভ করি, তা হলে আমাদের আসল সংগ্রাম থেকে আমাদের অন্যপথে চালিত হওয়ার একটা বিপদ থেকে যায়। দেখা হলে আরও কথা হবে।

প্রীত্যর্থী
সুভাষ

জওহরলাল নেহরুর পত্র

১ মার্চ ১৯৩৯

প্রিয় সুভাষ,

মিশরীয় প্রতিনিধিদল সম্পর্কে তোমার ২৭ তারিখের পত্র। কিছুদিন আগে আমি বোম্বাই পি. সি. সি.-কে নাহাস পাশা ও তাঁর সহযোগীদের অভ্যর্থনার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করার জন্য অনুরোধ করে পত্র দিয়েছিলাম। আমি প্রস্তাব করেছিলাম, তাঁদের অবস্থানের জন্যে তাজমহল হোটেলে ব্যবস্থা এবং তাঁদের জব্বলপুর যাওয়ার জন্যে রেলে প্রথম শ্রেণিতে রিজার্ভেশন করা যেতে পারে। নাহাস পাশা যদি আসতেন সে-ব্যবস্থা করতেই হত। এখনও আমার মনে হয়, আর যাই হোক, জব্বলপুর পর্যন্ত তাঁদের প্রথম শ্রেণিতে আসা উচিত। তারপরে তাঁদের কর্মসূচি স্থির করতে হবে এবং বিষয়টি তোমরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারো। তাঁরা সচরাচর যা করে থাকেন এখানে হয়তো তাই করতে চাইবেন।

আমার ধারণা তাঁদের এদেশে থাকার খরচ এ. আই. সি. সি.-র বহন করা উচিত। যদি না

কোথাও কোথাও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি তার দায়িত্বগ্রহণ করে। তাঁদের থাকার ব্যবস্থা সব সময়ে প্রথম শ্রেণির হোটেলে হওয়া উচিত। তাঁদের অবস্থান স্বল্পকালীন হবে, মাত্র একপক্ষকাল এবং তার মধ্যে তিন-চার দিন তাঁরা ত্রিপুরায় কাটাবেন, তিনদিন যাতায়াতে ব্যয় হবে। কাজেই, তাঁরা বেশি জায়গায় যেতে পারবেন না। বিশেষভাবে দিল্লিতে তাঁদের যাওয়া দরকার। সম্ভব হলে তাঁরা কলকাতা এবং লক্ষ্ণৌতেও যেতে পারেন। আমার মনে হয় সেটা একমাত্র তুমিই ঠিক করতে পারবে, তাঁরা পৌঁছবার পর তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে।

আমি উল্লেখ করতে পারি, ওয়ার্ধাতে আমরা ঘরোয়াভাবে বিষয়টি আলোচনা করেছিলাম, এবং যদি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হত, প্রস্তাব হয়েছিল, মিশরীয় প্রতিনিধিদলের ব্যয়ের জন্যে একটা অর্থ বরাদ্দ করার।

আমি ত্রিপুরীয় অভ্যর্থনা সমিতির লোকেদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি, এবং আমার ধারণা তাঁরা জব্বলপুরের হোটেলে এবং কংগ্রেস ক্যাম্পে প্রাথমিকভাবে জায়গা রিজার্ভ করেছেন।

প্রীত্যর্থী
জওহরলাল নেহরু

শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস
৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা

জওহরলাল নেহরুর পত্র

আনন্দভবন
এলাহাবাদ, ১৬ মার্চ ১৯৩৯

প্রিয় সুভাষ,

আশা করি অসুখের পর তোমার শরীর সেরে উঠছে, ত্রিপুরির ধকল তুমি কাটিয়ে উঠছ।

তুমি হয়তো শুনে থাকবে গত পরশুদিন মৌলানা আজাদ এলাহাবাদ স্টেশনে পড়ে গিয়ে রীতিমতো চোট পেয়েছেন। মনে হচ্ছে হাঁটুর কাছে হাড় ভেঙে গেছে। সম্ভবত দেড়-দু' মাস তাঁকে পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে হবে। বর্তমানে তিনি এখানে আছেন। তবে এক সপ্তাহ পরে তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হতে পারে। তাঁর জানুসন্ধির একটা রঞ্জনচিত্র আমি ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের কাছে পাঠাচ্ছি তাঁর এবং কলকাতার অন্য শল্যবিদদের মতামত ও পরমার্শের জন্য।

মিশরীয় প্রতিনিধিদল এখন এখানে আছেন এবং এখান থেকে তাঁরা দিল্লি যাবেন ও তিনদিন সেখানে থাকবেন। তার পরে তাঁরা যাবেন আগ্রা, লাহোর ও পেশোয়ার। ফেরবার পথে তাঁরা হয়তো আলিগড় ও বেনারস যেতে পারেন, তবে সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। দিল্লিতে তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের কর্মসূচি স্থির করবেন। তাঁরা দু' দিনের জন্য কলকাতা যেতে চান। সঠিক তারিখটি এখনও নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না, তবে ২৭ তারিখ নাগাদ হবে। সেটা ঠিক হওয়ামাত্র আমি তোমাকে এবং বি পি সি সি-কে জানিয়ে দেব।

আমার মনে হয় কলকাতায় তাঁদের কোনও হোটেলে থাকাই ভাল। লক্ষ্ণৌ আর দিল্লি,

দু' জায়গাতেই তাঁরা হোটেলে উঠেছেন। কলকাতায় তাঁদের কর্মসূচির বিষয়ে কী করা উচিত তুমি দয়া করে বি পি সি সি-কে জানিয়ে দিও। আমরা চেষ্টা করছি অকংগ্রেসি যেমন মুসলিম লিগের লোকেদের সঙ্গেও দেখা করবার পূর্ণ সুযোগ যাতে তাঁরা পান। কিন্তু অনুষ্ঠানগুলি হবে কংগ্রেসের কিংবা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায়।

আগামীকাল আমি দু' দিনের জন্য দিল্লি যাচ্ছি, গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে। আশা করছি ২০ তারিখ দুপুরে ফিরে আসব।

এ চিঠির একটি প্রতিলিপি আমি বি পি সি সি-র সেক্রেটারির কাছে পাঠাচ্ছি।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস
ধানবাদ (বঙ্গদেশ)

প্রীত্যর্থী
জওহরলাল নেহরু

জওহরলাল নেহরুর পত্র

সুভাষচন্দ্র বোস
জিয়ালগোরা

আশা করি ধানবাদ থেকে প্রেরিত আমার টেলিগ্রাম পেয়েছ। উত্তরের অপেক্ষায় আছি। আশা করা হচ্ছে, মিশরীয় প্রতিনিধিদল ২৭ তারিখ সকালে কলকাতায় পৌঁছবে এবং দু' দিন থাকবে।

জওহরলাল নেহরু
২২. ৩. ৩৯

জওহরলাল নেহরুর প্রতি

পোঃ জিয়ালগোরা
জেলা মানভূম, বিহার
২৮ মার্চ ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

কিছুদিন থেকে দেখছি আমার উপর তুমি ভয়ংকর বিরূপ হয়ে উঠেছ। আমার এ কথা বলার কারণ আমি দেখছি আমার বিরুদ্ধে বলবার কোনও সুযোগ পেলে সাগ্রহে তুমি তা গ্রহণ করো; এবং আমার অনুকূলে কিছু বলবার থাকলে তা তুমি ভ্রূক্ষেপই করো না। রাজনীতিক্ষেত্রে যারা আমার প্রতিপক্ষ তারা আমার নামে যা কিছু বলে তুমি তাতে সায় দাও, অথচ তাদের বিপক্ষে যা বলা যেতে পারে সে বিষয়ে তুমি প্রায়ই চোখ বুজে থাকো। পরে যা বলছি তাতে এইটেই নানা ঘটনা থেকে দেখাতে চেষ্টা করব।

আমার উপর তোমার এই প্রচণ্ড বিরূপতা কেন, আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমার দিকে, ১৯৩৭ সালে অন্তরীণ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি কর্মক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের সঙ্গে তোমার সঙ্গে আচরণ করে এসেছি। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার বড় ভাই ও নেতা হিসাবে তোমাকে দেখে এসেছি এবং প্রায়ই তোমার উপদেশ চেয়েছি। গত বছর ইউরোপ থেকে তোমার ফিরে আসার পর আমি এলাহাবাদে গিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন পথে তুমি আমাদের চলতে বলো। এইভাবে যখনই তোমার কাছে গিয়েছি, সচরাচর তুমি যে জবাব দিয়েছ, তা অস্পষ্ট, হাঁ-ও নয়, না-ও নয়। যেমন, গত বছর ইউরোপ থেকে তোমার ফিরে আসার পর, আমাকে তুমি এই বলে হটিয়ে দিলে যে, গান্ধীজির সঙ্গে পরামর্শ করার পর আমাকে তুমি যা জানাবার জানাবে। কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের পর ওয়ার্ধায় আমাদের যখন দেখা হয় তুমি আমাকে সুস্পষ্ট কিছু জানাওনি। পরে যখন ওয়ার্কিং কমিটিতে কতকগুলি প্রস্তাব পেশ কর, তাতে নতুন কিছুই ছিল না, অন্তত দেশকে চালিত করার মতো কিছুই ছিল না।

গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে অপ্রীতিকর যে বাকবিতণ্ডা চলে তাতে অনেক কিছুই বলা হয়েছিল—কিছু আমার সপক্ষে, কিছু আমার বিপক্ষে। তোমার সব ক'টি উক্তি ও বিবৃতিতে যা কিছু বলা হয়েছে সবই আমার বিরুদ্ধে। খবরে প্রকাশ দিল্লিতে এক বক্তৃতায় তুমি বলেছ, আমার বা আমার জন্যে ভোটভিক্ষার ব্যাপারটা তোমার খারাপ লেগেছে। জানি না তুমি কী মনে করে এ কথা বলেছিলে, কিন্তু তুমি চমৎকারভাবে ভুলে গিয়েছিলে যে খবরের কাগজে ডক্টর পট্টভির নির্বাচনী আবেদন বার হবার পর আমারটা বেরিয়েছিল। ভোটভিক্ষার কথা যদি বলো, ডক্টর পট্টভির পক্ষে ভোট যোগাড় করতে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীকে কি রকম কাজে লাগানো হয়েছিল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তুমি তা মনে রাখোনি। অপরপক্ষের পুরোদস্তুর একটি সংগঠন ছিল (যেমন, গান্ধী সেবা সংঘ, কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীগুলি এবং সম্ভবতঃ চরকা সংঘ এবং এ. আই. ভি. আই.এ.)[১]। এর উপরে, আমার বিরুদ্ধে নামানো হয়েছিল বড় বড় মহারথীদের, তাঁদের মধ্যে তুমিও ছিলে। পুরোপুরি তাঁরা সুযোগ পেয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীর সুনাম ও মর্যাদাকে ব্যবহার করতে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির অধিকাংশ ছিল তাঁদের হাতে। এ সবের তুলনায় আমার কী ছিল? আমি ছিলাম একা। তুমি জানো কিনা জানি না তবে আমি নিজে জানি, অনেক জায়গায় ডক্টর পট্টভির জন্যে ভোট চাওয়া হয়নি, চাওয়া হয়েছিল গান্ধীজি ও গান্ধীবাদীদের জন্যে, যদিও এই রকম প্রচারের কারসাজি অনেক লোককেই ভোলাতে পারেনি। তবু প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কারণে তুমি আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছ।

এরপরে পদত্যাগ প্রসঙ্গে আসছি। বারোজন সদস্য পদত্যাগ করেন। তাঁদের চিঠিখানি ছিল সরল অকপট—ভদ্র চিঠি, তাতে তাঁরা তাঁদের অবস্থা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পরিষ্কারভাবে জানান। আমার অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে, আমার সম্পর্কে একটিও অপ্রিয় কথা তাঁরা বলেননি, যদিও, যদি তাঁরা চাইতেন আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে পারতেন। কিন্তু তোমার বিবৃতি? কি করে তার বর্ণনা দেব? কঠিন ভাষা আমি প্রয়োগ করতে চাই না, এইটুকু শুধু বলতে চাই, তা তোমার পক্ষে অশোভন হয়েছে। (আমি শুনেছি, তুমি তোমার বিবৃতির সারাংশ সাধারণ পদত্যাগ পত্রের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু তাতে কেউ রাজি হয়নি।) তারপর, তোমার বিবৃতি থেকে মনে হয় তুমি পদত্যাগ করেছ যেমন আর বারোজন করেছেন—অথচ এখনও পর্যন্ত তোমার অবস্থা জনসাধারণের কাছে রহস্যে ঢাকা। সংকটের সময়ে প্রায়ই তুমি

---

১ অল্ ইণ্ডিয়া ভিলেজ্ ইন্ডষ্ট্রিস্ অ্যাসোসিয়েশন

পথ ঠিক করে উঠতে পারো না, ফলে জনসাধারণ মনে করে তুমি দু'নৌকায় পা দিয়ে রয়েছ।

২২ফেব্রুয়ারি তারিখের তোমার বিবৃতির কথা আবার বলছি। তোমার ধারণা তুমি অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং তোমার কথায় ও কাজে খুব সংগতি আছে। কিন্তু নানা উপলক্ষ্যে তোমার আচরণ দেখে অন্য লোকেরা বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাবে। তোমার ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখের বিবৃতিতে তুমি বলেছ, তুমি আমার পুনর্নির্বাচনের বিরুদ্ধে এবং তার কারণ হিসেবে আলমোড়া থেকে ২৬ জানুয়ারি তারিখের বিবৃতিতে যা বলেছিলে তার উল্লেখ করো। স্পষ্টতঃ তুমি আগেকার যুক্তি থেকে সরে আস। এ ছাড়াও বোম্বাইয়ের কিছু বন্ধু আমাকে জানান, তুমি তাঁদের আগেই বলেছিলে যে আমি যদি দাঁড়াই তাতে তোমার আপত্তি নেই, তবে আমাকে বামপন্থীদের প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে হবে।

তোমার আলমোড়া বিবৃতির উপসংহারে তুমি বলেছ, ব্যক্তির কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে, মনে রাখতে হবে একমাত্র মূলনীতি ও আদর্শের কথা। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই যে তুমি আমাদের ব্যক্তির কথা ভুলতে বল, একথা তোমার কখনই খেয়াল থাকে না। সুভাষ বসু যখন আরেকবার নির্বাচনে দাঁড়ায় তখনই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার হতশ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং তুমি নীতি ও আদর্শের স্তুতিতে মেতে ওঠ। মৌলানা আজাদ যখন আবার নির্বাচনে দাঁড়ান, তাঁর জন্যে তখন দীর্ঘ প্রশস্তি লিখতে তোমার বাধে না। যখন সুভাষ বসুর সঙ্গে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্যদের বিরোধ বাধে, তখন সুভাষ বসুকেই প্রথমে তার ব্যক্তিগত দিকগুলিকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। শরৎ বসু যখন ত্রিপুরির কোনও কোনও ব্যাপার সম্পর্কে অভিযোগ করেন (যথা, মহাত্মা গান্ধীর গোঁড়া ভক্ত বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন তাঁদের মনোভাব ও আচরণ সম্পর্কে)— তোমার মতে তিনি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে নিজেকে নামিয়ে আনছেন। তখন তাঁর উচিত ছিল মূলনীতি ও কার্যক্রমে নিজেকে আবদ্ধ রাখা। আমি স্বীকার করছি, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি তোমার যুক্তির মধ্যে সংগতি খুঁজে বার করতে অক্ষম।

আমার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রশ্নটা যখন তোমার চোখে এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে, এবার তাহলে সেই দিকটাই দেখা যাক। তুমি অভিযোগ করেছ, আমার বিবৃতিগুলিতে আমি আমার সহকর্মীদের উপর অবিচার করেছি। স্পষ্টতই তাঁদের মধ্যে তুমি ছিলে না এবং যদি আমি কোনও অভিযোগ করে থাকি তা অন্যদের বিরুদ্ধে। কাজে কাজেই তুমি তোমার হয়ে বলনি, অপরের হয়ে ওকালতি করেছ। সাধারণতঃ মক্কেলের থেকে উকিল কথা কয় বেশি। তুমি জেনে অবাক হবে যে, ত্রিপুরিতে এই নিয়ে যখন সর্দার প্যাটেলের (রাজেনবাবু ও মৌলানার) সঙ্গে কথা বলি, তিনি আমাকে যা জানান তা সত্যিই বিস্ময়কর। আমার বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান যে অভিযোগ তা নাকি গত জানুয়ারি মাসে বরদৌলিতে ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক বসেছিল তারও আগেকার। আমি যখন তাঁকে জানাই যে, সাধারণের ধারণা আমার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগের মূলে আছে আমার "নির্বাচনী বিবৃতিগুলি", তিনি বলেন সেগুলি অতিরিক্ত অভিযোগের কারণ। অতএব দেখা যাচ্ছে, "অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে" তোমার মক্কেলরা ততখানি গুরুত্ব দেননি যতখানি তাঁদের উকিল হয়ে তুমি দিয়ছ। ত্রিপুরিতে যেহেতু সর্দার প্যাটেল ও আর সবাই এ. আই. সি. সি. মিটিং-এ যোগদান করতে চলে যান এবং কথা দেওয়া সত্ত্বেও মিটিং-এর শেষে ফিরে আসেন না, বরদৌলিতে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এর আগে কোন ঘটনার কথা তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন তা ঠিকমতো জানবার জন্যে আমি আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারিনি। কিন্তু আমার দাদা শরতের সঙ্গে এ বিষয়ে সর্দার প্যাটেলের কথা হয়েছিল। সর্দার প্যাটেল তখন তাঁকে বলেছিলেন, ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে এ. আই. সি. সি.-র যে বৈঠক থেকে সমাজবাদীরা সভা ত্যাগ করে বেরিয়ে যায় সেখানে তিনি আমার যে মনোভাব দেখেন, তাঁর আসল অভিযোগের কারণ তাই। আমার দাদা এবং আমি দু'জনেই এই কথা শুনে অবাক হয়ে

যাই, তা সত্ত্বেও এই থেকেই কিন্তু জানা গিয়েছিল, "অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারটা"-কে তুমি যেমন গুরুত্ব দিয়েছিলে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্যদের মনে তার কোনওই গুরুত্ব ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, আমার ত্রিপুরিতে থাকাকালে কয়েকজন প্রতিনিধি (তোমাকে জানিয়ে রাখছি, তাঁরা আমার সমর্থক নন) আমাকে বলেন, "অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারটা" অনেকে ভুলেই গিয়েছিল, তুমি নানা বিবৃতি দিয়ে, বারেবারে বলে বলে সেই বিতর্ককে আবার খুঁচিয়ে তুলেছ। এই প্রসঙ্গে আমি তোমাকে এ কথাও বলতে পারি, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর থেকে ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন প্রাক্তন সদস্য একযোগে আমাকে সাধারণের চোখে যতটা না নামিয়ে এনেছেন, তুমি একা তার চেয়ে অনেক বেশি নামিয়েছ। যদি আমি এতটা পাষণ্ড হয়ে থাকি, জনসাধারণের কাছে আমার স্বরূপ প্রকাশ করা তোমার শুধু অধিকারই নয়, কর্তব্যও। কিন্তু হয়তো তোমার একথা মনে হতে পারে তোমার মতো, মহাত্মা গান্ধীর মতো বিরাট বিরাট নেতাদের এবং সাতটা বা আটটা প্রাদেশিক সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও যে শয়তানটা প্রেসিডেন্ট পদে আবার নির্বাচিত হয়, নিশ্চয় তার মধ্যে কিছু একটু ভাল আছে। প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন এক বছরে নিশ্চয় সে দেশের কিছু সেবা করেছে যার জন্যে তার পিছনে কোনও সংগঠনের জোর না থাকা সত্ত্বেও, অসম্ভব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, সে এতগুলি ভোট লাভ করেছিল।

২২ ফেব্রুয়ারি তারিখের বিবৃতিতে তুমি আরও বলেছ, "কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে আমি বলেছিলাম এইটেই প্রথম ও সবচেয়ে জরুরি বিবেচ্য বিষয়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সে সম্পর্কে কিছুই করা হয়নি।" এই কথাগুলি লেখার সময় তোমার কি একবারের জন্যেও মনে হয়নি যে এই ভুল বোঝাবুঝিকে ঠিক করতে হলে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার এবং সেই দেখা করার সুযোগ আমি পাব ২২ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ? এ কথা সত্যি যে, ১৫ ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমি "অপবাদ সংক্রান্ত ব্যাপার" নিয়ে আলোচনা করিনি, যদিও তিনি একবার এ কথা তুলেছিলেন। তখন আমি তোমারই অনুশাসন মেনে চলছিলাম—অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের থেকে মূলনীতি ও কার্যক্রমের উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও, জেনে রাখো, মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে যখন আমি শুনলাম যে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্যরা একই কমিটিতে থেকে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না, আমি তাঁকে বলি, ২২ তারিখে তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলব এবং চেষ্টা করব যাতে তাঁদের সহযোগিতা পাওয়া যায়। হয়তো তুমিও মানবে, অপবাদ যদি কিছু হয়ে থাকে তা মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে হয়নি। হয়েছিল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে এবং তাঁদের সঙ্গেই ব্যাপারটি আলোচনা করা দরকার ছিল।

ওই বিবৃতিতেই আমি বামপন্থা দক্ষিণপন্থা শব্দগুলি বলতে ঠিক কী বুঝি আমার কাছ থেকে তা লিখিতভাবে জানতে চেয়েছ। তুমি এই ধরনের প্রশ্ন করবে আমি ভাবতেই পারিনি। হরিপুরায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে তুমি নিজে এবং আচার্য কৃপালনি যে রিপোর্ট পেশ করেছিলে, তার কথা কি ভুলে গেছ? সেই রিপোর্টে তুমি বলোনি, দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের চেপে রাখার চেষ্টা করে চলেছে? বাম দক্ষিণ কথাগুলি প্রয়োজনমতো তোমার ব্যবহারে যদি বাধা না থাকে—অপরেও কি তা ব্যবহারে সমান অধিকারী নয়?

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার কী নীতি আমি সুস্পষ্টভাবে জানাইনি, এ অভিযোগও তুমি করেছ। আমি মনে করি আমার একটা নীতি আছে, সে-নীতি ভুল হোক বা ঠিক হোক। ত্রিপুরিতে সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা ব্যক্ত করি। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ভারতের ও বিদেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে একটিমাত্র সমস্যা—একটিমাত্র কর্তব্য আমাদের সামনে আছে, তা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বরাজ আদায় করে নেওয়া। একই সঙ্গে আমাদের দরকার সারা দেশে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আন্দোলন পরিচালনা করার

জন্য ব্যাপক এক পরিকল্পনা। আমার মনে পড়ছে ত্রিপুরির আগে শান্তিনিকেতনে এবং পরে আনন্দভবনে আমাদের মধ্যে যখন দেখা হয় তখনই তোমাকে আমার যা ধারণা তা খুলে বলি। এইমাত্র যা লিখলাম তা অন্তত সুনির্দিষ্ট একটা নীতি। এখন তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, তোমর নীতি কী? সম্প্রতি এক চিঠিতে ত্রিপুরি কংগ্রেসে গৃহীত জাতীয় দাবির প্রস্তাবটি উল্লেখ করেছ। মনে হচ্ছে এটাকে তুমি দারুণ কিছু বলে মনে করছ। শূন্যগর্ভ সুন্দর কথার বিন্যাসে ঠাসা এইরকম ধোঁয়াটে প্রস্তাব আমার মনে কোনও সাড়া জাগায়নি, দুঃখের সঙ্গে আমি একথা স্বীকার করছি। এতে আমাদের পথের কোনও হদিস নেই। যদি আমাদের অভিপ্রায় এই হয়, স্বরাজের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে, এবং আমরা মনে করি তার উপযুক্ত সময় এসেছে, সুস্পষ্টভাবে সেই কথা বলে আমাদের কাজে নেমে পড়া উচিত। একাধিকবার তুমি আমাকে বলেছ, চরমপত্র ব্যাপারটা তোমাকে নাড়া দেয় না। অথচ গত বিশ বছর ধরে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারকে বারেবারে চরমপত্র দিয়ে আসছেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে তিনি এত কিছু যে আদায় করতে পেরেছেন তা কেবল পর পর এই চরমপত্র এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন বুঝে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত হওয়া থেকেই সম্ভব হয়েছে। সত্যিই যদি তুমি বিশ্বাস কর আমাদের জাতীয় দাবি আদায় করার উপযুক্ত সময় এসেছে, চরমপত্র না দিয়ে আর কী ভাবে তুমি অগ্রসর হবে? এই ক'দিন আগে মহাত্মা গান্ধী রাজকোটের ব্যাপার নিয়ে চরমপত্র দিলেন। আমি চরমপত্রের কথা বলছি বলেই কি তোমার আপত্তি? তাই যদি, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় খোলাখুলিভাবে বললেই তো হয়?

মোদ্দা কথা, দেশের আভ্যন্তরিক সমস্যা সম্পর্কে তোমার কী নীতি আমি বুঝতে অপারগ। মনে পড়ছে তোমার কোনও এক বিবৃতিতে আমি পড়েছি, তোমার মতে রাজকোট ও জয়পুর আর সব রাজনৈতিক সমস্যাকে ছাপিয়ে উঠবে। তোমর মতো এইরকম প্রখ্যাত নেতার কাছ থেকে এমন মন্তব্য পড়ে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অন্য কোনও সমস্যা স্বরাজের আসল সমস্যাকে কি করে চাপা দিতে পারে আমার বুদ্ধির অগম্য। এই বিরাট দেশে রাজকোট ক্ষুদ্র একটা বিন্দু মাত্র। রাজকোট থেকে জয়পুর অবশ্য আয়তনে কিছুটা বড়, তাহলেও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আমাদের আসল যে লড়াই তার কাছে জয়পুর সমস্যাও মশার কামড়ের মতো। এ ছাড়া, ভারতবর্ষে যে ছ'শোর বেশি দেশীয় রাজ্য আছে একথা আমাদের ভুললে চলবে না। আমরা যদি অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের গণসংগ্রাম স্থগিত রেখে এখনকার এই রয়ে সয়ে একটু করে এগোবার নীতিতে চলতে থাকি, দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য নাগরিক অধিকার ও দায়িত্বশীল সরকার পেতে আমাদের ২৫০ বছর লাগবে। এবং তারপরে আমরা আমাদের স্বরাজের কথা ভাবব।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তোমার নীতি মনে হয় আরও অস্পষ্ট। কিছুদিন আগে তুমি ওয়ার্কিং কমিটির কাছে ভারতে ইহুদিদের আশ্রয় দেবার এক প্রস্তাব যখন পেশ কর আমি সত্যি অবাক হয়ে যাই। ওয়ার্কিং কমিটি (সম্ভবত মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদনক্রমে) তা অগ্রাহ্য করে এবং তাতে তুমি মর্মাহত হও। বৈদেশিক নীতি বাস্তব বুদ্ধিতে চালিত হয়, সেই নীতি নির্ধারণে জাতির নিজস্ব স্বার্থের দিকটাই প্রবল। যেমন ধরো, সোভিয়েত রাশিয়া। তার আভ্যন্তরিক রাজনীতিতে যতই কমিউনিজমের দাপট থাক, বৈদেশিক নীতিতে সে কখনই ভাবাবেগকে প্রাধান্য দেয় না। সেই জন্যে নিজের প্রয়োজন সে যখনই বুঝেছে, ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে দ্বিধা করেনি। ফ্র্যাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তি এবং চেকোস্লোভাক-সোভিয়েত চুক্তি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমনকী আজও সোভিয়েত রাশিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মেলাতে উৎসুক। এবারে তুমি বলবে কি, তোমার কী বৈদেশিক নীতি? ভাপে ভরা আবেগ আর ভাল ভাল কথার বিন্যাস দিয়ে বৈদেশিক নীতি তৈরি হয় না। সব সময় নিষ্ফল প্রয়াসের ধ্বজা ধরে কোনও

লাভ নেই, তেমনই একদিকে জার্মানি ও ইতালির মতো দেশগুলিকে শাপান্ত করে, অন্যদিকে ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের গুণগান করেও কিছু লাভ হবে না।

কিছুদিন থেকে আমি মহাত্মা গান্ধীকে এবং তোমাকে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করছি যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে ভারতের স্বার্থে আমাদের কাজে লাগাতে হবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে চরমপত্রের আকারে আমাদের জাতীয় দাবি ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তোমার বা মহাত্মাজির মনে আমি কোনও রেখাপাত করতে পারিনি যদিও ভারতের জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ আমাকে সমর্থন করেছে এবং ইংল্যাণ্ডের ভারতীয় ছাত্ররা আমার নীতি সমর্থন করে অনেকের সই করা এক বিবৃতি আমার কাছে পাঠিয়েছে। ত্রিপুরি প্রস্তাবের বেড়িতে আমাকে বেঁধে রেখে কেন আমি তাড়াতাড়ি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করছি না বলে আজ যখন তুমি আমাকে দোষারোপ করতে ছাড়ছ না, সেই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি হঠাৎ তোমার চোখে অত্যধিক গুরুত্বের বিষয় হয়ে দেখা দিল। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, ইউরোপে আজ এমন কী ঘটল যা অপ্রত্যাশিত? আন্তর্জাতিক রাজনীতির খবর রাখে এরকম প্রতিটি লোক কি জানত না বসন্তকালে ইউরোপে একটা সংকট দেখা দেবে? ব্রিটিশ সরকারের কাছে চরমপত্র দেওয়া কত জরুরি তা বোঝাবার জন্যে বারেবারে আমি কি একথা বলিনি?

এবারে তোমার বিবৃতির আরেকটা অংশ সম্পর্কে বলছি। তুমি বলেছ ঃ "আপাততঃ ওয়ার্কিং কমিটি বলে কিছু নেই। প্রেসিডেন্ট, তাঁর নিজের ইচ্ছামতো, অবাধে প্রস্তাবগুলি রচনা করে কংগ্রেসের কাছে উপস্থাপিত করতে চান। তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্যেও এখনও কোনও মিটিং ডাকা হয়নি।" এইরকম অর্ধসত্য— তাই বা কেন, অসত্য বলার মনোবৃত্তি তোমার কি করে হল, ভেবে অবাক হচ্ছি। ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্য হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের পদত্যাগপত্র আমার মুখের উপর ছুড়ে দিয়ে গেল, তবু তাদের কোনও দোষ তুমি দেখতে পেলে না, দেখলে আমার, যেহেতু তুমি কল্পনায় ধরে নিলে যে সম্ভবত আমি প্রস্তাবগুলি নিজের ইচ্ছামতো রচনা করতে চেয়েছি। এ ছাড়া, দৈনন্দিন কাজ চালাতে কবে আমি তোমাদের বাধা দিয়েছি? ত্রিপুরি কংগ্রেস পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটি মুলতুবি রাখতে বলেছিলাম, ঠিকই। তা সত্ত্বেও সর্দার প্যাটেলকে যে টেলিগ্রাম করেছিলাম তাতে কি আমি বলিনি, কংগ্রেসের জন্য প্রস্তাব রচনার আসল কাজ সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের কী মত আমাকে যেন জানিয়ে দেন? এ বিষয়ে যদি তোমার কোনও সন্দেহ থাকে, তাহলে সর্দারকে যে টেলিগ্রাম করেছিলাম তা একবার দেখতে অনুরোধ করি। আমার টেলিগ্রাম ছিল এই :

সর্দার প্যাটেল, ওয়ার্ধা।

মহাত্মাজিকে করা আমার টেলিগ্রাম অনুগ্রহপূর্বক দেখিবেন। দুঃখের সঙ্গে বোধ করিতেছি ওয়ার্কিং কমিটিকে কংগ্রেস পর্যন্ত মুলতবি রাখিতে হইবে। সহকর্মীদের পরামর্শ লইয়া টেলিগ্রামে অভিমত জানাইতে অনুরোধ করি।

—সুভাষ

ত্রিপুরি কংগ্রেস শেষ হবার সাতদিন পরে তুমি আমাকে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম কর যে, কংগ্রেসের কার্যকলাপে অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্যে আমি দায়ী। তোমার তো ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রবল, তবু এটুকু তোমার খেয়ালে এল না যে, ত্রিপুরি কংগ্রেসে যখন পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন ভালমতোই জানা ছিল আমি গুরুতর অসুস্থ এবং মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরিতে

আসেননি, অতএব আমাদের দু'জনের মধ্যে অবিলম্বে সাক্ষাৎ হওয়া কঠিন। তোমার এও খেয়ালে এল না, গঠনতন্ত্রবিরুদ্ধ ও অবৈধ উপায়ে আমার হাত থেকে ওয়ার্কিং কমিটি নিয়োগের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কংগ্রেসই এই অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্যে দায়ী। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গঠনতন্ত্রকে এমন হেলাভরে যদি অমান্য না করত তা হলে ১৯৩৯-এর ১৩ মার্চ আমি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতাম। কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হবার মাত্র সাত দিন পরে তুমি আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন শুরু করে দিলে যদিও আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা তুমি ভালভাবেই জানতে। আমাকে পাঠানো তোমার টেলিগ্রাম আমার কাছে পৌঁছবার আগেই খবরের কাগজে বেরিয়ে গেল। ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্যের পদত্যাগ করার ফলে ত্রিপুরির আগে পুরো এক পক্ষকাল কংগ্রেসের কার্যকলাপে যখন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিবাদে তুমি একটি কথাও বলেছিলে? আমাকে কি একটুও সহানুভূতি জানিয়েছিলে? হালে তুমি এক চিঠিতে বলেছ, তুমি যা কর বা বল তা সম্পূর্ণ নিজের থেকে, কেউ যেন মনে না করে অপরের হয়ে তুমি তা বলছ। আমাদের দুর্ভাগ্য, তোমার কখনওই মনে হয় না যে অপরে তোমাকে দক্ষিণপন্থীদের প্রতিনিধির ভূমিকাতেই দেখে থাকে। ২৬ মার্চ তারিখের তোমার শেষ চিঠির কথাই ধরা যাক। তুমি সেখানে বলেছ, "আজ খবরের কাগজে তোমার বিবৃতি পড়লাম। এইরকম যুক্তিতর্ক দেখিয়ে বিশেষ কিছু সুবিধা হবে বলে মনে হয় না।"

চতুর্দিক থেকে আমার উপর যখন অন্যায় ও অশোভনভাবে আক্রমণ চালানো হচ্ছে, প্রতিবাদে একটি কথাও তুমি বলছ না, আমার জন্যে সহানুভূতির কণামাত্রও তোমার নেই। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে যখনই কিছু বলছি অমনি তার প্রতিক্রিয়ায় তুমি বলছ "এইরকম যুক্তিতর্ক দেখিয়ে বিশেষ কিছু সুবিধা হবে না।" আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা যুক্তিতর্ক দেখিয়ে যখন বিবৃতি দিয়েছিল তখন কি তুমি একথা বলেছিলে? খুব সম্ভব তা দেখে তুমি আনন্দে গদগদ হয়েছে।

২২ ফেব্রুয়ারি তারিখের বিবৃতিতে তুমি আরও বলেছ, "কংগ্রেসের স্থানীয় বিবাদবিসংবাদগুলো সাধারণত বাঁধাধরা প্রণালীতে না মেটানোর একটা ঝোঁক এসেছে, সরাসরি উপর থেকে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং তার ফলে বিশেষ বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর উপর নেকনজর পড়ে বেশি, বিভ্রান্তি বেড়ে চলে এবং কংগ্রেসের কাজের ক্ষতি হয়।... আমার দেখে কষ্ট হয় যে, আমাদের সংগঠনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে নতুন নতুন প্রণালী প্রবর্তন করা হচ্ছে, তার একমাত্র পরিণতি হবে এই যে, স্থানীয় সংঘর্ষ দেখা দেবে এবং তা উপরতলাতেও ছড়িয়ে পড়বে।"

সব ঘটনা ও তথ্য জানবার তুমি চেষ্টাও করলে না অথচ এই রকম একটা অভিযোগ করলে যা পড়ে আমি যেমন বেদনাবোধ করেছি তেমনই অবাকও হয়েছি। অন্তত এইটুকু তো করতে পারতে, আমি যা ঘটনা জানি আমাকে তা জানাতে তো বলতে পারতে। আমি জানি না, একথা যখন তুমি লিখেছ তোমার মনে তখন কী ছিল? আমার এক বন্ধু আন্দাজ করছেন, তুমি তখন দিল্লি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কথা ভাবছিলে। তাই যদি সত্যি হয়, তা হলে খোলাখুলি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, দিল্লি সম্পর্কে আমি যা করেছি আমার কাছে তাই ছিল একমাত্র সংগত কাজ।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, উপরতলা থেকে নিয়মিত হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে কোনও কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট তোমাকে হারাতে পারবে না। সম্ভবত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তুমি যা কিছু করেছ সবই ভুলে গেছ, অথবা নিজেকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখা কষ্টকর। ২২ ফেব্রুয়ারি তুমি আমার নামে অভিযোগ করেছ, উপর থেকে আমি হস্তক্ষেপ করেছি। ৪ ফেব্রুয়ারি আমাকে লেখা একটা চিঠিতে তুমি আমার নামে যে অভিযোগ করেছিলে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি নিষ্ক্রিয়, আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না, সে কথা কি ভুলে

গিয়েছিলে? তুমি লিখেছিলে, "কার্যত দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্টের পরিচালন করার দায়িত্ব পালন করা থেকে তুমি স্পিকারের কাজই করছ বেশি।" সবচেয়ে আপত্তিকর তোমার এই অভিযোগ যে আমার কাজে পক্ষপাতিত্ব আছে এবং আমি কোনও বিশেষ দল বা গোষ্ঠীকে বেশি সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের নামে খবরের কাগজে প্রকাশ্যে এইরকম গুরুতর অভিযোগ বার করার আগে কংগ্রেস সংগঠনের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর কাছে (ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে না হলেও) এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করে দেখা তোমার কি কর্তব্য ছিল না?

নির্বাচন সংক্রান্ত বাকবিতণ্ডাকে সমগ্রভাবে দেখলে আশা করা স্বাভাবিক যে, নির্বাচন হয়ে গেলে সব ব্যাপারটা সবাই ভুলে যাবে এবং সবার মধ্যে মিটমাট হয়ে যাবে, বক্সিং খেলার পরে প্রতিদ্বন্দ্বীরা হাতে হাত মিলিয়ে যেমন সব মিটিয়ে ফেলে। কিন্তু সত্য ও অহিংসা সত্ত্বেও তা হল না। নির্বাচনের ফলকে খেলোয়াড়ের মন নিয়ে গ্রহণ করা হল না, আমার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পুষে রাখা হল এবং প্রতিহিংসাবৃত্তি কাজ করতে লেগে গেল। তুমি ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের হয়ে মুগুর ঘোরাতে শুরু করলে, অবশ্য সে অধিকার তোমার নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তোমার কি একবারও মনে হয়নি যে, আমার সপক্ষেও কিছু বলা যেতে পারে? আমার অনুপস্থিতিতে, আমার অলক্ষ্যে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা যে মিলিত হয়ে স্থির করলেন ডক্টর পট্টভিকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে দাঁড় করানো হবে এতে কি কিছুই অন্যায় ছিল না? ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে সর্দার প্যাটেল ও আর সবাই ডক্টর পট্টভিকে সমর্থন করার জন্যে কংগ্রেস ডেলিগেটদের কাছে যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তাতেও কি কোনও অন্যায় ছিল না? নির্বাচনী স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সর্দার প্যাটেল যে মহাত্মা গান্ধীর নাম ও কর্তৃত্বকে পুরো কাজে লাগিয়েছিলেন তাতে অন্যায় কিছু ছিল না? আমাকে পুনর্নির্বাচিত করলে দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, সর্দার প্যাটেলের এই উক্তিতে কি অন্যায় কিছুই ছিল না? ভোট জোগাড় করার জন্যে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীকে কাজে লাগানোয় অন্যায় কিছুই ছিল না?

তথাকথিত "অপবাদ" সম্পর্কে আমার যা বলার খবরের কাগজে বিবৃতিতে এবং ত্রিপুরিতে সাবজেকটস কমিটির কাছে আমার বক্তব্যে আমি আগেই বলেছি। কিন্তু তোমাকে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। লর্ড লোথিয়ান যখন ভারত পরিভ্রমণ করছিলেন তখন তিনি প্রকাশ্যে মন্তব্য করেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে সব কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে মেলে না— একথা কি তুমি ভুলে গেছ? এই মন্তব্যের তাৎপর্য ও গূঢ়ার্থ কী?

২২ ফেব্রুয়ারি তারিখের তোমার বিবৃতিতে তুমি অভিযোগ করেছ, উপরতলার আবহাওয়া পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসে কলুষিত। তুমি কি শুনে রাখবে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে অবধি তোমার সময়ের থেকে আমার সময়ে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে অনেক কম সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল? অন্তত তার ফলে আমাদের কখনই পদত্যাগ করার অবস্থায় আসতে হয়নি, তোমাকে যেমন, তোমারই কথানুযায়ী, একাধিকবার সে অবস্থায় আসতে হয়েছিল। আমি যতদূর বুঝতে পারছি, আসল গোলমাল শুরু হয়েছে নির্বাচন দ্বন্দ্বে আমার জয়লাভ করা থেকে। আমি যদি হেরে যেতাম তা হলে সম্ভবত জনসাধারণ "অপবাদ" ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানতেই পেত না।

তুমি যা বল নিজের কথা বল, তুমি কারও প্রতিনিধিত্ব কর না, তুমি কোন দলেও নেই— নিজেকে এইভাবে জাহির করা তোমার অভ্যাস। সময়ে সময়ে এইসব কথা এমনভাবে বল যাতে মনে হয় এইজন্যে তুমি গর্বিত ও সুখী। একই সঙ্গে কিন্তু নিজেকে তুমি সমাজতন্ত্রী, সময় সময় ঝানু সোশ্যালিস্ট বলে পরিচয় দাও। একজন সমাজতন্ত্রী কী করে তোমার মতো নিজেকে স্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবতে পারে— আমার বুদ্ধির অগম্য। একটি আরেকটির বিপরীত তত্ত্ব। তোমার স্বাতন্ত্র্যবাদের ধারায় কী করে সমাজতন্ত্র আসতে পারে, তাও আমার কাছে রহস্য। নির্দলীয়

তকমা নিলে সব দলের কাছে জনপ্রিয় হতে পারা যায়, ঠিক, কিন্তু তার মূল্য কী? যদি কারও কোনও মতে বা নীতিতে বিশ্বাস থাকে, তার তো চেষ্টা হওয়া উচিত সেই মত ও নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করা এবং করতে হলে একমাত্র পার্টি বা সংগঠন মারফতই করতে হবে। পার্টির মাধ্যমে ছাড়া কোনও দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা প্রসার লাভ করেছে, আমি শুনিনি। এমনকী মহাত্মা গান্ধীরও নিজের পার্টি আছে।

আরও একটি বিষয়ে তুমি প্রায়ই বলে থাক। বিষয়টা জাতীয় ঐক্য। এ সম্পর্কেও আমার কিছু বলার আছে। আমি মনেপ্রাণে ঐক্য চাই, আমার বিশ্বাস দেশের সবাই তাই চায়। কিন্তু তা একটি শর্তসাপেক্ষ। আমরা যে ঐক্যের প্রয়াসী বা যে ঐক্য রক্ষা করতে চাই তা কর্মের ঐক্য, নিষ্কর্মের ঐক্য নয়। ভাঙন সবক্ষেত্রেই খারাপ নয়। প্রগতির স্বার্থে মাঝে মাঝে ভাঙনেরও প্রয়োজন হয়। ১৯০৩ সালে রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি যখন বলশেভিক ও মেনশেভিক দলে ভেঙে গেল, লেনিন তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মেনশেভিকদের জগদ্দল সরে যাওয়াতে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন এবং বুঝতে পারলেন এবারে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে বাধা নেই। ভারতবর্ষেও "মডারেটরা" যখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এল, প্রগতিশীল কেউই তাই নিয়ে আক্ষেপ করেনি। আরও পরে ১৯২০ সালে কংগ্রেসকর্মীদের একটা বড় অংশ যখন কংগ্রেস ছেড়ে আসে, যারা রইল তারা তাদের চলে যাওয়া নিয়ে আপসোস করেনি। এই ভাঙনগুলি আসলে প্রগতিরই সহায়ক। সম্প্রতি আমরা যেন অন্ধভাবে ঐক্যের দোহাই দিয়ে চলেছি। এতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। একে দুর্বলতার সাফাই হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, অথবা এর দোহাই দিয়ে এমন আপস করিয়ে নেওয়া যেতে পারে যা মূলত প্রগতিবিরোধী। তোমার নিজের কথাই ধরো। তুমি গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরুদ্ধে ছিলে— কিন্তু ঐক্যের খাতিরে তা মেনে নিলে। পরে, প্রদেশে সরকারি ক্ষমতা গ্রহণের বিরুদ্ধে তুমি ছিলে, কিন্তু যখন ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সম্ভবত একই কারণে তুমি তাও স্বীকার করে নিলে। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে পাকেপ্রকারে কার্যকর করতে রাজি হল, তখন যারা যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী তারা তাদের দৃঢ় অভিমত থাকা সত্ত্বেও ওই একই ঐক্যের খাতিরে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের বিবেকের অনুশাসন অগ্রাহ্য করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে মেনে নিতে প্রলুব্ধ হতে পারে। বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐক্যই লক্ষ্য নয়, তা উপায়মাত্র। যতদিন তা প্রগতির অনুকূল, ততদিনই তা কাম্য। যখনই তা প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চায়, তখনই তা ক্ষতিকর। কংগ্রেস যদি অধিকাংশের মতানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে গ্রহণ করাই ঠিক করে, তা হলে, বলবে কি তুমি কী করবে? তুমি কি সেই সিদ্ধান্তকে মেনে নেবে, না, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে?

৪ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদ থেকে লেখা তোমার চিঠিটা একটু অন্যরকমের, এতে দেখছি আমার সম্পর্কে তোমার মনোভাব তেমন কঠোর হয়ে ওঠেনি, পরে যেমন হয়েছে। যেমন সেই চিঠিতে তুমি বলেছ, "আমি যেমন বলেছিলাম, প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে তোমার নির্বাচনে কিছুটা ভালও হয়েছে, কিছুটা খারাপও হয়েছে।" পরে তোমার ধারণা হয় আমার দ্বিতীয়বারের নির্বাচন একেবারে নির্ভেজাল গর্হিত ব্যাপার। এরও পরে তুমি লিখেছ, "এই ভবিষ্যৎকে আমাদের দেখতে হবে ব্যাপকতর দৃষ্টিকোণ থেকে, ব্যক্তিবিশেষের দিক থেকে দেখলে চলবে না। আমাদের মনের মতো সব কিছু হচ্ছে না বলে অধৈর্য হওয়া সম্ভবত আমাদের কারও উচিত নয়। যাই ঘটুক না কেন আদর্শের জন্যে আমাদের সব কিছু দিতে হবে।" স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত "অপবাদ" ব্যাপারটার উপরে পরে যে গুরুত্ব দিয়েছ তা দাওনি। শুধু তাই নয়; এর আগেই আমি দেখিয়েছি "অপবাদ" ব্যাপারটা নিয়ে পরে যে চাঞ্চল্য দানা বাঁধে তাও মুখ্যত

তোমারই সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে হয়তো তোমার মনে আছে, শান্তিনিকেতনে আমাদের মধ্যে যখন দেখা হয় তখন তোমাকে আমি একথা বলি যে আমাদের সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের, সহযোগিতা যদি না পাওয়া যায়, কংগ্রেসকে চালিত করার দায়িত্ব আমরা এড়াতে পারি না। তখন তুমি আমার কথায় সায় দিয়েছিলে। পরে, কী কারণে আমি জানি না, তুমি যেন একেবারে সশরীরে অপরপক্ষে গিয়ে ভিড়লে। তা করবার অধিকার অবশ্যই তোমার আছে, তবে তোমার সমাজতন্ত্র ও বামপন্থার হাল কী হবে?

৪ ফেব্রুয়ারি তারিখের চিঠিতে তুমি একাধিকবার অভিযোগ করেছ, আমার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ফেডারেশনের মতো জরুরি বিষয় নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি। এ এক অদ্ভুত অভিযোগ যখন তুমি নিজেই প্রায় ছয়মাস ছিলে দেশের বাইরে। তুমি কি জানো, শ্রীভুলাভাই দেশাইয়ের লন্ডনে দেওয়া তথাকথিত বক্তৃতার উপর এখানে যখন ঝড় উঠেছিল, আমি তখন ওয়ার্কিং কমিটিকে বলি, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব নেওয়া আছে তার পুনরাবৃত্তি করা আমাদের উচিত, সেই সঙ্গে দেশে ফেডারেশন-বিরোধী প্রচারও চালাতে হবে এবং কমিটি তা অপ্রয়োজনীয় মনে করে। তুমি কি জানো পরে সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লি বৈঠকে ফেডারেশনের নিন্দা করে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রয়োজন বলে শেষ পর্যন্ত বিবেচিত হয় এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়?

ওই চিঠিতে তুমি আরও একটা অভিযোগ করেছ, আমি নাকি ওয়ার্কিং কমিটিতে একেবারে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকতাম এবং বস্তুত আমার কাজকর্মে স্পিকারের সঙ্গে মিল ছিল বেশি, প্রেসিডেন্ট যে কমিটিকে চালায়— তার সঙ্গে তেমন মিল ছিল না। মন্তব্যটা একটু বেশিমাত্রায় নির্মম হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির বেশির ভাগ সময় সে সাধারণত তুমিই নিয়ে নিতে, একথা বললে কি ভুল বলা হবে? ওয়ার্কিং কমিটিতে তোমার মতো বাক্যবাগীশ আরও একজন সদস্য থাকলে, আমার মনে হয় আমরা কখনও আমাদের কাজ শেষ করে উঠতে পারতাম না। তা ছাড়া তোমার হাবেভাবে মনে হত প্রেসিডেন্টের সব কাজের দায়িত্ব তুমিই বুঝি নিয়ে নেবে। আমি অবশ্য তোমাকে সংযত করে অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারতাম, কিন্তু তা হলে আমাদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হয়ে যেত। নির্মম সত্য বলতে গেলে, ওয়ার্কিং কমিটিতে সময় সময় তুমি বয়ে যাওয়া ছেলের মতো আচরণ করতে এবং প্রায়ই মেজাজ গরম করতে। কিন্তু, তোমার এত লম্ফঝম্প, এমন দুমদাম চটে ওঠা সত্ত্বেও লাভ করেছ কী? সাধারণত তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকে চলতে কিন্তু শেষকালে সব মেনে নিতে। সর্দার প্যাটেল ও আর সবাই তোমাকে কায়দা করার একটা তুখোড় কৌশল জানতেন। তাঁরা তোমাকে সমানে বকে যেতে দিতেন, শেষকালে তাঁদের প্রস্তাবের খসড়াটা তাঁরা তোমাকে লিখতে বলতেন। প্রস্তাবের খসড়া লেখার সুযোগ পেলে— সে-প্রস্তাব যারই হোক না কেন, তুমি দারুণ খুশি হয়ে যেতে। কদাচিৎ আমি দেখেছি তুমি শেষ পর্যন্ত নিজের মতে স্থির থেকেছ।

আমার বিরুদ্ধে আর এক অদ্ভুত অভিযোগ, গত এক বছরের মধ্যে এআইসিসি-র আপিসের নাকি দারুণ অবনতি ঘটেছে। প্রেসিডেন্টের কাজের দায়িত্ব বলতে তুমি কী বোঝ আমার জানা নেই। আমার মতে, প্রেসিডেন্ট উচ্চপর্যায়ের একজন কেরানি, এমনকী উচ্চপর্যায়ের একজন সেক্রিটারির থেকে অনেক বড় কিছু। প্রেসিডেন্ট থাকা কালে তুমি সেক্রেটারির কর্তব্য তাকে করতে না দিয়ে নিজেই করতে, তাই বলে অন্য প্রেসিডেন্টরাও তাই-ই করবে এমন কোনও কারণ নেই। এ কথা ছাড়াও, আমার প্রধান অসুবিধা ছিল, এআইসিসি-র আপিসটা ছিল দূরে এবং জেনারেল সেক্রেটারিকে প্রেসিডেন্টের অনুগত থাকা উচিত বলতে যা বোঝায় (আমি ইচ্ছা করেই বিষয়টি অত্যন্ত নম্রভাবে বলছি) আমার প্রতি জেনারেল সেক্রেটারির সেই আনুগত্য ছিল না, তা হলেও খুব বেশি বলা হবে না। সত্যি কথা বলতে কি, কৃপালনিজিকে আমার উপর

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হয়তো তোমার মনে আছে, এআইসিসি-র আপিসের একটা অংশকে আমি কলকাতায় নিয়ে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম যাতে তার কাজ আমি ঠিকমতো দেখাশোনা করতে পারি। তখন তোমরা সবাই মিলে আমাকে তা করতে দাওনি, অথচ আজ তোমরাই এআইসিসি-র আপিসের গলদের জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকেই দোষী করছ। তোমার অভিযোগমতো সত্যিই যদি এআইসিসি-র আপিসের অবনতি ঘটে থাকে, তার জন্যে দায়ী জেনারেল সেক্রেটারি, আমি নই। একমাত্র যে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনতে পার তা এই যে, আমার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে জেনারেল সেক্রেটারির কার্যকলাপে কম হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এবং তিনি কার্যত আগের থেকে অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করেছেন। অতএব, এআইসিসি'র আপিসের সত্যিই যদি অবনতি ঘটে থাকে, তার জন্যে জেনারেল সেক্রেটারিই দায়ী, আমি নই।

আমি অবাক হচ্ছি, তুমি আসল খবর কিছু না জেনে আমার নামে অভিযোগ করেছ বোম্বাই ট্রেড ডিসপিউট বিলটি বর্তমান আকারে আইনে পরিণত হবার সময় আমি আমার সাধ্যমতো বাধা দিইনি। প্রকৃতপক্ষে দেখছি যেখানে আমি জড়িত, সেখানে, আসল ঘটনা কী তা জানবার চেষ্টা না করে আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবার, সময় সময় প্রকাশ্যে তা করার, দক্ষতা তুমি সম্প্রতি অর্জন করেছ। এই বিষয়ে আমি কী করেছি যদি তা জানতে চাও, স্বয়ং সর্দার প্যাটেলকে জিজ্ঞাসা করলে ভালভাবে জানতে পারবে। একমাত্র আমি যা করিনি তা হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা। যদি তা অপরাধ হয়ে থাকে, আমি সেই অপরাধ স্বীকার করছি। প্রসঙ্গত তুমি কি জানো বোম্বাই শাখার কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বর্তমান আকারে বিলটিকে সমর্থন জানিয়েছিল? এবার তোমার কথায় আসছি। বিলটি যাতে আইনে পরিণত না হয় সেইজন্যে তুমি কী করেছ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? তুমি যখন বোম্বাইয়ে ফিরে এসেছিলে, তখনও তোমার কিছু করবার মতো সময় ছিল। যতদূর জানি কিছু ট্রেড ডিসপিউট কর্মী তোমার সঙ্গে দেখাও করেছিল এবং তাদের তুমি কিছুটা আশ্বাসও দিয়েছিলে। আমার চেয়ে তুমি ছিলে অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থায়; কারণ আমার থেকে অনেক বেশি তুমি মহাত্মা গান্ধীকে প্রভাবিত করতে পারতে। যদি তুমি নিজে থেকে চেষ্টা করতে, আমি যেখানে কিছু করতে পারিনি, তুমি সফল হতে পারতে। সে চেষ্টা কি তুমি করেছিলে?

একটি ব্যাপার সম্পর্কে প্রায়ই তুমি আমাকে খোঁচা দাও— কোয়ালিশন মন্ত্রিত্ব নিয়ে। মতান্ধ রাজনীতিবিদের মতো তুমি পাকাপাকি ঠিক করে ফেলেছ কোয়ালিশন মন্ত্রিত্ব দক্ষিণপন্থী একটা চাল। এই প্রশ্নে চূড়ান্ত রায় দেবার আগে অনুগ্রহ করে একটা কাজ করবে? দু'সপ্তাহের জন্যে একবার আসাম প্রদেশ ঘুরে এসে আমাকে জানাবে কি সেখানকার বর্তমান কোয়ালিশন মন্ত্রিত্ব প্রগতিশীল না প্রতিক্রিয়া পন্থী? এলাহাবাদে বসে বসে বিজ্ঞের মতো বুলি আউড়িয়ে লাভ কি? যে সব বুলির সঙ্গে প্রকৃত অবস্থার কোনও যোগ নেই? সাদুল্লা মন্ত্রিসভার পতনের পর আমি যখন আসামে যাই আমার এমন একজনও কংগ্রেসকর্মীর সঙ্গে দেখা হয়নি যে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা যে সম্ভব একথা জোরের সঙ্গে বলেনি। আসল কথা সারা প্রদেশ প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভার দাপটে কাতরাচ্ছিল। অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটছিল এবং দুর্নীতি বেড়েই চলেছিল। কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন আসামবাসী মাত্রই নতুন মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেখে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলও আবার তাদের আত্মবিশ্বাস ও আশাভরসা ফিরে পেল। যদি সারাদেশের পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণের নীতিকে তুমি নাকচ কর, আমি তাতে স্বাগত জানাব এবং আমার সঙ্গে আসাম ও বাংলার কংগ্রেসকর্মীরাও তা জানাবে। কিন্তু কংগ্রেস পার্টি যদি সাতটি প্রদেশের শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নেয়, তা হলে অন্যান্য অংশে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতেই হবে। আসামে জোট মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে নানা

বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কী উন্নতি হয়েছে যদি জানতে তা হলে তুমি তোমার মত একেবারে পালটিয়ে ফেলতে।

বাংলা সম্পর্কে আমার মনে হয় তুমি তেমন কিছুই জানো না। দু'বছর প্রেসিডেন্ট থাকাকালে কখনই তোমার মনে হয়নি এই প্রদেশটায় একবার যাওয়া দরকার, যদিও যে ভয়াবহ নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে সেই প্রদেশকে যেতে হয়েছে তা ভাবলে অন্য সব প্রদেশের থেকে ওই প্রদেশেই তোমার বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল। হক মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে এই প্রদেশে কী ঘটেছে কখনও কি তা জানতে চেয়েছ? যদি জানতে তা হলে রাজনীতির মতান্ধের মতো কথা কইতে না। তা হলে আমার সঙ্গে একমত হয়ে স্বীকার করতে যে প্রদেশটিকে যদি বাঁচাতে হয়, হক মন্ত্রিসভাকে বিদায় নিতেই হবে এবং বর্তমান অবস্থায় যে সরকার সবচেয়ে ভাল, অর্থাৎ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা, তাই প্রতিষ্ঠা করা দরকার। কিন্তু এসব কথা বলবার সময় আমি এটুকুও বলে রাখতে চাই যে, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার কথা উঠছে যেহেতু পূর্ণ স্বরাজের জন্য স্বয়ংক্রিয় সংগ্রাম স্থগিত রাখা হয়েছে। কাল এই সংগ্রাম শুরু করো, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সব কথা শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

এবারে ২০ মার্চ তারিখে দিল্লি থেকে যে টেলিগ্রাম করেছ তার কথা উল্লেখ করছি। তাতে তুমি বলেছ, "আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সংকটাপন্ন জাতীয় সমস্যার দরুন ওয়ার্কিং কমিটি দপ্তর ব্যবস্থার জরুরি প্রয়োজন" ইত্যাদি। ওয়ার্কিং কমিটি তাড়াতাড়ি গঠন করা যে প্রয়োজন যে-কেউ তা বোধ করতে পারে— কিন্তু তোমার টেলিগ্রামটার প্রথমেই যা নজরে পড়ে তা হচ্ছে আমি যে দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে চলেছি সে সম্পর্কে তোমার সহানুভূতির চূড়ান্ত অভাব। তুমি ভালমতোই জানতে পন্থ প্রস্তাব যদি উত্থাপন করা না হত ও গৃহীত না হত, ১৩ মার্চই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা যেত। ওই প্রস্তাব যখন গৃহীত হয়, কংগ্রেস তখন ভালমতোই জানত যে আমি গুরুতর অসুস্থ, জানত, মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরিতে আসেননি, এবং এও জানত যে নিকট ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়া দুষ্কর। ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হল না, এদিকে একমাস কেটে গেল, এতে জনসাধারণ যে স্বাভাবিক কারণেই চঞ্চল হয়ে উঠবে তা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু এই বিক্ষোভ শুরু করা হয়েছে ত্রিপুরি কংগ্রেস শেষ হয়ে যাবার ঠিক এক সপ্তাহ পর থেকে এবং এক্ষেত্রেও— "অপবাদ" ব্যাপারের মতোই— তুমিই আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ করেছ। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা না করে কি সহজেই ওয়র্কিং কমিটি গঠন করা যেত? মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার দেখা করা কীভাবে সম্ভবপর ছিল? তুমি কি ভুলে গিয়েছিলে গত বছর হরিপুরা কংগ্রেসের প্রায় ছ'সপ্তাহ পরে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসেছিল? খবরের কাগজে তোমার টেলিগ্রাম বার হবার পরে জনসাধারণ ও সংবাদপত্রের এক অংশ আমার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ শুরু করে, তুমি কি মনে কর তা সরল ও অকপট মনে করা হয়েছে? আমার ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির গঠন বন্ধ রেখে আমি কি জ্ঞাতসারে কংগ্রেসে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করছি? আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ যদি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত না হয়ে থাকে, রোগশয্যায় যখন আমি শায়িত তখনও আমার হয়ে সর্বজনস্বীকৃত নেতারূপে তুমি কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করেছ কি?

আমি প্রেসিডেন্ট থাকাকালে এআইসিসি-র অবনতি ঘটেছে, তোমার এই অভিযোগের উল্লেখ আমি আগেই করেছি। সেই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলতে চাই। তোমার কি খেয়াল ছিল না, আমাকে হেয় করতে গিয়ে জেনারেল সেক্রেটারিকে তো হেয় করেছই, সেইসঙ্গে আপিসের সব কর্মচারীকেও হেয় করেছ?

তোমার টেলিগ্রামে "সংকটাপন্ন জাতীয় সমস্যার" কথা উল্লেখ করেছ এবং সেইজন্যে তুমি চাও এখনই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হোক— যদিও, তোমার কথামতো, তুমি নিজে ওয়ার্কিং

কমিটির অন্তর্ভুক্ত হতে চাও না। এই "সংকটাপন্ন জাতীয় সমস্যাগুলি" কী বলবে কি? আগের এক চিঠিতে তুমি বলেছ, সবচেয়ে সংকটজনক সমস্যা রাজকোট ও জয়পুর পরিস্থিতি। যেহেতু এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যা করবার মহাত্মাজি নিজেই করছেন, একপক্ষে সেগুলি ওয়ার্কিং কমিটি ও এআইসিসি-র এক্তিয়ারের বাইরে।

এ ছাড়াও তোমার টেলিগ্রামে তুমি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছ। তোমার এ কথা বলার পর আমি খবরের কাগজে লক্ষ করলাম কয়েকজন লোক যাদের আন্তর্জাতিক বোধ বলতে কিছু নেই, ভারতের স্বার্থের দিক থেকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বোঝবার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় যাদের নেই, হঠাৎ তারা বোহেমিয়া ও স্লোভাকিয়ার ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠেছে। স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে আমাকে অপদস্থ করতে সুবিধামাফিক একটা হাতিয়ার পাওয়া গেছে। গত দু'মাসে ইউরোপে এমন কিছু ঘটেনি যা প্রত্যাশিত ছিল না। সম্প্রতি চেকোস্লোভাকিয়ায় যা ঘটেছে তা মিউনিখ চুক্তির পরিণাম মাত্র। প্রকৃপক্ষে, ইউরোপ থেকে যে খবর পাচ্ছি তার ভিত্তিতে গত ছ'মাস ধরে আমি আমার কংগ্রেসি বন্ধুদের বলে আসছি যে, ইউরোপে বসন্তকালে একটা সংকট দেখা দেবে এবং তা থাকবে গ্রীষ্ম পর্যন্ত। এইজন্যে আমাদের তরফ থেকে সক্রিয় একটা কিছু করবার জন্যে, যেমন, ব্রিটিশ সরকারের কাছে পূর্ণ স্বরাজ দাবি করে চরমপত্র দেবার জন্যে চাপ দিয়ে আসছি। আমার মনে আছে (শান্তিনিকেতনে বা এলাহাবাদে) সম্প্রতি একবার তোমাকে যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা বলি এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে আমাদের জাতীয় দাবি পেশ করার যুক্তি হিসেবে যখন তার উল্লেখ করি, নিস্পৃহভাবে তুমি জবাব দিয়েছিলে, আন্তর্জাতিক সংকট কয়েক বছর ধরে চলবে। হঠাৎ দেখছি তুমি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠেছ! তবে একথা তোমাকে বলে রাখছি: তোমার দিক থেকে বা গান্ধীবাদীদের দিক থেকে আমাদের স্বার্থে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে সদ্ব্যবহার করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তোমার টেলিগ্রামে সবসময় তুমি বল, আন্তর্জাতিক সংকটের দিক থেকে এআইসিসি-র শীঘ্র বৈঠক একান্ত দরকার। কিন্তু কেন? গালভরা বড়বড় কথায় তৈরি দীর্ঘ এক প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য, যার প্রকৃত কোনও কার্যকারিতা নেই? অথবা তুমি কি তোমার মনোভাব পাল্টে এআইসিসি-কে বলবে, এবারে আমাদের পূর্ণ স্বরাজের জন্যে এগিয়ে যেতে হবে এবং ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্রের আকারে আমাদের জাতীয় দাবি পেশ করতে হবে? না, তা হবে না। আমি মনে করি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি গভীরভাবে অনুধাবন করে আমাদের স্বার্থে যাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করা যায়, হয় সেই চেষ্টা করা উচিত, নয়তো, এসব ব্যাপার নিয়ে কোনও কথা বলাই উচিত নয়। কাজ করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য না হয়, ঢাক পিটিয়ে কোনও লাভ নেই।

আমি শুনলাম, তুমি যখন দিল্লিতে তখন মহাত্মাজির কাছে এই মর্মে এক সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও যে মৌলানা আজাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তাঁর একবার এলাহাবাদে যাওয়া দরকার। খবরটা সম্পূর্ণ ভুল হতে পারে। যদি তা না হয়, তুমি কি তাঁকে একবার ধানবাদেও যেতে বলেছিলে? ডাক্তারের নিষেধ থাকার দরুন মহাত্মাজি ধানবাদে আসতে পারছেন না, সংবাদপত্রের এই খবর প্রতিবাদ করবার জন্যে আমার সেক্রেটারি ২৪ মার্চ যখন তোমাকে টেলিফোন করে, তখন তাঁর ধানবাদে আসা সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে কোনও আগ্রহ প্রকাশ পায়নি, যদিও গান্ধীজির ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির গঠন আমাকে ঘোষণা করতে হবে এবং সেজন্যে তোমার উদ্বেগের সীমা নেই। টেলিফোনেই তুমি জানিয়ে দিয়েছিলে ধানবাদে তাঁর যাওয়ার কথা নেই। মহাত্মাজিকে ধানবাদে আসতে রাজি করানো তোমার পক্ষে কি অত্যন্ত দুরূহ কাজ ছিল? তুমি কি চেষ্টা করেছিলে? হয়তো তুমি বলবে রাজকোটের ব্যাপারের জন্যে তাঁকে দিল্লি ফিরে যেতে হত। কিন্তু বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আগেই তাঁর হয়ে গেছে। এবং

স্যার মরিস গয়ারের সঙ্গে সক্ষাৎ করা, সে কাজ ছিল তো সর্দার প্যাটেলের, মহাত্মাজির নয়।

রাজকোটের ব্যাপারে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। মীমাংসার যে শর্তে মহাত্মাজি অনশন ভঙ্গ করলেন তাই নিয়ে তুমি অনেক ভেবেছ। এমন কোনও ভারতবাসী নেই যে মহাত্মাজির জীবন রক্ষা হওয়ায় নিশ্চিন্ত ও খুশি হয়নি। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় মীমাংসার শর্তগুলিকে পরীক্ষা করে কী দেখা গেল? প্রথমত, যে মরিস গয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত তাঁকে মধ্যস্থ বা সালিশ মানা হল। তার ফলে কি প্রকারান্তরে (যুক্তরাষ্ট্রীয়) কাঠামোকে স্বীকার করে নেওয়া হয়নি? দ্বিতীয়ত, স্যার মরিস আমাদেরও লোক নন কিংবা স্বাধীন ব্যক্তিও নন। তিনি খাঁটি ও সরলভাবে সরকারি লোক। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনও বিরোধ বাধলে আমরা যদি কোনও হাইকোর্টের জজকে বা দায়রা জজকে মধ্যস্থ বা সালিস মানি ব্রিটিশ সরকার তাতে সানন্দে রাজি হবে, যেমন বিনা বিচারে আটক রাজবন্দিদের প্রশ্নে সরকার সর্বদা বড়াই করে বলেছে যে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দু'জন হাইকোর্ট বা দায়রার জজের কাছে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা কখনও তা সন্তোষজনক মীমাংসা বলে মেনে নিইনি। তা হলে রাজকোটের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল কেন?

এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপার আমি বুঝতে পারিনি, তুমিই তা ভালভাবে আমাকে বোঝাতে পারবে। মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং যথাসময়ে সাক্ষাৎকারও হয়েছে। এখনও কেন তিনি সেখানে অপেক্ষা করছেন? অপেক্ষা করার কথা সর্দার প্যাটেলের, যদি মরিস গয়ারের তাঁকে দরকার হয়। বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের পরও মহাত্মাজি যদি দিল্লিতে রয়ে যান, প্রকারান্তরে তাতে কি ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না? ২৪ মার্চ তারিখের চিঠিতে তুমি বলেছ, মহাত্মাজি দিল্লিতে কিছুদিনের জন্য মোক্ষমভাবে আটক আছেন এবং কিছুতেই তিনি দিল্লি ছেড়ে যেতে পারবেন না। আমি ভাবছিলাম দিল্লিতে অপেক্ষা করার চেয়ে গান্ধীজির পক্ষে এখন আরও অনেক বেশি জরুরি কাজ ছিল। মহাত্মাজি যদি নিজে থেকে একটু চেষ্টা করতেন তা হলে অচলাবস্থার, যে পথভ্রষ্ট হবার কথা তুমি এত বলে থাক, তা নিমেষে সুরাহা হয়ে যেত। কিন্তু এ বিষয়ে তুমি নীরব এবং যা কিছু দোষ সবই আমার।

তোমার ২৩ মার্চ তারিখের চিঠিতে তুমি লিখেছ, "পরে অপর লোকদের কিছু কানাঘুষা কথা থেকে আমি জানতে পাই যে, এআইসিসি-র একটা মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। আমি ঠিক জানি না এইভাবে কারা ভাবছিল এবং এই মিটিং করায় তাদের উদ্দেশ্যেই বা কী। অবশ্য পরিস্থিতিটা আরও বিশদ করে বোঝানোর জন্যে তার দরকার হতে পারে।" হাওয়ার সঙ্গে কথাটা দৌড়য়। আমার কাছে খবর আসে, কিছু এম এল এ (কেন্দ্রীয়) এআইসিসি-র তাড়াতাড়ি মিটিং আহ্বান করানোর জন্য এআইসিসি-র সদস্যদের দিয়ে রিকুইজিশন পত্রে সই করানোর চেষ্টা করছে, যেন আমি এআইসিসি-র মিটিং ডাকতে চাইছি না এবং কংগ্রেসে একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছি। এই ধরনের কিছু কি তুমি দিল্লিতে বা অন্যত্র শোনোনি? যদি শুনে থাক, তুমি কি মনে কর কাজটা সম্মানজনক ও ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল?

একই চিঠিতে (২৩শে মার্চের) তুমি জাতীয় দাবির প্রস্তাবের এবং শরতের [দাদা] তা বিরোধিতা করার কথা বলেছ। শরতের [দাদা] মনোভাব সম্পর্কে মনে হয় তিনি নিজেই তোমাকে এ বিষয়ে লিখবেন। কিন্তু একথা বলা ঠিক নয় যে তাঁর বিরোধিতার কথা বাদ দিলে প্রস্তাবটি সর্ববাদীসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি বেশ কয়েকজনের কাছে শুনেছি, তাঁরা প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছেন, এ জন্যে নয় যে প্রস্তাবটিতে অন্যায় কিছু ছিল, করেছেন এইজন্য যে তাতে প্রকৃত তাৎপর্য কিছু ছিল না। এটা অনেকটা সেইরকম নির্দোষ প্রস্তাবের মতো যা প্রত্যেক কংগ্রেসের শেষের দিকে উত্থাপিত, সমর্থিত এবং সর্বসম্মতভাবে অথবা বিনা-বাধায় গৃহীত হয়ে থাকে। বাস্তবিক আমি বুঝে পাই না এই রকম প্রস্তাব নিয়ে কি করে তুমি এত

মাতামাতি করতে পার। প্রকৃতপক্ষে এর থেকে কোনও পথের হদিস পাওয়া যাবে?

এই সূত্রে আমি না বলে পারছি না, সম্প্রতি কয়েক বছরের কংগ্রেস প্রস্তাবগুলিতে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে ভারী ভারী শব্দ ও বাগাড়ম্বরই বেশি। এগুলিকে "প্রস্তাব" বলা থেকে "প্রবন্ধ" বা "নিবন্ধ" বললেই ঠিক হয়। আগে আমাদের প্রস্তাবগুলি হত সংক্ষিপ্ত, প্রাসঙ্গিক ও কাজের। বলতে কুণ্ঠা হচ্ছে যে, আমাদের প্রস্তাবগুলির এই নবরূপায়ণে তোমার বেশ কিছুটা হাত আছে। আমার কথা যদি বল, লম্বা লম্বা প্রবন্ধের থেকে আমি কাজের প্রস্তাব বেশি পছন্দ করি।

একাধিকবার তুমি তোমার চিঠিগুলিতে আজকের কংগ্রেসে দুঃসাহসিক প্রবণতার প্রাদুর্ভাবের কথা বলেছ। তুমি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছ? আমার মনে হচ্ছে কিছু ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে তোমার এ কথা বলা। নতুন নতুন নারীপুরুষ কংগ্রেসে এসে প্রাধান্য পাক, এতে কি তোমার আপত্তি আছে? তোমার কি এই অভিপ্রায় যে, কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব কয়েকজন ব্যক্তির কুক্ষিগত থাকবে? আমার যদি স্মৃতিভ্রংশ না হয়, উত্তর প্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাউন্সিলে এই মর্মে একটি রুল গৃহীত হয় যে, কোনও কোনও কংগ্রেস সংগঠনে একই ব্যক্তি তিন বছরের বেশি কোনও দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল থাকবে না। স্পষ্টতই এই রুলের প্রয়োগক্ষেত্র অধস্তন সংগঠনগুলি। উচ্চতর সংস্থাগুলিতে একই ব্যক্তি একই পদে যুগ যুগ কাটাতে পারে। তুমি যাই বল না কেন, একদিক থেকে আমরা সবাই তো দুঃসাহসিক, কারণ জীবনটাই একটা দুঃসাহসিক অভিযান। আমার মনে হয়েছিল, যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল বলে মনে করেন, কংগ্রেস সংগঠনের সকল স্তরে নতুন রক্ত সঞ্চারিত হোক, সাগ্রহে তাঁরা তা চাইবেন।

একথা ভাববার কারণ তোমার নেই (এ ক্ষেত্রে তোমার ২৪ তারিখের চিঠি উল্লেখ করছি) যে, শরতের [আমার দাদা] চিঠিখানি আমার হয়ে লেখা। তাঁর নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব আছে। এখান থেকে কলকাতায় ফিরে যাবার পর তিনি গান্ধীজির কাছ থেকে টেলিগ্রাম পান এবং তাতে তাঁকে লিখতে বলা হয়। গান্ধীজি যদি ওইভাবে টেলিগ্রাম না করতেন, তিনি একান্তই লিখতেন কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অবশ্য একথা আমাকে বলতেই হবে যে, মহাত্মাজিকে লেখা তাঁর চিঠিতে কিছু কথা আছে যা আমার মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি।

[আমার দাদা] শরৎকে লেখা তোমার চিঠি সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তোমার চিঠি থেকে আমি ধরে নিতে পারি, ত্রিপুরির পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি যা লিখেছিলেন তা পড়ে তুমি অবাক হয়েছ। এতে আমি অবাক হচ্ছি। যদিও যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়াবার অবস্থা আমার ছিল না, ওখানকার অস্বাস্থ্যকর মানসিক পরিবেশ সম্পর্কে স্বতন্ত্রসূত্রে আমি যথেষ্ট রিপোর্ট পেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারছি না, এসব ব্যাপার সম্পর্কে কিছুই না জেনে ও না শুনে ওখানে তুমি কি করে ঘুরে বেড়াতে পারলে।

দ্বিতীয়ত, তুমি মন্তব্য করেছ ত্রিপুরিতে ব্যক্তিগত প্রশ্নের দিক থেকে অন্যান্য প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়েছে। তুমি ঠিকই বলেছ। কেবল তুমি একটা কথা বলোনি, যদিও এই বিষয় নিয়ে সাবজেক্টস কমিটিতে বা কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে তুমি উচ্চাবাচ্য করোনি— আর সবার চাইতে তুমিই এই সব ব্যক্তিগত প্রশ্নকে বেশি করে তুলে ধরে সাধারণের চোখে তার প্রাধান্য দিয়েছ।

[দাদা] শরৎকে লেখা তোমার চিঠিতে তুমি বলেছ, "সুভাষের অসুখকে কেউ ভুয়ো বলতে পারে, এ অসম্ভব ব্যাপার। আমার জানা নেই আমার সহকর্মীদের মধ্যে কেউ সেরকম সন্দেহ প্রকাশ করেছিল কি না।" তোমার এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় চোখ থাকতেও তুমি একেবারে অন্ধ হয়ে ছিলে। কারণ, কে না জানে ত্রিপুরিতে এবং তার আগে থেকে আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা আমার নামে নিয়মিতভাবে ওই মর্মে প্রচার চালিয়েছিল। কিছুদিন থেকে আমার উপরে তুমি যে সম্পূর্ণ বিরূপ হয়েছ, এ তার আরেকটি প্রমাণ (এই চিঠির প্রথম অংশ দেখো।)

[দাদা] শরৎ ত্রিপুরির পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে যা বলেছেন আমার মনে হয় না তাতে সামান্যও অতিরঞ্জন আছে।

ত্রিপুরিতে শোনা কিছু অপ্রীতিকর রিপোর্টের কথা তুমি উল্লেখ করেছ। যে সব রিপোর্ট আমাদের বিরুদ্ধে যায় সেগুলিকেই তুমি গুরুত্ব দাও, তোমার মতো লোকের কাছ থেকে এই ব্যাপার কিছুটা অশোভন ও অস্বাভাবিক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তুমি কি জানো বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের টিকিট বিলি করার ব্যাপার নিয়ে একমাত্র বাংলা প্রদেশের বিরুদ্ধেই নালিশ করা হয়নি? জানো কি অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ করা হয়েছে? কিন্তু তুমি শুধু বাংলার কথাই উল্লেখ করেছ। তুমি একথা জানো, আসল রসিদ হারিয়ে গেছে বলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যখন নকল রসিদ দেয়, বিপিসিসি এ বিষয়ে এআইসিসি-র আপিসকে সতর্ক করে দিয়ে বলে তারা যেন বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গকে টিকিট বিলি করার সময় সাবধান হয়। তুমি কি খোঁজ নিতে চেষ্টা করেছ— এই ভুলের জন্য কে দায়ী বিপিসিসি আপিস না এআইসিসি-র আপিস?

আরও বলেছ, বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গকে আনার ব্যাপারে রাশি রাশি টাকা খরচ করা হয়েছে। তুমি কি জানো না, পুঁজিপতি ও টাকাওয়ালা লোকেদের স্থান কোন দিকে? লাহোর থেকে লরি লরি বোঝাই প্রতিনিধিবর্গকে যে নিয়ে আসা হয়েছিল এ খবর তুমি পেয়েছ? কার নির্দেশে তাদের আনা হয়েছিল? সম্ভবত ডক্টর কিচলু এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারেন। দিন পাঁচেক আগে পাঞ্জাবের নাম করা এক মহিলা কর্মীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি আমাকে জানান, সর্দার প্যাটেলের নির্দেশে তাঁদের নিয়ে আসা হয়। আমি অবশ্য এসব কিছুই জানি না। তবে তোমার অন্তত কিছুটা নিরপেক্ষতা বোধ আছে— নিশ্চয় আশা করা যেতে পারে।

ত্রিপুরিতে কংগ্রেসি মন্ত্রীদের ভূমিকা সম্পর্কে আমার দুটি কথা বলার আছে। বহু সংখ্যক এআইসিসি সদস্য আমাকে অনুরোধ করেন, ব্যালট মারফত যেন ভোট নেওয়া হয়। কেন জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বলেন যে, প্রকাশ্যভাবে যদি তাঁরা কংগ্রেসি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তা হলে তাঁরা ঝঞ্ঝাটে পড়বেন। এর অর্থ কী? দ্বিতীয়ত, এই ভাবে কোনও পক্ষের হয়ে মন্ত্রীদের ভোট ভিক্ষা করাটা আমার মতের বিরুদ্ধে। তাঁদের তা করবার নিয়মতান্ত্রিক অধিকার আছে ঠিকই— কিন্তু তার ফল হবে এই যে প্রত্যেক প্রদেশে কংগ্রেস সংসদীয় দলে ভাঙন দেখা দেবে। মন্ত্রীদের নিজ নিজ প্রদেশের সব এমএলএ ও এমএলসি-দের সম্মিলিত সমর্থন না পেলে তাঁরা কী করে কাজ চালাতে পারবেন।

তুমি কি স্বীকার করবে না যে ত্রিপুরি কংগ্রেসে (সাবজেকটস কমিটিতেও) সাধারণের চোখে প্রাচীনপন্থীদের ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয় এবং সর্বত্র মোড়লি করতে দেখা গেছে মন্ত্রীদের, [দাদা] শরৎ যখন এই মন্তব্য করেন, তিনি কি ভুল করেছিলেন?

[দাদা] শরৎকে লেখা চিঠিতে তুমি যে মন্তব্য করেছ তা, লোকে যেমন বলে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। তুমি বলেছ "ত্রিপুরি প্রস্তাব কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং গান্ধীজির মধ্যে সহযোগিতাকে সম্ভবপর করেছে।"

উপরের চিঠিতে তুমি দাবি করেছ ত্রিপুরিতে এবং তার আগে থেকে কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব আনবার জন্য তুমি অনেক চেষ্টা করেছ। অন্য লোকের ধারণা যে একেবারে আলাদা, অপ্রিয় এই সত্য কথাটা কি তুমি শুনবে? তাদের মতে, বিভিন্ন কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে ত্রিপুরি কংগ্রেস যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল তার দায়িত্ব থেকে তোমাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না।

এবারে তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি তোমার নীতি ও কার্যক্রম স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলো— ধোঁয়াটে তত্ত্বকথা নয়, বাস্তব কাজের কথায়। আমার আরও জানতে ইচ্ছা করে তুমি কী?

সোশ্যালিস্ট? বামপন্থী? মধ্যপন্থী? দক্ষিণপন্থী? না, গান্ধীবাদী? না, অন্য কিছু?

[দাদা] শরৎকে লেখা তোমার চিঠিতে দুটি চমৎকার বাক্য আছে: "ব্যক্তিগত দিক যখন রাজনৈতিক প্রশ্নকে ছাপিয়ে ওঠে তখন আমি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাই। কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে একান্তই যদি কোনও বিরোধ দেখা দেয়, আমি মনেপ্রাণে আশা করব তা যেন উচ্চস্তরেই থাকে এবং নীতি ও আদর্শের গণ্ডীতে তাকে যেন আবদ্ধ রাখা হয়।" তুমি যদি নিজের কথা মেনে চলতে, আমাদের কংগ্রেসি রাজনীতি কত অন্যরকম হত।

যখন তুমি বল, ত্রিপুরিতে কীসের বাধা ছিল তুমি জান না, তোমার অকপট সারল্যকে আমি প্রশংসা না করে পারি না। প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরি কংগ্রেসে একটিমাত্র প্রস্তাব, অর্থাৎ পন্থ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, এবং ওই প্রস্তাবের সর্বাঙ্গে ছিল নীচতা ও প্রতিহিংসার মনোভাব। সত্য ও অহিংসার ভক্তরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের কাজে বাধা দিতে চান না বলে বাধা না দেবার মনোভাব থেকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। ত্রিপুরিতে তাঁরা বাধা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেননি। তাঁদের নিশ্চয় তা করবার অধিকার ছিল— কিন্তু তাঁরা মুখে এমন কথা বলেন কেন যা কাজে করেন না?

অস্বাভাবিক এই দীর্ঘ চিঠি শেষ করার আগে আমি অন্যান্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই।

ত্রিপুরিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের টিকিট দেওয়া নিয়ে যে গোলমাল হয়েছিল সে সম্পর্কে তুমি উল্লেখ করেছ। কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে পড়লাম, এআইসিসি-র কোনও একজন সদস্য কলকাতায় প্রকাশ্য জনসভায় বলেছেন যে তিনি উত্তরপ্রদেশের কিছু প্রতিনিধির কাছে শুনেছেন, উত্তরপ্রদেশ সম্পর্কেও একইরকম গোলযোগ দেখা দিয়েছিল।

তুমি কি মনে করো না পন্থ প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল মহাত্মাজিকে আমার প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানো? আমার দিক থেকে অন্তত, যখন মহাত্মাজি ও আমার মধ্যে কোনও বিচ্ছেদ হয়নি, তখন তুমি কি মনে করো কাজটা সাধু হয়েছিল? প্রাচীনপন্থীদের যদি আমার সঙ্গে লড়াই করবার ইচ্ছা থেকে থাকে, সামনাসামনি তাঁরা তা করলেন না কেন? এ একটা কূট কৌশল, ঠিকই, কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে এইরকম চাল সত্য ও অহিংসার সঙ্গে খাপ খায় কি না।

আমি আগেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, সর্দার প্যাটেল যে ঘোষণা করে বললেন, আমার পুনর্নির্বাচন দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, তাঁর দিক থেকে এ কাজটা কি ন্যায়সংগত হয়েছে বলে তুমি মনে কর? এই মন্তব্য তাঁর প্রত্যাহার করা উচিত বলে তুমি একটি কথাও বলোনি, এবং তা না বলে প্রকারান্তরে তাঁর অভিযোগকেই সমর্থন করেছ। এবারে, মহাত্মাজির মন্তব্য, যাতে তিনি বলেছেন যতই হোক আমি দেশের শত্রু নই, এই মন্তব্য সম্পর্কে তুমি কী ভাবো আমার জানতে ইচ্ছা হয়। এই রকম মন্তব্য কি তুমি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে কর? যদি তা না মনে কর, আমার সপক্ষে মহাত্মাজিকে কিছু কি বলেছিলে?

আমরা যখন ত্রিপুরিতে তখন কিছু লোক দৈনিক কাগজে ছাপিয়ে দিল যে, পন্থ প্রস্তাবে মহাত্মাজির পুরোপুরি সমর্থন আছে। লোকগুলির এই ফিকির সম্বন্ধে তুমি কী মনে কর?

এবারে, পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? ত্রিপুরিতে একটা গুজব শোনা গিয়েছিল, এই প্রস্তাবের অন্যতম রচয়িতা ছিলে তুমি। তা কি সত্যি? তুমি যদিও ভোট দেবার সময় নিরপেক্ষ থাক, এই প্রস্তাবটি কি অনুমোদন কর? তোমার দিক থেকে এর ব্যাখ্যা কী? তোমার মতে এটি কি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব?

আমার পত্র এত বড় হয়ে গেল বলে আমি দুঃখিত। এর ফলে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে বুঝতে পারছি। কিন্তু এত কথা বলার ছিল, আমার উপায় ছিল না।

হয়তো তোমাকে আবার লিখতে হতে পারে অথবা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিতে হতে পারে। অসমর্থিত এক সংবাদে শোনা যাচ্ছে যে, আমার সভাপতিত্বের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে তুমি নাকি কিছু প্রবন্ধ লিখেছ। তোমার লেখা যখন দেখব তখনই ওই বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে। সেই সঙ্গে আমাদের কাজেরও তুলনা করতে পারব— বিশেষ করে কতখানি তুমি বামপন্থার আদর্শকে দু'বছরে এগিয়ে নিয়ে গেছ এবং আমিই বা কতখানি এক বছরে নিয়ে গেছি।

যদি কোথাও আমি রূঢ় ভাষা ব্যবহার করে থাকি অথবা তোমার মনে অঘোত দিই দয়া করে আমাকে মার্জনা করো। তুমি নিজেই বল অকপট হওয়ার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না— তাই আমি অকপট হওয়ার চেষ্টা করেছি, হয়তো বা নির্মমভাবেই হয়েছি।

ধীরে হলেও আমার স্বস্থ্যের উন্নতি অব্যাহত আছে। আশা করি ভাল আছ।

তোমার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

জওহরলাল নেহরুর পত্র

এলাহাবাদ
৩ এপ্রিল ১৯৩৯

ব্যক্তিগত ও গোপনীয়

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ২৮ মার্চের দীর্ঘ পত্র এইমাত্র আমার হাতে পৌঁছল এবং আমি তাড়াতাড়ি তার উত্তর দিচ্ছি। তুমি যে আমাকে সব কথা লিখেছ এবং অত খোলাখুলি লিখেছ এবং আমার সম্পর্কে এবং বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তোমার মনোভাব পরিষ্কার করে জানিয়েছ সে-জন্য আমি কত আনন্দিত। খোলাখুলি কথা আঘাত অনেক সময় করে কিন্তু প্রায় সবসময় সেটাই বাঞ্ছনীয়, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা একসঙ্গে কাজ করে। নিজেকে আরেকজনের দৃষ্টিকোণ থেকে, অধিকতর সমালোচনাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে উপকার হয়। সে দিক থেকে তোমার পত্র উপযোগী এবং আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ।

টাইপকরা ২৭ পৃষ্ঠার চিঠি, যার মধ্যে অসংখ্য ঘটনার কথা আছে, নানা কর্মসূচি ও নীতির কথা আছে, তার উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তাই, আমার আশঙ্কা, আমার চিঠিতে যত কথা যত খুঁটিনাটি বিবরণ থাকা উচিত ছিল, তা থাকবে না। অত বিষয়ের সবগুলো নিয়ে ঠিকমতো আলোচনা করতে গেলে একখানা বই, কিংবা সেরকম কিছু লিখতে হয়।

মূলত তোমার চিঠি আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগপত্র এবং আমার ব্যর্থতাসমূহ নিয়ে একটি তদন্ত। তুমি বুঝতে পারবে, তার উত্তর দেওয়া একটি দুরূহ এবং অস্বস্তিকর কাজ। তবে সে-সব ব্যর্থতার, কিংবা তার মধ্যে অনেকগুলির কথা বলতে গেলে, আমার সে-বিষয়ে বিশেষ কিছু বলবার নেই। আমি সে-সব দোষ স্বীকার করছি, বুঝতে পারছি দুর্ভাগ্যক্রমে সে-সব দোষ আমার আছে। আমি আরও বলি, তুমি যে বলেছ, ১৯৩৭-এ অন্তরীণ অবস্থা থেকে বেরোনোর পর থেকে, ব্যক্তিগত জীবন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তুমি আমার সঙ্গে যারপরনাই সৌজন্য ও সহৃদয়তাপূর্ণ আচরণ করে আসছ। তোমার সে-কথার সত্যতা আমি পুরোপুরি উপলব্ধি করি। তোমার কাছে আমি সে-জন্য কৃতজ্ঞ। ব্যক্তিগতভাবে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা

বরাবরই ছিল, আজও আছে, যদিও কখনও কখনও তুমি যা করেছ এবং যেভাবে করেছ, সেটা আমার একেবারেই পছন্দ হয়নি। আমার মনে হয়, আমাদের দু'জনের মানসিক গঠন খানিকটা আলাদা, জীবন এবং তার সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমাদের মনোভাবও এক নয়।

এখন আমি তোমার চিঠি নিয়ে আলোচনা করব, এক এক করে তার অনুচ্ছেদগুলো নিয়ে কথা বলব।

গত নভেম্বরে আমি ইউরোপ থেকে ফেরার পর তুমি যখন আমার সঙ্গে দেখা করেছিলে, তখন আমি তোমায় কী বলেছিলাম, আমার মনে পড়ছে না। কলকাতা থেকে করাচি যাওয়ার পথে তুমি এখানে যাত্রাবিরতি করেছিলে। সেই সময়ে তোমাকে একটা সুনির্দিষ্ট জবাব দেওয়ার আগে গান্ধীজিকে আমায় কী জিজ্ঞাসা করবার ছিল আমি ভেবে পাচ্ছি না। প্রশ্নটা কী ছিল তাও আমার মনে পড়ছে না। তবে সম্ভবত আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, তা হল আমার ভবিষ্যৎ কাজকর্ম নির্ভর করবে বিভিন্ন বিষয়ে গান্ধীজির প্রতিক্রিয়ার ওপর। হরিপুরার আগে এবং পরে তোমাকে আমি কী বলেছিলাম তোমার মনে থাকবে। সেই সময় ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে সদস্য হিসাবে আমার যে সম্পর্ক, তা নিয়ে আমি খুব অশান্তিতে ছিলাম এবং আমি ওয়ার্কিং কমিটি ছাড়তে চাইছিলাম। তার কারণ, ক্রমশ আমার বেশি করে মনে হচ্ছিল, সেখানে আমাকে দিয়ে কোনও প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছিল না। তা ছাড়া, গান্ধীজি, যাকে তিনি সমভাবাপন্ন সদস্যদের নিয়ে গঠিত অমিশ্র কমিটি বলেন, সেরকম কমিটির কথাই ভাবছিলেন এবং আমি যে তার মধ্যে থাকতে পারব সেটা আমি ভাবতে পারছিলাম না। আমার সামনে তখন দুটি রাস্তা খোলা ছিল। নিঃশব্দে কমিটি থেকে বেরিয়ে আসা এবং বাইরে থেকে তার সঙ্গে সহযোগিতা করা, নয়তো গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের চ্যালেঞ্জ করা। আমার মনে হয়েছিল সেই সুস্পষ্ট বিভেদ সৃষ্টি করলে তাতে ভারতের স্বার্থ ও আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের ক্ষতি করা হবে। অবশ্য এ কথা বলারও কোনও মানে হয় না যে ঐক্য যে কোনও মূল্যে বজায় রাখতেই হবে। কোনও কোনও সময়ে ঐক্য ক্ষতিকর হতে পারে। তখন তাকে ত্যাগ করতে হবে। সবকিছু নির্ভর করে তখনকার পরিস্থিতির ওপর এবং সেই সময়ে আমার এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না, গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের বের করে দেওয়া হলে, কিংবা তার চেষ্টা হলে সংকটের সময়ে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ব। আমি সেরকম অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আবার, সেই সঙ্গে, যে-সব ঘটনা ঘটছিল তার অনেক কিছু আমার পছন্দ হচ্ছিল না। কোনও কোনও বিষয় সম্পর্কে সাধারণভাবে গান্ধীজির মনোভাব আমার পছন্দ হচ্ছিল না, যেমন দেশীয় রাজ্য ও মন্ত্রিসভা সংক্রান্ত বিষয়ে।

আমি ইউরোপ চলে গেলাম এবং ফিরে এসে সেই পুরনো সমস্যারই সম্মুখীন হলাম। তুমি আমার সঙ্গে সেই সময়েই দেখা করলে এবং বোধহয় আমি তোমাকে বললাম, আমি কী ভাবছিলাম। আমার মনে কোনও দ্বিধা কিংবা অনিশ্চয়তা ছিল না, কিন্তু আমি কী করব সেটা নির্ভর করছিল সেই পরিস্থিতিতে গান্ধীজি কী ভাবছিলেন তার ওপর। তখনও যদি "অমিশ্র'-ক্যাবিনেটের কথাই তাঁর মনে থেকে থাকে, আমি তার বাইরে থাকব। নইলে, আমি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে সহযোগিতা করবার চেষ্টা করব। সেই প্রশ্নে কংগ্রেস যাতে ভেঙে যায় এমন কিছু করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। যে-সংকট ভারতে এবং বিদেশে ঘনিয়ে উঠছিল সেটাই আমার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। আমার মনে হচ্ছিল কয়েকমাসের মধ্যে একটা মস্ত বড় সংগ্রামের মধ্যে পড়তে হবে। গান্ধীজির সক্রিয় যোগদান ও নেতৃত্ব ছাড়া সে-সংগ্রাম ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল।

এই সংগ্রাম সম্পর্কে আমার ধারণা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ছিল না। আমি চেয়েছিলাম কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্ন বাতিল বলে গণ্য করুক, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং গণপরিষদের ওপরেই মনোযোগ

দিক এবং প্রশ্নটাকে স্থাপন করুক বিশ্ব-সংকটের পটভূমিতে। আমার মনে হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পানার বিরোধিতা করার কথা বেশি জোর দিয়ে বললে, তাতে প্রশ্নটিকে জিইয়ে রাখা হবে এবং আরও মৌলিক স্তরে চিন্তাভাবনা করা এবং কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি যখন ইংল্যান্ডে ছিলাম তুমি একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছিলে, শেষ পর্যন্ত তুমি যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করে যাবে এবং কংগ্রেস যদি তা গ্রহণ করে তবু তুমি তার বিরোধিতা করবে। ইংল্যান্ডে তোমার এই বিবৃতিটির ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া হল। সবাই বললেন, যদি কংগ্রেস সভাপতি এই প্রশ্নে পদত্যাগ করার কথা চিন্তা করেন, তার অর্থ কংগ্রেস নিশ্চয় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করবার উপক্রম করছে। আমি অসহায় বোধ করছিলাম, এই যুক্তির জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সহজ হল না।

এর ভিত্তিতে আমি দুটি প্রস্তাব রচনা করলাম। প্রস্তাব দুটির মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু ছিল না, শুধু তাতে জোর দেওয়া হয়েছিল অন্যত্র। তুমি জান, ওয়ার্কিং কমিটির জন্য যত প্রস্তাব আমরা রচনা করি, সবই এমনভাবে তৈরি করতে হয় যাতে অন্য সদস্যরা তাতে সম্মত হন। আমার নিজের বেশি পছন্দ, কিন্তু অন্যেরা পছন্দ করেন না এমন কিছু রচনা করা সহজ। ওয়ার্কিং কমিটির সামনে আমি যে প্রস্তাবগুলি পেশ করেছিলাম, তা এই কথা ভেবে যে তাতে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হবে, দেশের লোকও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবে পরবর্তী কংগ্রেসে অধিকতর ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী একটি প্রস্তাবের জন্য। তবে, আমার প্রস্তাবগুলি অনুমোদিত হল এবং আমাকে বলা হল, পরবর্তী কংগ্রেসে সেগুলি বিবেচনা করা হবে।

ওয়ার্কিং কমিটির সেই অধিবেশনেই আমি ইহুদিদের সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলাম। তোমার মনে পড়বে, ঠিক তার আগে জার্মানিতে ইহুদিদের ওপর একটা সাংঘাতিক নিধন-যজ্ঞ সমাধা করা হয়েছিল এবং সারা পৃথিবীতে তার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, সে-বিষয়ে আমাদের উচিত আমাদের মত ব্যক্ত করা । তুমি লিখেছ, "আমি যখন ভারতকে ইহুদিদের নিরাপদ আশ্রয় বানাতে চেয়ে একটি প্রস্তাব হাজির করলাম, তুমি স্তম্ভিত হয়ে গেলে।" তোমার অনুভূতি এ বিষয়ে এত প্রবল ছিল, শুনে আমি বিস্মিত; কারণ, আমার যত দূর মনে আছে তুমি সে সময়ে স্পষ্ট করে তোমার মনের কথা জানাওনি। কিন্তু আমার প্রস্তাবটিকে এইভাবে বর্ণনা করা উচিত, যে তাতে ভারতে ইহুদিদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল তৈরি করতে চাওয়া হয়েছে? পুরনো খসড়াটি আমার সামনে আছে। তাতে বলা হয়েছে, "যে-সব ইহুদি শরণার্থী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতাসম্পন্ন, বিশেষজ্ঞ, ভারতে নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে যাঁরা খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন, ভারতীয় মান গ্রহণ করতে পারবেন, ভারতে তাঁদের কর্মসংস্থানে আপত্তির কোনও কারণ কমিটি দেখতে পাচ্ছে না", ইহুদিদের সাহায্য করার দিক থেকে আমি প্রশ্নটি বিবেচনা করিনি, যদিও আমাদের দেশের ক্ষতি না করে সেরকম সাহায্য দেওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। আমরা প্রশ্নটি দেখেছিলাম, বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে অতি সীমিত ব্যয়ে প্রথম শ্রেণির ব্যক্তিদের নিয়ে এসে নিজেদেরই সাহায্য করার দিক থেকে। ভিয়েনা নাৎসিদের দখলে চলে যাওয়ার পর বেশ কয়েকটি দেশ ভাল ভাল লোকদের নিয়ে আসার জন্য সেখানে বিশেষ কমিশন পাঠিয়েছিল। ওরকম বিশেষজ্ঞদের পেয়ে তুরস্ক অত্যন্ত লাভবান হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল, উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ ও বিশেষজ্ঞ লাভ করার সে একটা আদর্শ সুযোগ ছিল। অল্প বেতনে তাঁরা যদি এখানে আসতেন, অন্যদের বেতন কমিয়ে এনেও আমাদের তাতে সুবিধা হত। তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আসতেন, স্থায়ীভাবে বসবাস কররা জন্য নয় এবং অল্প কয়েকজনই আসতেন, একমাত্র তাঁরাই আসতেন যাঁরা আমাদের মান ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতেন। যাই হোক, সে-প্রস্তাবটিও গৃহীত না হওয়াতে পরিত্যক্ত হয়।

কংগ্রেস সভাপতির নির্বাচনের পর আমার প্রদত্ত একটি ভাষণের তুমি উল্লেখ করেছ। দুঃখের বিষয়, খবরের কাগজের যে-খবরটির কথা তুমি বলেছ, সেটি আমি দেখিনি, যদিও কেউ আমাকে পরে তার কথা বলেছিলেন। বস্তুত তোমার কথা কিংবা তোমার নির্বাচনের কথা আমি কিছুই বলিনি। আমি দিল্লি আর পঞ্জাব কংগ্রেসের নানা সমস্যার ও বিবাদ-বিতর্কের কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, পদ পাওয়ার জন্য আগ্রহ বড় বেশি এবং তার জন্য সমর্থন আদায়ের চেষ্টাও খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। এর আমি নিন্দা করেছিলাম, বোধহয় সাংবাদিকরা তোমার নির্বাচনের কথাই ভাবছিলেন এবং সেই জন্যই আমার কথা বিকৃত করেছেন। সভায় অন্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি কী বলেছিলাম সে-বিষয়ে আমার ধারণাই তাঁরা সমর্থন করেছেন।

তুমি এ-কথা ঠিকই বলেছ, যে ডা. পট্টভির জন্য প্রচুর প্রচার হয়েছিল, যেমন তোমার জন্য হয়েছিল। নির্বাচনের জন্য প্রচারে আমি কোনও দোষ দেখি না। কংগ্রেসের মন্ত্রিসভাগুলির অধীনস্থ সংস্থাগুলো পট্টভির জন্য ভোট সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল— তোমার এ-কথার অর্থ আমি ঠিক বুঝলাম না। এ-কাজে লাগানোর মতো কী সংস্থা আছে আমি জানি না এবং যুক্তপ্রদেশে আমি তাকে কাজ করতে দেখিনি, একমাত্র একটি ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তোমার পক্ষে কাজ করা ছাড়া। আমাদের মন্ত্রীরা কোন দিকে ভোট দিয়েছিলেন, আমার কোনও ধারণা নেই, তবে আমার মনে হচ্ছে অর্ধেকের বেশি ডা. পট্টভিকে ভোট দেননি। আমি যত দূর জানি, হয়তো তার চেয়েও কম ভোট তিনি পেয়েছিলেন। একজন মন্ত্রী ভোট দিতে অস্বীকার করেন, একজন সক্রিয়ভাবে এবং প্রকাশ্যভাবে তোমার হয়ে প্রচার চালিয়েছিলেন এবং অনেকের ধারণা তিনি তোমার জন্য প্রচুর সংখ্যক ভোট সংগ্রহ করেছিলেন।

প্রকাশ্য সভায় আমার তোমাকে নিন্দা করার বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে তুমি ঠিকই করেছ। সে-কাজ আমার পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দিল্লিতে এবং অন্য কোথাও, আমি সেরকম কিছু করিনি।

ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্য পদত্যাগ কররার পর আমি যে-বিবৃতি দিয়েছিলাম, তার কথায় আসি। দু' দিন ধরে দীর্ঘ তর্কবিতর্ক চলেছিল। তখন আমি, ওয়ার্কিং কমিটির অন্য কোনও কোনও সদস্য যে চরমপন্থী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তার চেয়ে অনেক নরম পন্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলাম। সেই বৈঠকের আগে, যখন আমি শুনলাম পদত্যাগের একটা সম্ভাবনা আছে, আমি চেষ্টা করেছিলাম তাকে আটকাতে। আবার সে-চেষ্টা করলাম। কিন্তু নানাবিধ কারণে, পরিস্থিতিটা আগে যা ছিল তার চেয়ে অনেক দুরূহ হয়ে গিয়েছিল। তুমি জান, তোমার সভাপতির ভাষণে ওয়ার্কিং কমিটির কোনও কোনও সদস্য সম্পর্কে যে-মন্তব্য ছিল তা আমার খুবই খারাপ লেগেছিল। আমি অনেকবার তোমাকে সে-কথা বলেছি। যখন তুমি গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলে, আমি বিশেষ চেষ্টা করেছিলাম, তোমাকে বোঝাতে যে, রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি উত্থাপন করার আগে এই বিষয়টা প্রথমে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। জয়প্রকাশ আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। দু'জন মানুষের মধ্যে যখন অবিশ্বাস ও সন্দেহের প্রাচীর দাঁড়িয়ে থাকে, তখন কোনও রাজনৈতিক আলোচনা হতে পারে না। তোমার বিবৃতিতে তুমি যা বলেছ তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের মতো একজন, যিনি ভিতরের লোক, দায়িত্বশীল পদে অধিপতি, খবরের কাগজের রিপোর্ট কিংবা বাজারের কথাবার্তা যে তাঁর বলা উচিত নয় তা উল্লেখ করা দরকার। ধরে নেওয়া হয়, তিনি প্রকৃত সত্য জানেন এবং তিনি আভাসেও যদি কিছু বলেন, অন্যেরা তা বিশ্বাস করে নেয়। এ কথা ঠিক, তুমি কারও নাম করোনি, কিন্তু তোমার বিবৃতি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সকলেই এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য, যে বিবৃতিটিতে ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যের কথা বলা হয়েছে। একজন প্রকাশ্যে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমর্থন করেন, গোপনে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এমনকী যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের মধ্যে মন্ত্রিত্ব বিতরণেও ব্যবস্থা করেছেন, এ-কথা বলার চেয়ে অপমান তাঁর পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। এ এক অসম্ভব কল্পনা এবং এতে তাঁকে অত্যন্ত কোমল স্থানে আঘাত করা হয়েছে।

তোমার এবং গান্ধীজির মধ্যে সহযোগিতায় এ ছিল এক কঠিন বাধা, কেন না এক অর্থে অন্যেরা গান্ধীজির প্রতিনিধি ছিলেন। তোমাদের দু'জনের মধ্যে সহযোগিতা আমি প্রবলভাবে চাইছিলাম, কারণ তা না হলে সেটা অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হত, সেই কারণে আমি তোমাকে জোর দিয়ে বলেছিলাম, এই বাধা দূর করতে, গান্ধীজির সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তা বলতে। আমি মনে করেছিলাম তুমি রাজি হয়েছিলে। পরে আমি জয়প্রকাশ এবং গান্ধীজির কাছে শুনে হতভম্ভ হয়ে গেলাম যে, তুমি সে-বিষয়টিকে উল্লেখই করোনি। আমি স্বীকার করতে বাধ্য, এতে আমি অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়ি এবং এর ফলে আমি বুঝতে পারি তোমার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করা কত কঠিন।

গান্ধীজি আমাকে আরও বলেন, তুমি তাঁর কাছে যাওয়ার পরে তাঁর ধারণা হয়েছে, তাঁর সহযোগিতা লাভ করতে তুমি খুব আগ্রহী নও। যদিও কতকটা দায়সারাভাবে তুমি তাঁর সহযোগিতা চেয়েছিলে। মনে হচ্ছিল, এমন সব নানা ধরনের সদস্য নিয়ে তুমি ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের কথা ভাবছিলে, যাদের কথা তুমি আগেই ভেবে রেখেছ (এবং সম্ভবত তাঁদের বলেও রেখেছ)। অবশ্য তোমার সে-অধিকার ছিল , কিন্তু এসব দেখে মনে হচ্ছিল গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে সহযোগিতা নয়, তুমি অন্যরকম কিছু ভাবছিলে।

পঞ্জাবের নির্বাচন, দিল্লির নির্বাচন এবং অন্ধ্রতে নেলোর সম্পর্কে তুমি যে-সব কাজ করেছিলে তাতে আমি একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম, সে কাজগুলো নিয়ে ততটা নয়, যেভাবে তুমি করেছিলে তাই নিয়ে। তুমি সরাসরি সে-সব পদক্ষেপ নিচ্ছিলে, এআইসিসি-কে কিছু না জানিয়ে এবং অন্ধ্রের ক্ষেত্রে পঞ্জাব কংগ্রেস কমিটিকে কিছু না জানিয়ে।

পঞ্জাবে তুমি একটা টেলিগ্রাম পাঠালে, এআইসিসি-র পক্ষ থেকে একটা তদন্ত বন্ধ করে দিতে। দিল্লিতে তুমি পদক্ষেপ নিলে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে পূর্বাহ্নে না জানিয়ে। আমি নিজে মনে করি দিল্লি সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আমার মনে হয়েছিল, কোনও কোনও ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর প্রভাব নিজের ওপর তুমি সরাসরি পড়তে দিচ্ছিলে, একজন পদাধিকারীর যে নৈর্ব্যক্তিক এবং নিয়মানুগ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত তার বদলে। এই পদ্ধতি, আমার মনে হয়েছিল, অন্যের বিপদের কারণ হতে পারে।

তুমি বলেছ "ওপর থেকে হস্তক্ষেপ করায় আমাকে কোনও কংগ্রেস সভাপতি হারাতে পারবেন না।" আমি জানি আমি হস্তক্ষেপ করারই লোক, কিন্তু এআইসিসি-র কাজের ব্যাপারে, আমি কখনও তার অফিসের কাজে হস্তক্ষেপ করেছি বলে মনে করতে পারছি না। যদিও তার ওপর প্রভাব ফেলতে প্রায়ই চেষ্টা করেছি। আমার সুচিন্তিত নীতি ছিল, (সেই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল) হস্তক্ষেপ না করা এবং প্রাদেশিক এআইসিসি-রও হস্তক্ষেপ না করার, একমাত্র যদি গত্যন্তর না থাকে, তখন ছাড়া।

এইসব নানা ঘটনা নিয়ে আমি যখন অশান্তিতে ছিলাম, গান্ধীজি এবং বল্লভভাইকে পাঠানো তোমার টেলিগ্রাম দুটি এল এবং সেই টেলিগ্রাম দুটির অর্থ করা হল, তুমি চাও না ওয়ার্কিং কমিটিতে আমরা আদৌ মিলিত হই, এমনকী স্বাভাবিক কাজকর্মও করি। তবে তুমি বলেছ, ওরকম কোনও নিষেধ জারি করা তোম ার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু টেলিগ্রাম দুটির সেরকম অর্থও করা যায়। সম্ভবত তোমার কাছে তারপরেও জানতে চাওয়া যেত তুমি কী বলতে চাও। কিন্তু সেটা করা সংগত বলে মনে হয়নি, কেন না তাতে মনে হত, ঠিক সেই সময়টাতে তুমি যা চাইছিলে না তাই আমাদের করতে দিতে তোমার ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে।

এ সমস্ত থেকে মনে হল একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, তুমি একটি পথ ধরে চলতে চাও তোমার পছন্দের সঙ্গীদের নিয়ে এবং ওয়ার্কিং কমিটির পুরনো সদস্যেরা বোঝাস্বরূপ, তাঁদের তুমি তেমন চাইছিলে না। তাঁদের পদত্যাগ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ল, না হলে তোমার প্রতি, দেশের প্রতি এবং তাঁদের নিজেদের প্রতি অন্যায় করা হত, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরও তাতে বিরুদ্ধাচরণ করা হত। আমি বুঝতে পারছি না, তাঁরা কীভাবে থেকে যেতে পারতেন, আর তাঁদের পদত্যাগে অচলাবস্থা কী করে সৃষ্টি হল। পদত্যাগ না করলে তার ফলেই অচল অবস্থার সৃষ্টি হত, কেননা তা হলে তুমি যা উচিত মনে করতে সে-কাজ করতে পারতে না।

তুমি ঠিকই বলেছ, আমি একটা বোকার মতো কাজ করলাম। আমি সত্যি সত্যি পদত্যাগ করলাম না, অথচ এমন ভাব দেখালাম যেন পদত্যাগ করেছি। তার কারণ, আমার সহকর্মীদের সমগ্র মনোভাবটা আমি একেবারেই মানতে পারলাম না। আমার মনে প্রবলভাবে এই ভাবটা এল যে, সে-পরিস্থিতিতে আমার সহযোগিতার হাত আমি তোমার দিকে বাড়িয়ে দিতে পারি না, কিন্তু এও আবার মনে হল যে, এক অর্থে আমি অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। বস্তুত, দ্বিতীয় অনুভূতিটিই আরও প্রবল ছিল, কারণ তার অর্থ ছিল একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি, এক অতি দীর্ঘ অধ্যায়। 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকায় আমি যে একগুচ্ছ প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তার প্রথমটি যদি তুমি পড়ো, বোধহয় আমার তখনকার চিন্তাভাবনায় একটা আভাস পাবে।

আমার ২২ ফেব্রুয়ারির বিবৃতি যৌথ পদত্যাগ পত্রের অন্তর্ভুক্ত করার কোনও প্রশ্ন ছিল না। আমি যাতে তাঁদের সঙ্গে একযোগে পদত্যাগ করি, তার জন্যে আমার ওপর প্রবল চাপ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু রাজি হইনি। তোমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার আগে আমি তাঁদের পত্রটি দেখিইনি, তার পরে দেখলাম।

বিগত মাস দুয়েক আমার মন কি নিয়ে অশান্তিতে ছিল, আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলব? দুটি বড় বড় কারণে আমি তোমার নির্বাচনে দাঁড়ানোর বিরোধিতা করেছিলাম। সেই পরিস্থিতিতে তার অর্থ দাঁড়াত, গান্ধীজির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি এবং আমি চাইনি তা হোক। কেন ছাড়াছাড়ি হত, তার কারণের মধ্যে আমার যাওয়ার দরকার নেই, আমার মনে হয়েছিল ছাড়াছাড়ি হবে। তার ফলে প্রকৃত বামপন্থীদেরও ক্ষতি হত বলে আমার মনে হয়েছিল। সে ভার নিজেরা বহন করবার মতো শক্তি বামপন্থীদের ছিল না, কংগ্রেসের মধ্যে প্রকৃত একটি দ্বন্দ্ব আরম্ভ হলে তাঁরা হেরে যেতেন। তখন একটা প্রতিক্রিয়া হত তাঁদের বিরুদ্ধে। আমার মনে হয়েছিল, পট্টভির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হয়তো তুমি জিতবে, কিন্তু যাকে গান্ধীপন্থা বলা হয়, তার সঙ্গে পরিষ্কার একটা সংঘর্ষ বাঁধলে তাতে কংগ্রেসকে তুমি সঙ্গে পাবে কী না, আমার সন্দেহ ছিল। যদি বা তুমি কোনওক্রমে সংখ্যাগুরুর সমর্থন পেয়ে যেতে, তাতে গান্ধীজি ছাড়া, ফলপ্রসূ কাজকর্ম ছাড়া, দেশে তোমার পিছনে যথেষ্ট সমর্থন আছে, তার পরিচয় পাওয়া যেত না এবং আরও বেশি করে যেটা বলা যায়, সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। দেশে এত বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা আগে থেকেই ছিল যে সেগুলোকে সংযত করার বদলে আমাদের কাজের ফলে, তার শক্তিবৃদ্ধি হত। এইসব মিলে আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করে ফেলত, যখন দরকার ছিল শক্তির, তোমার পুনর্নির্বাচনে আমার আপত্তির এই দুটিই ছিল প্রধান কারণ। বোম্বাইয়ের কয়েকজন বন্ধু তোমায় যা বলেছেন সেটা পুরোপুরি সঠিক নয়। তাঁদেরকে আমি যা বলেছিলাম, তা হল কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বামপন্থী নীতি ও কয়েকটি পদ্ধতির যদি তুমি সমর্থক হও, তা হলে তোমার আবার নির্বাচনে দাঁড়াবার কোনও যুক্তি থাকে, কেন না সেক্ষেত্রে ধ্যানধারণা এবং নীতির বিষয়ে সে নির্বাচনে শিক্ষণীয় কিছু থাকে। কিন্তু শুধুমাত্র ব্যক্তির বিচারে যে নির্বাচন, তার

সে মূল্যও থাকে না। যাইহোক আমি তোমার পুনর্নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিনি উপরোক্ত কারণে।

অবশ্য আমার ২৬ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারির বিবৃতিতে অন্য কথা ছিল, কিন্তু আমার মনোভাবের কোনও পরিবর্তন ও দুটি বিবৃতি সূচিত করে না। প্রথম বিবৃতিটি দেওয়া হয়েছিল তোমার নির্বাচনের আগে এবং আমি চেষ্টা করেছিলাম, যতদূর সম্ভব কোনও এক পক্ষে না যেতে। আসামে ড. পট্টভির পক্ষে আবেদন করতে বলা হয়েছিল। তাতে আমি সম্মত হইনি। সেই কারণেই আমার বিবৃতির সুরটা ভেবেচিন্তে নরম করা হয়েছিল। তারপরে আরও কিছু তথ্য আমি জানতে পারলাম। তোমার নির্বাচনী বিবৃতি আমি দেখলাম, আরও বিবিধ ঘটনা ঘটল, যার কথা আমি আগেই বলেছি। আমি আরও দেখলাম, কয়েকজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের সঙ্গে তুমি জড়িয়ে পড়েছ, এবং মনে হল তোমার ওপর তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব পড়ছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তিগতভাবে সজ্জন কিন্তু আমার মনে হয়েছিল তাঁরা কোনও বামপন্থী চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করেন না কিংবা বলা যায়, কোনও সংগঠিত চিন্তাধারারই প্রতিনিধিত্ব করেন না। তাই আমি তাঁদের বলি, দুঃসাহসিক, রাজনৈতিক বিশিষ্টার্থে। দুঃসাহসের মানসিকতা, কোনও ব্যক্তির মধ্যে কিংবা কোনও জাতির মধ্যে অতিশয় প্রশংসনীয়, কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে, যেটা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে আদৌ অসম্মানজনক নয়। আমি এই দুঃসাহসের মনোভাব আদৌ পছন্দ করিনি এবং আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর বলে মনে করেছি। অস্পষ্ট বামপন্থী স্লোগান, যার কোনও স্পষ্ট বামপন্থীমতাদর্শ অথবা নীতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই, ইউরোপে ইদানীং খুবই দেখা যাচ্ছে। এর ফল দাঁড়িয়েছে ফ্যাসিবাদের বিকাশ, জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর সংখ্যকের দূরে সরে যাওয়া। ভারতেও যে ওরকম কিছু ঘটতে পারে এই সম্ভাবনা আমার মন ভারাক্রান্ত করল, আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল। আন্তর্জাতিক বিষয়ে তুমি যে আমার থেকে ভিন্ন মত পোষণ করো, নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ট ইতালি সম্পর্কে আমাদের নিন্দাবাদ সম্পূর্ণ অনুমোদন করো না, তাতে আমার অস্বাচ্ছন্দ্য আরও বেড়ে গেল। সমগ্র পরিস্থিতিটির দিকে তাকিয়ে, স্পষ্টত তুমি যেদিকে আমাদের নিয়ে যেতে চাইছিল, সেটা আমার একেবারেই ভাল লাগল না।

তোমার চিন্তাধারা কোনদিকে প্রবাহিত হচ্ছে, সে-বিষয়ে আমি ঠিক নিশ্চিত হতে পারলাম না, তবে সাধারণভাবে লক্ষণ যা যা দেখলাম তাতে বিচলিত বোধ করলাম। সেই কারণেই ফেব্রুয়ারির প্রথমদিকে তোমাকে চিঠি লিখে বললাম, বিষয়টা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে। আমার আর সময় হল না এবং তারপর তুমি অসুখে পড়লে। আমার সমস্যাগুলি থেকেই গেল, আমাকে পীড়িত করতে থাকল। আমার ২২ ফেব্রুয়ারির বিবৃতিতে এবং তার অল্পদিন পরে "ন্যাশনাল হেরাল্ড" পত্রিকায় আমার প্রবন্ধে যা দেখাল সেটা ওসবেরই প্রতিফলন। পরস্পরের সঙ্গে যাঁদের মিল নেই এমন সব সদস্য, যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র, যাঁদের মধ্যে একটি মাত্র যোগসূত্র, এক অভিন্ন প্রতিপক্ষ, তাঁদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন বাঞ্ছনীয় মনে হল না। আমি তাতে কী করে যোগ দেব বুঝলাম না। পুরনো ওয়ার্কিং কমিটি নিয়েই আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে, যদিও মতপার্থক্য সত্ত্বেও আমরা একে অপরকে বুঝতে পারতাম এবং বছরের পর বছর একসঙ্গে কাজ করে যেতে পেরেছিলাম। সেই অবস্থা চালিয়ে যেতে আমার কোনও ইচ্ছা ছিল না। আর একটি ক্ষুদ্র কার্যকরী সমিতি, যার কতিপয় সদস্যের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়াও নেই, তার সঙ্গে কাজ করা? সে একেবারেই অসম্ভব।

একটি ব্যক্তিগত বিষয়ের কথাও আমি খোলাখুলি বলতে চাই। আমার বরাবরই মনে হয়েছে তুমি পুনর্বার নির্বাচিত হতে মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহী। রাজনৈতিক দিক থেকে তাতে অন্যায় কিছু নেই এবং আবার নির্বাচিত হতে চাইবার এবং সেজন্যে কাজ করবার তোমার অধিকার ছিল।

কিন্তু আমি তাতে বেদনা অবশ্যই পেয়েছি, কেন না আমার মনে হয়েছে তুমি যে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলে, তাতে ও ধরনের ব্যাপারের দৃষ্টি তোমার থাকা উচিত ছিল। আমার আরও মনে হয়েছিল, তুমি যদি অন্য কাজ করতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পন্থার ওপর বেশি প্রভাব ফেলতে পারতে।

বল্লভভাই প্যাটেল তোমার বিষয়ে কী বলেছিলেন তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছ এবং বলেছ আমি সেজন্য তাঁকে সমালোচনা করিনি। নানা ধরনের বিবৃতি নির্বাচনের সময়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার সেসব একেবারেই পছন্দ হয়নি। আমার মনে হয়, সেসব বিবৃতি না দিলেই ভাল হত। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে, সেসব বিবৃতির মধ্যে এমন বিশেষ ধরনের কিছু ছিল না যার জন্যে আমার হস্তক্ষেপ করা দরকার হয়ে পড়েছিল। তোমার নির্বাচন দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, বল্লভভাইয়ের এই উক্তিটি তিনি করেছিলেন শরৎকে পাঠানো একটি ব্যক্তিগত টেলিগ্রামে। আমার ধারণা, কোনও কথা প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলা হল, না ব্যক্তিগত চিঠি কিংবা টেলিগ্রামে লেখা হল, তাতে তফাৎ হয়ে যায়। ওই বার্তাটি যে তোমার দাদার কাছে পাঠানো হয়েছিল, তারও তাৎপর্য আছে। ও কথাটি বললে কড়া কথা বলা হয়, কিন্তু ও এমন কথা নয়, যার উদ্দেশ্য অসাধু। বল্লভভাইয়ের এই যদি বিশ্বাস হয়, যে ভারতের মঙ্গলের জন্যে গান্ধীজির নেতৃত্ব প্রয়োজন এবং তোমার নির্বাচন দেশকে সেই নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করবে, তা হলে অবশ্যই তিনি সেরকম ভাবতে এবং বলতে পারেন। ঠিক যেমন, গান্ধীজিকে আমরা যতই শ্রদ্ধা করি, আমরা এইরকম সিদ্ধান্তে অবশ্যই পৌঁছতে পারি যে তাঁর নেতৃত্ব দেশের পক্ষে বিপজ্জনক, হানিকর।

আমি তোমায় লিখেছিলাম, তোমার নির্বাচন কিছু ভাল করেছে, কিছু খারাপ করেছে। এখনও আমার সেই ধারণা, যদিও ভালর চেয়ে খারাপই বেশি হয়ে থাকতে পারে, এই অর্থে যে আমাদের মধ্যে তার ফলে বিভেদ সৃষ্টি হবে। ভাল এইটা ছিল যে আমাদের কোনও কোনও প্রাচীন সদস্যের আত্মতুষ্টি তাতে ধাক্কা খেতে পারে। আমার এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, যে তোমার পক্ষে যে ভোট পড়েছে, সেটা প্রধানত সেই আত্মতুষ্টির বিরুদ্ধে এবং কিছু পরিমাণে যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। আমি একথা বারে বারে গান্ধীজিকে এবং অন্যদেরকে বলেছি এবং অনুনয় করেছি, এদিকে মনোযোগ দিতে। এই প্রতিবাদে সারবত্তা ছিল, যা আকার নিল সভাপতি নির্বাচনের ভোটে।

তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছ, একদিকে আমি ওপর থেকে হস্তক্ষেপ করার বিরোধিতা করেছি, আবার ৪ ফেব্রুয়ারি চিঠিতে আমি তোমাকে লিখেছি, যে তুমি সভাপতি হিসাবে অতি নিষ্ক্রিয় এবং নিজের ক্ষমতা প্রয়োগে অনিচ্ছুক। সে-কথা সত্যি। যে হস্তক্ষেপের কথা আমি বলেছি, সেটা হয়েছিল তোমার পুনর্নির্বাচনের ঠিক আগে এবং প্রধানত তার পরে। তার পূববর্তী সময়ের কথা আমি বলিনি। তোমার নিজের ক্ষমতা প্রয়োগে অনিচ্ছার কথা যখন বলেছি, বিগত বছর ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি তোমার মনোভাবের কথা বলেছি। আমি আশা করেছিলাম সেখানে তুমি বেশি জোরালো নেতৃত্ব দেবে, যদিও অনৈক্য আমি চাইনি। আর প্রেসিডেন্ট হিসাবে তুমি প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করো, আমি তাও চাইনি।

তুমি ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যের তোমার অনুপস্থিতিতে এবং তোমার অজ্ঞাতে মিলিত হয়ে ডা. পট্টভি সীতারামাইয়াকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে প্রার্থী করার কথা বলেছ। আমার মনে হয়, এ-বিষয়ে বল্লভভাইয়ের বিবৃতি থেকে কিছু ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এবং তুমি যে আমাকে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়ার সুযোগ দিলে তাতে আমি খুশি হয়েছি। আমি যতদূর জানি, সেরকম কোনও বৈঠক হয়নি। বারদৌলিতে যা হয়েছিল, তা হচ্ছে গান্ধীজি এবং আমি এবং অন্যেরাও মৌলানা আজাদের ওপর প্রার্থী হতে রাজি হওয়ার জন্যে চাপ

দিয়েছিলাম। তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। যেদিন আমি বারদৌলি থেকে চলে আসব (তোমার চলে আসার পরের দিন) আমি গান্ধীজি এবং অন্যদের কাছে বিদায় নিতে গিয়েছিলাম। গান্ধীজির কুটীরের বারান্দায় আমরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলাম। মৌলানা আর বল্লভভাই ছাড়া আর কে কে ছিলেন আমার মনে পড়ছে না। মৌলানা আবার বললেন তিনি দায়িত্ব নিতে মনস্থির করতে পারছেন না। তখন বল্লভভাই বললেন, মৌলানা আজাদ যদি রাজি না হয়, ডা. পট্টভি সীতারামাইয়াকে দাঁড়াতে অনুরোধ করা উচিত। নির্বাচনের জন্যে ডা. পট্টভির নামটি আমার পছন্দ হয়নি। তাই, আমি প্রতিবাদ না করে আবার বললাম, মৌলানাকে রাজি করাতেই হবে। তারপর অবিলম্বে আমি বারদৌলি থেকে চলে এলাম। এলাহাবাদে পৌঁছে আমি একটা টেলিগ্রাম পেয়ে জানলাম, মৌলানা সম্মত হয়েছেন। আমি সোজা আলমোড়া চলে গেলাম এবং সভাপতি নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।

"নিন্দাসূচক" প্রস্তাবগুলির প্রসঙ্গে, প্রকৃত ঘটনা এই: তোমাকে চাপ দেওয়া হয়েছিল এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্যে, কারণ আমার মনে হয়েছিল তা নাহলে গান্ধীজির সঙ্গে যৌথভাবে তোমার কাজ করা অসম্ভব হবে, তা ছাড়া আমার আর ও বিষয়ে কোনও আগ্রহ ছিল না। গান্ধীজি কিংবা রাজেন্দ্রবাবু কিংবা সর্দার প্যাটেল তা নিয়ে কী ভাবছিলেন, তাঁরাই বলতে পারবেন। আমার পরিষ্কার ধারণা হয়েছিল, বিষয়টার ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আমরা যখন ত্রিপুরি পৌঁছলাম, আমাকে আবার তাই বলা হল। আমার নিজের সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিল, বিষয়টি তুমি কিংবা রাজেন্দ্রবাবু কিংবা দু'জনেই সংক্ষেপে এআইসিসি-তে উত্থাপন করতে পারো এবং বিষয়টি নিয়ে কোনও প্রস্তাব আনা উচিত হবে না। অন্যেরা তাতে রাজি হতে চাইছিলেন না। একজন পরামর্শ দিলেন, এআইসিসি-র জন্যে একটা প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করা যেতে পারে। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে চলার জন্যে নয়, উদ্দেশ্য ছিল বিষয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠকের আগে পরিস্থিতিটা পরিষ্কার করে আনা। যথারীতি আমাকে বলা হল প্রস্তাবের খসড়া করতে। আমি বললাম, আমি যথাসাধ্য তাঁদের মতামত প্রস্তাবের অন্তর্গত করবার চেষ্টা করব, যদিও আমি তার সঙ্গে একমত ছিলাম না। এআইসিসি-র জন্যে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব আমি খসড়া করলাম, তাতে পুরনো ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি এবং গান্ধীজির নেতৃত্ব ও নীতিসমূহের ওপর আস্থা ব্যক্ত করা হল এবং আরও বলা হল লেখনীতে কোনও ছেদ ঘটা উচিত নয়। তাতে "নিন্দার" কোনও উল্লেখ করা হয়নি, গান্ধীজির ইচ্ছা অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার কথাও বলা হয়নি। সে-প্রস্তাব অনুমোদিত হল না এবং পরে রাজেনবাবু একটি দীর্ঘতর এবং সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করলেন, সম্ভবত অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে। (গোবিন্দবল্লভ পন্থ তখনও এসে পৌঁছননি) সে-প্রস্তাব আমার মনঃপূত হয়নি এবং সেকথা আমি বললাম। আমি বললাম, "নিন্দা" বিষয়ক প্রস্তাবটি আমি এমনিতে আপত্তিজনক মনে করি না, যেভাবে প্রস্তাবটি লিপিবদ্ধ হয়েছে। তা হলেও আমার মনে হয়েছিল, তার দরুন তুমি যদি বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকো, সেটা বাঞ্ছনীয় নয়, বিশেষত তুমি যখন অসুস্থ ছিলে। আমাকে বলা হয়েছিল, প্রস্তাবে এই বিষয় সম্পর্কে যে উল্লেখ তার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, কারণ যাঁদের সম্মানে আঘাত লেগেছিল—তাঁদের জন্যে পরিস্থিতিটা পরিষ্কার করে না দেওয়া হলে তাঁদের পক্ষে সহযোগিতা করা কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ তাঁদের কাজ করতে হলে সে কাজ অবশ্য প্রয়োজনীয়, যেমন প্রয়োজনীয় গান্ধীজির নীতির প্রতি আনুগত্য। উপরন্তু এও বলা হয়েছিল, যে প্রস্তাবে বিষয়টির উল্লেখ যতটা সম্ভব মৃদু এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে করা হয়েছিল। তার বেশি কিছু করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তারপরে আর আমার বিশেষ কিছু বলবার ছিল না। আমি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলাম, প্রস্তাবটির কোনও কোনও বিষয় আমার দুর্ভাগ্যজনক মনে হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু

এটি তাঁদের সম্মানের প্রশ্ন ছিল, আমি আর তার সঙ্গে কোনওভাবে জড়িত থাকলাম না। আলোচনায় আমি কোনও অংশ নেব না ঠিক করলাম।

তারপরে আমি আর জানি না কী হল। এআইসিসি-র অধিবেশনেই আমি শুনলাম গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রস্তাবটি উত্থাপন করবেন। তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে। পরে প্রস্তাবটি যখন বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে পাঠান হল, আমি প্রস্তাবটির পিছনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করে বললাম, আবার বললাম, কয়েকটি পরিবর্তন করলে ভাল হয়। আমি লক্ষ করতে বললাম, মূল প্রস্তাবটি এআইসিসি-র জন্য রচনা করা হয়েছিল, একটি ব্যাপার এবং একটি বিতর্কে মোটামুটি একটা পরিসমাপ্তি আনবার জন্যে। কিন্তু প্রস্তাবটি যখন কংগ্রেসে যাচ্ছে, সেটিকে ভিন্নভাবে দেখা দরকার। আবার আমাকে বলা হল, প্রশ্নটি ছিল সম্মানের এবং সে জিনিসটি পরিষ্কার করা না হলে, তাঁরা সহযোগিতার কথা কী করে চিন্তা করবেন? তোমার মনে থাকবে, কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে তাঁরা তোমায় বলেছিলেন, তোমার সঙ্গে সহযোগিতা তাঁরা করতে পারবেন না। ওই প্রস্তাবটি তাঁরা দেখছিলেন, একটি সেতু হিসাবে, যার সাহায্যে সহযোগিতা সম্ভব হবে। প্রস্তাবটি না থাকলে সেতুও থাকে না।

প্রকাশ্য অধিবেশনের ঠিক আগে, যখন তুমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলে, আমি প্রস্তাবটি সংশোধন করিয়ে নেওয়ার খুব চেষ্টা করলাম, আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, যদিও সেটিকে এআইসিসি-তে পাঠাবার মি. আনে-র প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হল। মনে হল মি. আনে-র ধারণা ছিল এবং আমাদের সকলের মনেও তিনি সে-ধারণা সৃষ্টি করলেন, যে বঙ্গদেশের অনেক বন্ধু তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেন। আমাদের এখনও ধারণা হল (সেটা ভুলও হতে পারে) যে প্রস্তাবটি তুমিও অনুমোদন করেছ। তারপর কী হয়েছিল, তুমি জানো।

পরের দিন বিষয় নির্বাচনী সমিতির প্যান্ডালে কংগ্রেসের অধিবেশনে যখন বল্লভভাই প্যাটেল প্রস্তাবটি পেশ করছিলেন, সুরেশ মজুমদার আমার কাছে এসে বললেন, প্রস্তাবটি এআইসিসি-র কাছে পাঠানো হোক। অর্থাৎ মি. আনে-র পরামর্শ আবার উঠে এল। তিনি বললেন, আগের রাত্রিতে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল এবং এবারে সেই পরামর্শ সহজেই গ্রহণ করা হবে। আমি তাঁকে বললাম, সে-বিষয়ে আমি অসহায়, বিশেষ করে সেই পর্যায়ে, যখন পন্থ সেই পরামর্শটি পেশ করছিলেন। আমি আগে নানারকমভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে গেলেই ভাল করবেন। তারপরে তিনি কী করলেন আমি জানি না।

ত্রিপুরিতে পর্দার আড়ালে এবং প্রতিনিধিদের শিবিরে যা চলছিল, তার কথা বলতে গেলে, সেসব তুমিই বোধহয় আমার চেয়ে বেশি জানো। আমি আমার কুটীর থেকে বেরোইনি। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া এবং খুব কম লোকই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মিশরীয় প্রতিনিধিদের নিয়েও আমি খানিকটা ব্যস্ত ছিলাম।

তুমি আমার "মক্কেলদের" কথা বলেছ। আমার সন্দেহ ওইসব মক্কেলরা আমার ওকালতিতে বিশেষ সন্তুষ্ট নন। আমি তাঁদের কাছে অতিশয় অপ্রিয় হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি। সেটা কম বাহাদুরির কাজ নয়, প্রায় প্রতিটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরই অপ্রীতিভাজন হওয়া।

'নিন্দাসূচক' প্রস্তাবটি গঠনতন্ত্র বহির্ভূত কিংবা অধিকার বহির্ভূত ছিল কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত তুমি নেবে। প্রশ্নটি সম্পর্কে আমার মতামত দেওয়ার, বিশেষ অর্থ নেই। কংগ্রেসের কাজ যাতে চলে এবং বর্তমানের অচল অবস্থার ভাব দূর হয়, তাতে স্বভাবতই আমি আগ্রহী। তুমি যে মনে করছ, তোমার বিরুদ্ধে আমি জনসাধারণের মধ্যে একটা আন্দোলন করেছি, এতে আমি বিস্মিত। গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলার পর আমি বিষয়টি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন, এবং দীর্ঘকাল সে-বিষয়ে চিন্তা করেছি। আমার দুর্ভাগ্য, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে আমি, আমার পক্ষে

যতটা চিন্তিত থাকা উচিত তার চেয়ে বেশি চিন্তিত থাকি। ইউরোপে একটা অতি গুরুতর সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। যার পরিণতিতে যুদ্ধ লাগতে পারত। আমার মনে হল, কী ঘটনা ঘটে দেখবার জন্যে হাত গুটিয়ে বসে থাকা আমাদের উচিত হবে না। শরৎ যে টেলিগ্রাম গান্ধীজিকে পাঠালেন তা থেকে মনে হল যে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে আসবে না, অর্থাৎ ঘটনার স্রোত এগিয়ে চলেছিল, অথচ কিছুই করা হচ্ছিল না। অতএব আমি ঠিক করলাম টেলিগ্রামটি পাঠাব। পরে আমি সেটি গান্ধীজিকে এবং আরও দু-এক জনকে দেখালাম। কোনও খবরের কাগজের লোককে আমি টেলিগ্রামটি দিইনি কিংবা দেখাইনি। বস্তুত সে-সময়ে যে দু-একজন গান্ধীজির সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে আমি তার কথা বলিনি। এমনকী আজও আমি অন্য কাউকে সেটি দেখাইনি। সম্ভবত অন্য কারও কাছ থেকে টেলিগ্রামের খবরটা কেউ জানতে পেরে খবরের কাগজে সেটা দিয়ে দিয়েছে। ত্রিপুরি কংগ্রেসের আগে ১২ জন ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যের পদত্যাগ, এবং অধিবেশনের পরবর্তী পরিস্থিতির মধ্যে যে তুলনা তুমি করেছ, তোমার কি মনে হয় না, সেটা সঠিক নয়? তাঁদের পদত্যাগের জন্যে কোনও অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়নি, হওয়ার কথাও ছিল না। তাঁরা যদি পদত্যাগ না করতেন, জোর করে সদস্য হিসাবে কাজ করে যেতে চাইতেন, তা হলে অচল অবস্থা হতে পারত। তাঁদের পদত্যাগের জন্যে প্রতিবাদ জানানো তো দূরের কথা, আমি মনে করি, ব্যক্তিগত কারণে এবং রাজনৈতিক কারণে তাঁদের পদত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

তোমাকে যখন দিল্লি থেকে টেলিগ্রামটা আমি পাঠালাম, তখন আমি ভাল করেই জানতাম, তুমি সেখানে যেতে পারবে না। আমি চাইছিলাম, তুমি গান্ধীজিকে বলো, তিনি যেন ধানবাদে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করেন। আমার মনে হয়, তুমি যদি তাঁকে আমন্ত্রণ করতে, তিনি যেতেন। স্বাভাবিকভাবেই বিনা আমন্ত্রণে যেতে তিনি ইতস্তত করছিলেন। ত্রিপুরি প্রস্তাব বৈধ কিংবা অবৈধ যাই হোক, তোমাকেই এগিয়ে যেতে হত। সে-প্রস্তাবে তোমার প্রতিক্রিয়া কী হবে না জানলে তিনি কিছু করতে পারেন না। হয়তো তুমি ভেবেছিলে তিনি ধানবাদে যেতে পারবেন না। তোমার সেক্রেটারি যখন এখানে আমাকে টেলিফোন করলেন, গান্ধীজি তখন দিল্লি যাত্রার জন্যে স্টেশনেই যাচ্ছিলেন। অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার যদি কঠিনও হয়, আমার মনে হয়েছিল তোমরা পরস্পরের মধ্যে পত্রালাপ করে পরিস্থিতিটা স্বচ্ছ করতে পারতে। তোমাকে বিব্রত করবার জন্যেই, কিংবা তোমার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাবার উদ্দেশ্যেই আমি দিল্লি থেকে টেলিগ্রাম করেছিলাম, এই অভিযোগ করে তুমি আমার ওপর অবিচার করছ।

আরও বলি, আমার কথা বলতে গেলে, গয়ার-এর রোয়দাদের জন্যে গান্ধীজি দিল্লিতে বসে থাকবেন, এটা আমারও আদৌ ভাল লাগেনি। তাঁর অনশন, কিংবা গ্যয়ারের কাছে বিষয়টি নিয়ে যাওয়াও আমার পছন্দ হয়নি। গান্ধীজির অনশন যার ফলে ভঙ্গ হল, সেই মীমাংসার শর্ত সম্পর্কেও আমার ধারণা খুব উচ্চ নয়। তাঁর অনশন ভঙ্গে আমি আমার সন্তোষ ব্যক্ত করেছিলাম, তার বেশি কিছু নয়।

এই পত্রটি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেল। এবং এটি আমি প্রায় একবার বসে একটানা লিখলাম, তোমার চিঠিটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এখনও অনেক কথা থেকে গেল। তুমি যেসব কথা বলেছ, আমারও কিছু বলবার ছিল। আমার যে সব ভাবনা-চিন্তার কথা তুমি বলেছ, তা নিয়ে আমার আলোচনা করার দরকার নেই। সে সব আমি স্বীকার করছি। এবং তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি। এ কথা তুমি ঠিকই বলেছ, প্রেসিডেন্ট পদে আমি অনেক সময়ে সেক্রেটারির মতো কিংবা উঁচুদরের কেরানির মতো কাজ করেছি। নিজের সেক্রেটারি এবং নিজের কেরানি হিসাবে কাজ করা আমার দীর্ঘকালের অভ্যাস এবং বোধ হয় আমি তার ফলে অন্যদের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করে থাকি। এও ঠিক আমার জন্যেই কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রস্তাব দীর্ঘ এবং বাকবহুল হয়ে

পড়ে, কতকটা গবেষণা প্রবন্ধের মতো হয়ে যায়। আমার মনে হয় ওয়ার্কিং কমিটিতে আমি বড় বেশি কথা বলেছি, আমার যেরকম আচরণ করা উচিত ছিল, তা করিনি।

তোমার বাম ও দক্ষিণ এই দুটি শব্দের ব্যবহারে আমি আপত্তি করি কারণ আমার মনে হয়েছে শব্দ দুটি তুমি ঢিলে-ঢালা ভাবে ব্যবহার করেছ, স্পষ্ট করোনি। অবশ্য 'বাম' ও দক্ষিণ বলে একটা জিনিস আছে। কংগ্রেসে এবং দেশে 'বাম' ও 'দক্ষিণ' আছে। কিন্তু শব্দ দুটি যদি অর্থবহভাবে ব্যবহার করা না হয়, তার দ্বারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে এবং হয়ে থাকে।

আমার মনে হয় না রাজকোট এবং জয়পুর অন্য সব প্রশ্নকে চাপা দিয়ে দিয়েছে, এমন কথা আমি কখনও বলেছি। হয়তো আমি যা বলেছি তা হচ্ছে এই যে রাজকোট (অর্থাৎ আমি বলতে চেয়েছি, গান্ধীজির অনশন এবং তার নানাবিধ তাৎপর্য) নানারকম ভাবে জাতীয় ক্ষেত্রে প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে।

বোম্বাই ট্রেড ডিসপিউট বিল-এর প্রসঙ্গে বলি, আমি ভারতে পৌঁছই সে বিল আইনে পরিণত হয়ে যাওয়ার এবং বোম্বাইয়ে গুলি চালনার পরে। এটা আমি উল্লেখ করছি ঘটনা হিসাবে, কোনও অজুহাত হিসাবে নয়।

যুক্তপ্রদেশে আমাদের একটা নিয়ম আছে যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকে, গ্রাম পর্যন্ত পর পর দু' বছর কেউ প্রেসিডেন্ট থাকতে পারবেন না।

তুমি বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ত্রিপুরিতে প্রতিনিধি নিয়ে আসার ব্যাপারে দুর্নীতির কথা বলেছ। আমার নিজের প্রদেশের কথা বলতে গেলে, আমার ধারণা ওরকম ধরনের কিছু করা হয়েছিল, যদিও সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই। হয়তো অন্যত্রও ওরকম কাজ করা হয়েছে। আমি বলি, একটা তদন্ত হোক সব প্রদেশে। তাতে আমাদের সংগঠনের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

তুমি পন্থ প্রস্তাবের বিষয়ে আমার ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছ। আমার মনে হয় না প্রস্তাবটা অনাস্থা সূচক ছিল, তবে প্রস্তাবটিতে তোমার বিচারবুদ্ধির প্রতি পূর্ণ আস্থার অভাব নিশ্চয় সূচিত হয়েছে।

হ্যাঁ বাচক দিকে, প্রস্তাবটি গান্ধীজির প্রতি আস্থার ভোট।

আমি কি সমাজতন্ত্রবাদী না ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী? ওই দুটি শব্দের মধ্যে বৈপরীত্য কি থাকতেই হবে? আমরা কি সকলেই এমন সুসংহত মানুষ যে একটি শব্দ অথবা শব্দবন্ধ দ্বারা আমাদের নিজেদের সংজ্ঞা দিতে পারি? মনে হয় মানসিকতায় এবং যেভাবে শিক্ষিত হয়েছি তাতে আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, যদিও বৌদ্ধিক দিক থেকে আমি সমাজতন্ত্রবাদী, সেসব কথার অর্থ যাই হোক। আমি আশা করি সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট অথবা খর্ব করে না। প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রবাদ আমাকে এই কারণে আকৃষ্ট করে যে, অসংখ্য ব্যক্তিমানুষকে সমাজতন্ত্রবাদ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু আলোচনার বিষয় হিসাবে আমি ক্লান্তিকর, বিশেষ করে এক অত্যধিক দীর্ঘ পত্রের শেষে। এটাই মেনে নিয়ে সে-প্রসঙ্গ শেষ করা যাক যে, আমি একটি অসন্তোষজনক মানুষ, যে নিজেকে নিয়েও সন্তুষ্ট নয়, পৃথিবীটাকে নিয়েও সন্তুষ্ট নয়, এবং যাকে, যে ক্ষুদ্র জগতে সে বাস করে সেই জগৎও বিশেষ পছন্দ করে না।

এই প্রত্যুষকালে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে আমার মতামত লিখে জানাবার সাহস হচ্ছে না। সাধারণত সেসব বিষয়ে আমি চুপ করে থাকি না। তুমি ঠিকই বলেছ, আমি কথা বড় বেশি বলি লিখি তার চেয়েও বেশি। এখন ওই পর্যন্তই থাক। তবে, একটা কথা আমি যোগ করব, যেসব আদর্শ এবং লক্ষ্যর এখন আর বিশেষ কেউ মূল্য দেয় না, আমি তার পক্ষ প্রায়ই নিয়ে থাকি। এবং জার্মানি এবং ইতালিকে নিন্দা করি, এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি আবার ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদকেও আমি বাহবা দিই না।

ত্রিপুরির আগে ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কয়েকটি প্রবন্ধ দু-এক দিন

আগে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম। একটি হারিয়ে গিয়েছিল। এখন আমি আলাদাভাবে পুরো সেট তোমাকে পাঠাচ্ছি। ফ্রি প্রেস জার্নাল, কিংবা অন্য কোনও পত্রিকায় সম্প্রতি আমি কোনও প্রবন্ধ লিখিনি।

প্রীত্যর্থী জওহর

শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস
কংগ্রেস সভাপতি
পো. অ. জিয়ালগোরা
জিলা মানভূম

জওহরলাল নেহরুর প্রতি

জিয়ালগোরা পো. অ.
জিলা মানভূম
বিহার, ১৫ এপ্রিল ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

মহাত্মাজি তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপের অনুলিপি অন্যদের যেমন পাঠিয়েছেন, তোমাকেও পাঠিয়েছেন কিনা আমি জানি না।

যদি তুমি না পেয়ে থাক, সর্বশেষ পরিস্থিতিটা তোমাকে জানাতে চাই। তার পরে আমি জানতে চাইব, তোমার প্রতিক্রিয়া, আর এর পরে আমার কী করা উচিত।

মহাত্মাজি একটি অমিশ্র ক্যাবিনেটের ওপর খুব জোর দিচ্ছেন। তিনি চান আমি সে-রকম একটি ক্যাবিনেট ঘোষণা করি, এবং আমার কর্মসূচি প্রণয়নও ঘোষণা করি। তারপর আমার এ. আই. সি. সি.-র কাছে গিয়ে তার রায় চাওয়া উচিত।

আমি অনেকবার মহাত্মাজিকে বলেছি, সেরকম ক্যাবিনেট আমি গঠন করতে পারি না একাধিক কারণে।

দ্বিতীয়ত কংগ্রেস আমাকে আমার কর্মসূচি প্রণয়ন ও ঘোষণা করবার দায়িত্ব দেয়নি। আমাকে শুধু বিশেষ একভাবে, অর্থাৎ পন্থ-প্রস্তাব অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে।

কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়ার পরে, শেষ পর্যন্ত আমি বলেছি, গত্যন্তর না থাকলে তিনিই যেন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার দায়িত্ব নেন, যেহেতু তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী অমিশ্র ক্যাবিনেট গঠন করতে আমি অক্ষম। শেষ দুটি চিঠিতে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করেছি, তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

আমি মানি না মহাত্মাজি নিজে ক্যাবিনেট ঘোষণা করবেন কিনা। যদি করেন অচল অবস্থার অবসান হবে। কিন্তু যদি না করেন, তখন কী হবে? তা হলে বিষয়টি এ.আই.সি.সি.-র সামনে পেশ করতে হবে, অমীমাংসিত অবস্থায়। সেই পরিস্থিতিতে এআইসিসি কী করবে আমি জানি না।

আমার মনে হচ্ছে, পত্রালাপের দ্বারা যদি মীমাংসায় পৌঁছনো না সম্ভব হয়, ব্যক্তিগত ভাবে

আমাকেই গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলে মীমাংসার একটা চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু রাজকোটের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজির গতিবিধি অনিশ্চিত। এমনকী এ.আই.সি.সি.-র বৈঠকের সময়ে তাঁর কলকাতায় আসারও স্থিরতা নেই, যদিও আমাকে উনি টেলিগ্রামে জানিয়েছেন, আসার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।

এখন, গান্ধীজি যদি এ.আই.সি.সি. গঠন না করেন, গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সময় হাতে রেখে এ.আই.সি.সি.-র বৈঠক কি আমার মুলতুবি রাখা উচিত? এ.আই.সি.সি.-র সদস্যেরা কি মুলতুবি অনুমোদন করবেন, না কি তারা আমার নামে দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ আনবেন? অনেকের মতে আমরা দু'জনে দেখা করে মীমাংসার জন্যে শেষ চেষ্টা না করা পর্যন্ত এ.আই.সি.সি.-র বসা উচিত নয়। মুলতুবি রাখা দরকার হবে একমাত্র যদি ২৭ তারিখ এ.আই.সি.সি.-র যে-বৈঠক হওয়ার কথা আছে, তার আগে মহাত্মাজি আসতে না পারেন। এখন মুলতুবি রাখার বিষয় তোমার কী মত?

এখন পর্যন্ত পত্রালাপ যা হয়েছে তার পূর্ণ বয়ান আমি তোমাকে পাঠাতে পারি, যদি মহাত্মাজি না পাঠিয়ে থাকেন।

আরেকটা কথা। কয়েক ঘণ্টার জন্যে এখানে একবার আসা তোমার পক্ষে কি সম্ভব হবে? তা হলে আমরা কথাবার্তা বলতে পারতাম, আর এর পরে কী করা উচিত সে বিষয়ে তোমার পরামর্শ পেতে পারতাম।

চিঠিটি ক্ষুদ্র হল, এবং তাড়াহুড়ো করে লেখা হল। একজন বন্ধুর সঙ্গে পাঠাব। জানি না সর্বশেষ পরিস্থিতিটি পরিষ্কার করে জানাতে পেরেছি কিনা, আশা করি পেরেছি।

যদি তুমি আসবার সময় করে উঠতে পারো, তুফান এক্সপ্রেসে (৮ ডাউন) এলে তোমার সময় বাঁচবে। গাড়িটি ধানবাদ পৌঁছয় বিকালে ৪-৩০ মিনিটে। তুমি বোম্বাই মেল ধরতে পারো, ধানবাদে রাত্রি বারোটায় পৌঁছবে। জামাডোবা ধানবাদ থেকে ৯ মাইল। তোমাকে আনতে স্টেশনে গাড়ি যাবে।

প্রীত্যর্থী
সুভাষ

জওহরলাল নেহরুর পত্র

১৭ এপ্রিল ১৯৩৯

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ১৫ এপ্রিলের চিঠি আমি সদ্য পেলাম। তোমার এবং গান্ধীজির মধ্যে পত্রালাপের কপি আমাকে প্যারেলাল পাঠিয়েছেন। সব চিঠিই আমাকে পাঠানো হয়েছে কিনা আমি জানি না, তবে প্রথমদিকের কয়েকটি অবশ্যই পেয়েছি।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে, যে-সব ঘটনা ঘটেছে তাতে আমি অতিশয় দুঃখিত। কী করা উচিত আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিংবা আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটার সঙ্গে তোমার এবং গান্ধীজির প্রস্তাবের এতই অমিল যে, আমি যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। এই অবস্থায় আমার নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হচ্ছে। অথচ এটাও স্পষ্ট, আমাদের প্রত্যেককে এই অচল

অবস্থায় অবসানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, সে দায়িত্ব আমরা এড়াতে পারব না। এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মানের প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা তার চেয়ে অনেক বড়, এই সংকটের কালে কংগ্রেস এবং ভারত কীভাবে কাজ করে যাবে।

আমি তোমার কাছে যাব, তোমার এই প্রস্তাব হঠাৎ এসেছে, এবং আমাকে বিস্মিত করেছে। আগামী কয়েকদিন আমার কয়েকটি কাজ ঠিক হয়ে আছে এবং এই মুহূর্তে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, সেগুলি সম্পর্কে কী করা উচিত। কিন্তু তোমাকে আমি না বলতে পারি না, বিশেষত যখন বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ। তোমার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করবার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কবে আসতে পারব আমি তোমাকে চিঠিতে জানাব।

তোমার
জওহর

শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস
কংগ্রেস সভাপতি
জিয়ালগোরা
(বিহার)

জওহরলাল নেহরুর প্রতি

জিয়ালগোরা
২০ এপ্রিল ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

আমি আজ মহাত্মাজিকে দুটি টেলিগ্রাম পাঠালাম। তার একটির বক্তব্য আজকের চিঠিতেও আবার লিখেছি। এই সঙ্গে আমার চিঠি ও টেলিগ্রামের অনুলিপি পাঠাচ্ছি।

পত্রালাপ প্রকাশ না করা সংক্রান্ত টেলিগ্রামটিতে আমি তোমার নাম ব্যবহার করেছি। আশা করি তাতে তুমি আপত্তি করবে না।

গান্ধীজির জ্বর নিয় আমি বেশ দুশ্চিন্তায় আছি। আমি খুব আশা করছি, ওঁর জ্বর শীঘ্রই সেরে যাবে। তবে, ভগবান না করেন, জ্বর যদি না ছাড়ে, আমরা কী করব? তেমন হলে কী হতে পারে তা নিয়ে একটু ভেবে দেখো। উনি যে এত দুর্বল, সেটাই আমার উদ্বেগের কারণ। এ বিষয়ে আমাকে চিঠি দাও। কাল ২১ তারিখে আমি কলকাতা রওনা হচ্ছি।

প্রীত্যর্থী
সুভাষ

বসু-ঠাকুর পত্রালাপ

(নভেম্বর ১৯৩৮ — মে ১৯৩৯)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র [মূল বাংলা]

সুভাষচন্দ্র বসু

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে আমার নিমন্ত্রণপত্র পাঠাবার উদ্যোগ করছিলুম ঠিক এমন সময়ে তোমার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। কখন তোমার এখানে আসবার সুবিধা হবে আমাকে জানিয়ো— তোমার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হব। তোমার সঙ্গে আলোচনার বিষয় অনেক আছে। তোমার শুভকামনায় স্বদেশের সঙ্গে আমিও যোগ দিই। ইতি ২০।১১।৩৮

তোমাদের
(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে [মূল বাংলা]

Office Bearers For 1938
President :
SUBHAS CHANDRA BOSE
Treasurer :
JAMNALAL BAJAJ
General Secretary :
J. B. KRIPALINI

President's Calcutta Address:
38-2 Elgin Road, Calcutta
Telephone: Park 59
All India Congress Committee
Swaraj Bhawan, Allahabad
Telephone : 341
Telegram : 'Congress'

Wardha
১৪.১২.৩৮

শ্রীচরণেষু,

আপনার অনুগ্রহলিপির উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা চাহিতেছি। আমি জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি নাগাদ 'শান্তিনিকেতন' আসিতে ইচ্ছা করি। ঠিক তারিখ আমি যথাসময়ে আপনাকে জানাইব এবং আপনার সুবিধামতই দিন স্থির করিব।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিনীত
সুভাষ চন্দ্র বসু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র [মূল বাংলা]

সুভাষ চন্দ্র বসু

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

জানুয়ারীর মাঝামাঝি তোমার আসার প্রতীক্ষা করে রইলুম। ডিসেম্বর মাসটা আমাদের এখানে লোকের ভিড়ে কাজের ভিড়ে সমস্ত অবকাশটা নিরেট ঠাসা, জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেও তার জের চলে। সেই গোলমালের সময়টা তুমি এড়িয়ে আসছ শুনে খুশি হলুম। ইতি ২০।১২।৩৮

তোমাদের
(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র [মূল বাংলা]

কল্যাণীয়েষু,

ফেব্রুয়ারীর আরম্ভে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। সঙ্গীতভবনের সাহায্যকল্পে সেখানে আমাদের অভিনয়ের পালা আছে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অভিনয়ের প্রথম দিন। সেই দিন আমি তোমাকে রঙ্গশালায় প্রকাশ্য অভিনন্দন দিতে চাই। যদি অবকাশ করতে পারো আমি খুবই খুশি হব। কিছুদিন থেকে আমার মনে এই ইচ্ছা জেগেছে। আশাকরি বাধা হবে না।

ইতি ১৪।১।৩৯
তোমাদের
(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র [মূল বাংলা]

শান্তিনিকেতন
উত্তরায়ণ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

কল্যাণীয়েসু,

আগামী কংগ্রেসে তোমাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রকাশ্য সমর্থন করবার জন্যে আমার কাছে উপরোধ এসে পৌঁচেছে। আমার বক্তব্য তোমাকেই জানিয়ে রাখচি। এ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে পূর্বেই আমি মহাত্মাজী ও জওহরলালকে চিঠি লিখেছিলেম বোধ হয় জানো।

তারপরে তার ফলের হিসাব রাখা আমার কাজ নয়। যাঁরা কংগ্রেসের চালক তাঁরা বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্তব্য স্থির করেন— আমি রাষ্ট্রিক সম্প্রদায়ের বহির্ভুক্ত মানুষ, সে উদ্দেশ্য আমার অগোচর, সুতরাং অব্যবসায়ীর ইচ্ছাজ্ঞাপনের বেশী আর কিছু করার অধিকার আমার নেই।

দ্বিতীয় কথা, বাংলা দেশের ভাগ্য পরিচালনার কাজে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি— পরস্পর একটা আনাগোনা চলচে। কেউ যদি মনে করে এই ঘনিষ্ঠতার উপলক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কোনো একটা সুযোগ ঘটানো চলচে তাতে তোমার অনিষ্টই ঘটবে। আমি চাই অসংকোচে তোমার সংগে যেন যোগ স্থাপন করতে পারি।

আজ বাংলাদেশ দুর্বল। আমার ইচ্ছা কোনো যোগ্য লোককে বাংলা প্রদেশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে নির্বিচারে তার চারদিকে সমস্ত বাঙালিকে সম্মিলিত করা হয়। সেই মিলনে বললাভ করে আর একবার বাংলা আপন শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করতে পারবে। নাট্যশালায় তোমাকে সম্বর্ধনার যে সংকল্প করেছি তার মূল কথাটি এই। কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে যে ইচ্ছা আকার নেবে এ ইচ্ছা চেয়ে গভীর এবং অকৃত্রিম। এর পরিচয় পেয়েছিলুম বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে— তখন বাংলা নিজের অভিপ্রায়কে যে রকম সম্পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশ করেছিলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেমন আর কখনো ঘটেনি। সেই উপলব্ধিকে আর একবার জাগানো চাই, এবং এই প্রচেষ্টায় তোমাকেই আশ্রয় করব। আর সকল পথ ছেড়ে এই পথেই প্রবৃত্ত হতে ইচ্ছা করি— এই আমার মনের কথা তোমাকে বললুম।

তুমি এখানে আসতে চেয়েচ জেনে খুব খুশি হলুম।

ইতি
১৯।১।৩৯
তোমাদের
(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশে ভাষণ [মূল বাংলা]

২১ জানুয়ারি ১৯৩৯, শান্তিনিকেতনের অমরকুঞ্জে একটি জনসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুভাষচন্দ্র বসুর অভ্যর্থনায় এই ভাষণ প্রদান করেন।

"কল্যাণীয় সুভাষচন্দ্র! আমাদের যা বলবার কথা, হাজার বছর পূর্বে আমাদের ঋষিরা তা বলে গেছেন। যে আগমনী মন্ত্র এখানে শুনলেন, পৃথিবী যাঁদের আগমন প্রতীক্ষা করে তাঁদের জন্য তার অভ্যর্থনাবাণী কতদিন হ'ল তাঁরা বলে গেছেন। সে পুরাতন হবে না। সমস্ত দেশে যে অভ্যর্থনার ভিতর দিয়ে তুমি এসেছ, আমাদের দেশ তোমাকে যে আসন দিয়েছে, সেই আসনের বার্তা রয়েছে ঋষিদের সেই পবিত্র বাণীর ভিতরে। তাঁদের বাণীতে তুমি পেয়েছ তোমার আসন। আমার খুশি হবার একটা কারণ হচ্ছে এই— এই সুযোগে তুমি আমার পরিচয় পাবে। এ কথা শুনে হাসতে পার, তুমি বলতে পার আমার পরিচয় তোমার জানা আছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ প্রকৃত কথা নয়। কেননা আমার পরিচয় জানবার গুরুতর বাধা আমাদের দেশে ছিল।

আমার আধখানি পরিচয় নিয়ে আমি বাংলা দেশে এসেছি। আমাকে জানে আমি বাণীর সাধক। এখানেই থেমে গেছে। তারপর যে আমার আর কোনও সাধনায় দেশ আমাকে আহ্বান করছে সে খবর পৌঁছতে বিলম্ব হল, সেটা মনের ভিতর গ্রহণ করতে বাধা হওয়ার কথা। দোষ দিই না। আমাদের কবি কালিদাস বলে গেছেন— বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ— বাক্য এবং অর্থ দুই-ই একসঙ্গে সংযুক্ত। বাক্যের সঙ্গে অর্থের পরস্পর যোগ রয়েছে। যে অংশে আমি বাণীর চরণে আমার অর্ঘ্য এনে দিয়েছি সেখানে দীর্ঘকাল তোমরা আমাকে পেয়েছ, দেখেছ, হয়তো আনন্দও পেয়ে থাকবে— কখনও কখনও হয়তো আঘাতও পেয়েছ। কিন্তু অর্থের যে সাধনা, যে অর্থ নিজের জন্য নয়, দান করবার জন্য, সে অর্থের সাধক যে আমি এটা তোমাকে জানতে হবে, নইলে আমার সম্পূর্ণ পরিচয় হবে না।

বাক্ এবং অর্থ দুই-ই এক জায়গায় যদি দেখ তা হলে বুঝবে আমার মধ্যে উভয়ের সম্মিলন শুভোদয়ের জন্য হয়েছে। আমার সৌভাগ্য, বাণীর আহ্বানের সঙ্গে অর্থের আহ্বান আমাকে আকর্ষণ করেছিল জীবনের কোন এক সময়ে। যৌবনের প্রান্তভাগে একদিন আহ্বান পেয়ে এখানে এসেছি। তারপর দীর্ঘকাল এই সাধনা করেছি লোকচক্ষুর অন্তরালে। সেটা দেখবার কারো দরকার ছিল না। দেখেনি। চোখে না-পড়বার কারণ এই— অত্যন্ত অস্পষ্ট করে আমাকে দেখেছে। অস্পষ্ট আমার পরিচয়, আমি অর্থের সাধক। সে সাধনায় সিদ্ধি হয়েছে কিনা সে অপর কথা। বাণীর সাধনায় আমার সিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছ। যাঁরা আমাকে ভালবাসেন তাঁরা বলেন, আমি একটা কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি বাক্ দেবতার (দেবী?) কল্যাণে। কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে পড়বে— তুমি যদি এসে দেখ, এই কর্মক্ষেত্রে আমার পরিচয়, তোমার দৃষ্টিতে এই জন্য পড়বে, তোমার সহৃদয়তার জন্য শুধু নয়, তোমার অভিজ্ঞতা সর্বদেশব্যাপী। তুমি দেখেছ,— য়ুরোপে যারা অর্থের সাধক, তাদের সাধনার পীঠস্থান তুমি দেখেছ,— তারা কি রকম করে ত্যাগে কর্মে বড় হয়ে উঠেছে, কি রকম অর্ঘ্য দিয়েছে জীবনে, নানা বিচিত্র দিক থেকে তুমি দেখেছ। তার মধ্যে একটা পরিচয়— মানুষের মানবত্ব— যে পরিচয় যদি এখানে জাগ্রত হয়ে থাকে, ত্যাগের ক্ষেত্র, সাধনার ক্ষেত্র যদি এখানে খুলে থাকে, তাহলে তুমি আনন্দিত হবে আমি জানি। আর যে পরিচয় আমি গর্বের সঙ্গে তোমাকে দিয়ে চাই, এই কারণে দিতে চাই তুমি এখানে দেশের কর্ণধাররূপে এসেছ, দেশ তোমাকে স্বীকার করেছে। এখানে দেশের যে সাধনা সে তোমাকে জানতে হবে, স্বীকার করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। যদি তুমি স্বীকার কর তাহলে এ চিরকালের জন্য সার্থক হবে। এখানে অনেক দৈন্য আছে, দুঃখ অনেক পেয়েছি, আমার দুঃখ অপরিসীম। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে কত শোক, কত দুঃখ, কত দৈন্য, কত ঋণজালে জড়িত বিড়ম্বনা, কত নিন্দা, কত অন্যায় উক্তি, কত নিরাশার কারণ— এর ভিতর দিয়ে এসেছি। আমার সৌভাগ্য আজ তোমাকে আহ্বান করে এনেছি আমাদের এই কর্মক্ষেত্রে— আর কিছুর জন্য নয়, তুমি আমাকে জানবে।

তোমাকে আমি রাষ্ট্রনেতারূপে স্বীকার করেছি মনে মনে। আমার সংকল্প আছে, জনতার মধ্যে আমার সেই বাণী আমি প্রকাশ করব। তুমি বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় অধিপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, অন্য দেশকে আমি জানি না, সেখানে আমার জোর খাটবে না, আমি বাঙালি, বাংলাকে জানি— বাংলার প্রয়োজন অসীম। সেই জন্য তোমাকে যদি আহ্বান করি, স্বীকার করতে হবে— আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আমি তোমাকে আহ্বান করব রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ নিয়ে। এখানে তুমি আমাদের অতিথি, বন্ধু। আমাদিকে দেখে আমাদের কার্যভার যদি লাঘব করতে পার কর। অবসর হলে আসতে যেতে হবে। আজকে আমার আনন্দ এই জন্য, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তুমি আশ্রমে ঢুকনি— সে খুব বড় কথা। এই সীমানার মধ্যে এ রূপ অন্য রকম।

দেশে যারা অপমানিত তাদের সম্মান দেবার জন্য আয়োজন করেছি এখানে। ছেলেরা, যারা বাল্যকাল থেকে শিক্ষার বিড়ম্বনায় পীড়িত, যারা বিদ্যালয়ে ভোগ করে সহস্র কারাদণ্ড, শান্তি নাই, সৌন্দর্য নাই, মুক্তি নাই, কিছু নাই,— কেবল আছে পড়া মুখস্ত করা। যতগুলি ছেলেমেয়েকে পেরেছি কারাগার থেকে মুক্ত করবার সাধনা করেছি— তার আনন্দ তুমি বুঝবে, তুমি কারাবাস ভোগ করেছ। এই কারাবাস আমাদের প্রত্যেক শিশু ভোগ করছে, কী দুঃখ, কি পীড়ন আমি জানি। যে-সময় শিশুদের মন সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত থাকবে, যখন তারা গাছপালা পশুপাখীর সঙ্গে মিলনের আনন্দে মগ্ন থাকবে, সে-সময় তাদেরকে জাঁতাকলে ঠেলা হয়— কি শিক্ষা শেখান হয় তার নমুনা আমরা দেখেছি। পড়া পাখী, বুলিবলা পাখীর মত গতানুগতিক দল সৃষ্টি করি; তারা হয় বিদেশের বুলি মুখস্ত করা খাঁচার পাখী। পারিনি। চেয়েছি করতে, পারি না-পারি চেষ্টা করেছি আনন্দ দিতে, মুক্তির স্বাদ দিতে। এখানকার হাওয়াতে এখানকার ছেলেমেয়েদের যে আনন্দ, তাতে তাদের দাবী আছে, এই জন্য তারা জন্মেছে। তা নইলে কেন ফুল ফোটে, দিনান্তে কেন পাখী ডাকে যদি তারা ক্লাস ঘরে ঢুকে দাগ-কাটা passage মুখস্ত করে জীবনের সুন্দর সময় নষ্ট করে, কি দুর্ভাগ্য, মানুষ সৌন্দর্যবোধ থেকে বঞ্চিত থাকবে! এই জন্য এখানে আরম্ভ করেছিলাম। পারিনি— এত ভার কি একলা বইতে পারা যায়। অনেক রকম দুঃখের ভিতর দিয়ে চলেছি। একেবারে কিছু ফল হয়নি বলতে পারি না। মনের মত হয়নি।

অন্য দেশের যারা দেখেছে, বলেছে ভাল। শুধু বলেনি, অনুকরণ করেছে। এ তুমি বোধ হয় দেখে থাকবে। ওরা বুঝতে পেরেছে, শিক্ষাটা সমগ্র জীবনের সঙ্গে জড়িত। শিক্ষাকে যারা বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তারা তাকে পীড়িত করে রাখে। মানুষের মনকে তারা কেটে কেটে বাঁচাবার চেষ্টা করে। এখানে শিক্ষাকে সমগ্র জীবনের সঙ্গে যুক্ত ক'রে— আনন্দের সঙ্গে, উৎসবের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে, চিত্রকলার সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত করে— আহ্বান করেছি। এখানে নূতনত্ব আছে। দেশের লোক জিজ্ঞাসা করে— কি তোমার সিলেবাস্, কি বই পড়, ব্যাকরণ কি পরিমাণ হয়, সেগুলি মুখস্ত করতে পেরেছে কিনা এবং কয়টা বাড়ীঘর আছে,— সরস্বতীকে টেনে এনে কারারুদ্ধ করবার আয়োজন বিশেষ লোকের ভাল লাগে। এখানে তা দেখতে না পেয়ে তারা দুঃখ করেছে। আমি বলেছি— দেশের অন্তরে যে রত্ন আছে সাধনা আছে তা তারা শূন্য করে ফেলেছে। কাজ যা করবার তা সম্পূর্ণ হয়নি এখানে। সেটা ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারিনি, সামর্থ্য নাই। রাষ্ট্রীয় দিক থেকে তুমি আমার কর্মের পরিচয় নিয়ে যদি তাকে স্বীকার করতে পার সুখী হব।

বসু কর্তৃক প্রতিভাষণ

২১.১.১৯৩৯

গুরুদেব,—এবার এখানে আমার নূতন করে আসা। ইতিপূর্বে কয়েকবার আমি এখানে এসেছি, বোধ হয় দুইবার। কিন্তু আজকের আসার মধ্যে একটা নূতনত্ব আছে। প্রধানত দুই কারণে এখানে এসেছি। এক কারণ, আপনি ডেকেছেন। আর এক কারণ, নিজের মন থেকে আসবার ইচ্ছা এবং প্রেরণা অনুভব করেছি।

আপনার যে অখণ্ড সাধনা, সেটা সাধারণ মানুষ বা সাধারণ ভারতবাসী যে উপলব্ধি

করবে— অন্ততপক্ষে সহজে উপলব্ধি করবে এটা আশা করা অন্যায়। আমিও সেই সাধারণের মধ্যে একজন। সুতরাং আমি যে আপনার অখণ্ড সাধনার মহত্ত্ব ও গৌরব উপলব্ধি করতে পারব সে দুরাকাঙ্ক্ষা আমি করি না, সে উপলব্ধি যখন আসে একদিনে আসে না। সে উপলব্ধি হচ্ছে ক্রমিক এবং সারা জীবনব্যাপী। তবে আমার মনে হয় যদি আমরা চলার পথে চলতে থাকি তা হলে সে উপলব্ধি ক্রমশ প্রসার লাভ করবে।

আপনার প্রাণের মধ্যে একটা বেদনা, একটা অভিমান আছে— হয়ত আছে— যে, আপনার দেশবাসী আপনাকে জানল না, আপনার সাধনা বুঝল না। কিন্তু তার জন্য কি দেশবাসীকে আপনার দোষ দেওয়া উচিত। যদি তারা এত সহজে বুঝতে পারত, তাহলে তারা তো আপনার সমান হয়ে পড়ত। দ্রষ্টার সম্মুখে যে সত্য প্রতিভাত হয় সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা উপলব্ধি করা যেমন কঠিন তেমনি সময়সাপেক্ষ। আমরা এইটুকু বলতে পারি, আমরা চলার পথে চলেছি, চলবার চেষ্টা করছি। দ্রষ্টার সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আপনার সাধনাকে বুঝবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করছি। তা হলে দেশবাসীকে অপরাধী করতে পারবেন না। এটা সর্বদেশে সর্বজীবে (লোকে?) দেখতে পাওয়া যায়—যাঁরা নূতন পথ দেখান, মানুষকে যাঁরা নূতন সত্যের উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন, তাঁদের মহত্ত্ব, তাঁদের মূল্য সাধারণ লোকে বুঝে না। বরং সেই সত্যদ্রষ্টা ও সাধকদের শূলে চড়াবার চেষ্টা করে। সুতরাং আপনার দেশবাসীর যে নিশ্চেষ্টতা আপনি দেখেছেন ও উপলব্ধি করেছেন সেটা শুধু আমাদের দেশের লোকের ধর্ম নয়, বোধ হয় মানবজাতির ধর্ম। মানুষের অন্তরে যত দৈন্যই থাকুক না কেন, আমরা যারা আশাবাদী, আমাদের মনে হয়, এই দৈন্য নীচতা ও মলিনতার অন্তরালে একটা দেবত্ব নিহিত আছে এবং যে সত্য সাধনা আজ দেশবাসী বুঝছে না, একদিন সে তা বুঝবে, বুঝবার চেষ্টা করবে।

মধ্যে মধ্যে একথা উঠে এবং আমাদের মধ্যে আলোচিত হয়, হয়ত আপনার মনেও উঠেছে— আপনি উপস্থিত না-থাকলে আপনার সাধনার কি হবে? সেদিন কলকাতায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমি বলতে চাই— কোন বস্তু বা সাধনা মরতে পারে না যতদিন তার সার্থকতা আছে। আপনি যে-জিনিষটা দেশবাসীকে ও মানবজাতিতে বুঝাবার ও শিখাবার চেষ্টা করছেন, যতদিন সেটা তারা না শিখবে, না বুঝবে, ততদিন পর্যন্ত আপনার এই প্রত্যক্ষ বাস্তব সাধনা মরতে পারে না। যে সত্য ও সাধনা নিয়ে আপনার সমস্ত জীবন দাঁড়িয়ে রয়েছে যেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে সেটা প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন শান্তিনিকেতন বাঁচুক বা মরুক তাতে কিছু আসবে যাবে না। যতদিন পর্যন্ত সে সত্য ও সাধনা জাতির প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না-হবে ততদিন পর্যন্ত আপনার শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা থাকবেই থাকবে। শুধু তাই নয়, এ রকম সাধনা ভারতের দিকে দিকে স্থানে স্থানে গড়ে উঠবে।

আমরা যারা রাষ্ট্রীয় জীবনে বেশি সময় ও শক্তি ব্যয় করি, আমরা মর্মে মর্মে আমাদের অন্তরের দৈন্য অনুভব করি। প্রাণের দিক দিয়ে যে-সম্পদ না পেলে মানুষ বা জাতি বড় হ'তে পারে না, সেই সম্পদ, সেই প্রেরণা আমরা চাই। কারণ আমরা জানি, সে প্রেরণা, সত্যের সেই আভাস যদি প্রাণের মধ্যে পাই তাহলে আমাদের কর্মজীবনের ও বহির্জীবনের সাধনা সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক হবে। আপনার কাছ থেকে সে প্রেরণা আমরা চাই।

আমরা হয়ত আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের আদর্শ বড়। আমরা চাই মানুষের ও জাতির পরিপূর্ণ জীবন। আমরা চাই আমাদের দেশে প্রত্যেক নরনারী, আমাদের অখণ্ড জাতি সব দিক দিয়ে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। এই যাত্রার পথে, এই সাধনার

পথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একটা সোপান মাত্র। আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ রয়েছে, যে স্বপ্ন আমাদিগকে বিভোর করে রেখেছে সে অতি উচ্চ। সেই স্বপ্নকে ও আদর্শকে আমরা কতটা বাস্তব জীবনে মূর্ত করে তুলতে পারব জানি না। তার জন্য কতটুকু শক্তি আছে নিজেরাই জানি না। ব্যক্তিগত শক্তি ও যোগ্যতা যতটা থাকুক না কেন আমরা মস্ত আদর্শ (সামনে) রেখে চলতে চেষ্টা করছি। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস আছে, আমাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা যতটুকু হউক না কেন, আমরা যে-পথে চলেছি সেটা সত্যের পথ। আমাদের পরে যারা আসবে তারা আমাদের চেয়ে বেশি শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী হবে। আমাদের যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে তা তারা শোধরাতে পারবে, সেই বিশ্বাস নিয়ে আমরা কাজ করবার চেষ্টা করছি। আপনি জাতিকে— শুধু জাতিকে কেন, সমগ্র মানব সমাজকে আদর্শের পথ দেখিয়েছেন,— শুধু দেখিয়েছেন তা নয়, মানুষকে সেই পথে চালাবার চেষ্টা করে এসেছেন। তাই বাণীর বা সাহিত্যের সাধনায় আপনার চেষ্টা পর্যবসিত হয় নাই, শুধু ভগবানের উপাসনায় আপনার সাধনা পর্যবসিত হয় নাই, অন্তরের আদর্শকে আপনি বহির্জীবনে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন। আমরা এইটুকু আপনার চরণে নিবেদন করতে চাই— এই আদর্শ আমাদেরও জীবনের আদর্শ, কারণ এটা আমাদের জাতির আদর্শ। আমরা আমাদের জীবনে তা সফল করতে পারি বা না পারি সেই আদর্শকে আমরা অন্তরে রেখেছি, বাহিরে রেখেছি এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি, ভবিষ্যতেও করব।

আমরা যারা সামান্যভাবে কাজ করতে চেষ্টা করছি, আপনার কাছে যে অপরিসীম স্নেহ উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি ও পেয়ে থাকি এতে আমাদের জীবন বাস্তবিক ধন্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, যখন আমাদের জীবনে নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন বিপদ-আপদ এসেছে, যখন আমাদিগকে কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, যখন আমাদের মন নিরুৎসাহে নির্জীব হয়ে পড়েছে তখন দেশবাসীর কাছ থেকে এবং যারা দেশের শ্রেষ্ঠ নেতা ও স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক তাঁদের কাছে কী অপরিসীম স্নেহ ও প্রেরণা পেয়েছি তা স্মরণ করলে মনে হয় আমাদের জীবন ধন্য, সাময়িক বিপদে-আপদে আমাদের কিছু আসে যায় না।

ত্যাগ বলতে একটা ভুল ধারণা আমরা করি। মনে হয় যেন তার মধ্যে বেদনা আছে, কষ্ট আছে। যেখানে প্রকৃত ত্যাগ সেখানে কষ্ট নেই। বেদনার অনুভূতি থাকলে মানুষ ত্যাগ করতে পারে না। ত্যাগে যে অনাবিল আনন্দ আছে সে আনন্দ আপনার জীবনে জমাট রূপ ধারণ করেছে। সে আনন্দ আমাদের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করুক, অনুপ্রাণিত করুক, এই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা। আপনার কাছ থেকে আমরা জীবনের প্রতি মুহূর্তে আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। কারণ আমরা জানি আপনার আশীর্বাদ আমরা যতদিন পাব, ততদিন বুঝব আমরা ঠিক পথে চলছি। আপনার আশীর্বাদ আমাদের যাত্রাপথে পরম পাথেয় বলে আমরা সকলে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র [মূল বাংলা]

ওঁ

উত্তরায়ণ

শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু
কল্যাণীয়েষু,

সম্পূর্ণ অনিবার্য কারণে এবং শারীরিক দুর্বলতাবৃদ্ধি হওয়াতে আপাতত তোমার অভিনন্দন সভা বন্ধ রাখতে বাধ্য হতে হোলো। সুরেন এবং সুধাকান্তর কাছ থেকে সমস্ত বিবরণ শুনতে পাবে।

তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও স্নেহ অক্ষুণ্ণ আছে এ সম্বন্ধে সংশয়মাত্র কোরো না। ইতি

২৭।১।৩৯

তোমাদের
(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ [মূল বাংলা]

দেশনায়ক*

সুভাষচন্দ্র,

বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে তালের মিল নেই। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে জীর্ণ দেহে রোগের মতো, তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি; কাছের লোককে তারা দূরে ফেলে, আপনকে করে পর, শ্রদ্ধেয়কে করে অসম্মান, স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন; যোগ্যতার জন্য সম্মানের বেদী স্থাপন ক'রে যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টিসম্মুখে ঊর্ধ্বে তুলে ধ'রে মান বাঁচাতে হবে তখন সেই বেদীর ভিত্তিতে ঈর্ষান্বিতের আত্মঘাতক মূঢ়তা নিন্দার ছিদ্র খনন করতে থাকে, নিজের প্রতি বিদ্বেষ ক'রে শত্রুপক্ষের স্পর্ধাকে প্রবল ক'রে তোলে।

---

* ১৯৩৯এর জানুয়ারি মাসে সুভাষ চন্দ্রের উদ্দেশে এই ভাষণ লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এটি মুদ্রিতও হয়। অদ্যাবধি অজ্ঞাত কোনও কারণে এই ভাষণ প্রচারিত হয়নি এবং কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আয়োজিত সুভাষের সম্বর্ধনা সভাটিও মুলতুবি হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হলে এই ভাষণ কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, ৯ মে ১৯৪৬ (২৫ বৈশাখ ১৩৫৩) সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। ১৯৪১ সালে কবির প্রয়াণ ঘটেছিল। তিনি বা সুভাষ চন্দ্র— কেউই এই অভিভাষণের প্রকাশ দেখে যাননি।

বাহিরের আঘাত যখন দেহে ক্ষতবিস্তার করতে থাকে তখন নাড়ীর ভিতরকার সমস্ত প্রসুপ্ত বিষ জেগে উঠে সাংঘাতিকতাকে এগিয়ে আনে। অন্তর-বাহিরের চক্রান্তে অবসাদগ্রস্ত মন নিজেকে নিরাময় করবার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সমাধানের আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে; কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম ক'রে ইতিহাসের দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি ক'রে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানোনি। তোমার এই চারিত্রশক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলাদেশ যত কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্বাদে পরিণত ক'রে তুলবে, এই চাই। আপাত পরাভবকে অস্বীকার করায় যে বল জাগ্রত হয়, সেই স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে। আজ চারিদিকেই দেখতে পাই বাংলাদেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখ, এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা ক'রেই সে যদি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার দুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যেই; বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রুদ্ধ ভাণ্ডারের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে তবেই সে বাঁচবে। হিংস্র-দুঃসময়ের পিঠের উপরে চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হতে হবে; এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি।

দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে দুর্গম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবই যদি আমরা মিলতে পারি। আমাদের সকলের চেয়ে দুরূহ সমস্যা এইখানেই। কিন্তু কেন বলব 'যদি', কেন প্রকাশ ক'রব সংশয়। মিলতেই হবে, কেননা দেশকে বাঁচতেই হবে। বাঙালী অদৃষ্টকর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না এই আশাকে সমস্ত দেশে তুমি জাগিয়ে তোলো, সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালী মারের উপরে মাথা তুলবে। তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে। সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাংলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন ক'রে আনবে, সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে— অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালী আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আসন প্রস্তুত। বাঙালীর পরস্পরবিরোধের সমাধান হোক তোমার মধ্যে, আত্মসংশয়ের নিরসন হোক তোমার মধ্যে, হীনতা লজ্জিত ও দীনতা ধিক্কৃত হোক তোমার আদর্শে, জয়ে পরাজয়ে আপন আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখার দ্বারা তোমার মর্যাদা সে রক্ষা করুক।

বাঙালী নৈয়ায়িক, বাঙালী অতি সূক্ষ্ম যুক্তিতে বিতর্ক করে, কর্ম-উদ্যোগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বন্ধ্যা বুদ্ধির গর্বে প্রতিবাদ করতে তার অদ্ভুত আনন্দ, সমগ্র দৃষ্টির চেয়ে রন্ধ্রসন্ধানের ভাঙন-লাগানো দৃষ্টিতে তার ঔৎসুক্য; ভুলে যায় এই তার্কিকতা নিষ্কর্মা বুদ্ধির

নিষ্ফল শৌখিনতামাত্র। আজ প্রয়োজন হয়েছে তর্কের নয়, স্বত-উদ্যত ইচ্ছার। বাঙালীর সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃত্বপদে, সেই ইচ্ছা তোমাকে সৃষ্টি ক'রে তুলুক তোমার মহৎ দায়িত্বে। সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় ক'রে আবির্ভূত হোক সমগ্র দেশের আত্মস্বরূপ।

বাংলাদেশের ইচ্ছার মূর্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বহুবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করা সম্ভব কি না এ নিয়ে সেদিন বিজ্ঞের মতো তর্ক করেনি, বিচার করেনি, কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল।

তার পরবর্তী কালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভরূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল, ভুল ক'রে আগুন লাগাল, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে ক'রে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীর হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখিনি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণনিবেদন, আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে; কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মতো প্রমাণ ক'রে গেছে বাংলায় দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের যে হৃদয়বিদারক প্রমাদ দেখা দিয়েছিল তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসী লেপন করুক, তবু কি কালো করতে পেরেছে তার অন্তর্নিহিত তেজস্ক্রিয়তাকে?

আমরা দেশের দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতার পরিচয়, সেইখানেই আমাদের আশা প্রচ্ছন্ন ভূগর্ভে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ প্রাণবান ও ফলবান করবার ভার নিতে হবে তোমাকে; বাঙালীর স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার কল্পনাপ্রবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি,— এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর ক'রে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত ক'রে নব বসন্তে তার নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃত্ব গ্রহণ করো তুমি।

বলতে পারো, এত বড়ো কাজ কোনো একজনের পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে না। সে কথা সত্য। বহু লোকের দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবেও সাধ্য হবে না। একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোকে এক হ'তে পারলে তবেই হবে অসাধ্যসাধন। যাঁরা দেশের যথার্থ স্বাভাবিক প্রতিনিধি তাঁরা কখনোই একলা নন। তাঁরা সর্বজনীন, সর্বকালে তাঁদের অধিকার। তাঁরা বর্তমানের গিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম সূর্যোদয়ের অরুণাভাসকে প্রথম প্রগতির অর্ঘ্যদান করেন। সেই কথা মনে রেখে আমি আজ তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে।

এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে, বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই, অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসন স্থাপন করতে চাই— রাষ্ট্রধর্মে যিনি পৃথিবীতে নূতন যুগের উদ্বোধন করেছেন, ভারতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্যে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলন-যজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। তোমার সাধনায় বাংলা দেশের সেই আত্মাহুতি

ষোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজস্বী হোক— তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

বহুকাল পূর্বে একদিন আর-এক সভায় আমি বাঙালীসমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলাম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর-এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব— আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তার পরে আশীর্বাদ ক'রে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন ক'রে।

শান্তিনিকেতন
মাঘ, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র* [মূল বাংলা]

কলিকাতা

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
কল্যাণীয়েষু,

কয়েকদিন কোলকাতায় এসে দেশের লোকের মনের ভাব ভালো করে জানবার সুযোগ পেয়েছি। সমস্ত দেশ তোমার প্রত্যাশায় আছে— এমন অনুকূল অবসর যদি দ্বিধা করে হারাও তাহলে আর কোন দিন ফিরে পাবে না। বাংলাদেশ থেকে তুমি যে শক্তি পেতে পার তার থেকে বঞ্চিত হবে, অন্য পক্ষও চিরদিন তোমার শক্তি হরণ করতে থাকবে। এতো বড়ো ভুল কিছুতেই কোরো না। তোমার জন্য বলছিনে, দেশের জন্য বলছি। মহাত্মাজী যাতে শীঘ্রই তাঁর শেষ বক্তব্য তোমাকে জানান দৃঢ়ভাবে সেই দাবী করবে। যদি তিনি গড়িমশি করেন তাহলে সেই কারণ দেখিয়ে তোমরা পদত্যাগ করতে পারবে। তাঁকে বোলো শীঘ্রই তোমাকে ভবিষ্যতের কর্তব্য স্থির করতে হবে, অতএব আর বিলম্ব সইবে না। আশা করি তোমার শরীর সুস্থ হবার দিকে চলেছে। আজই শান্তিনিকেতনে ফিরছি।

ইতি
২।৪।৩৯
তোমাদের
(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে ভুলক্রমে ৩.৪.৩৯ তারিখের পরিবর্তে ২.৪.৩৯ তারিখ লেখেন। কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের সংবাদে রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত বার্তা এ গ্রন্থের পূর্ব অধ্যায়ে প্রদত্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র [মূল বাংলা]

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তোমার অসুখের সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়েছি। বারে বারে তোমার শরীরে এই রোগের আক্রমণ দেশের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ।

তোমাদের সংকল্পিত কংগ্রেস ভবনের পরিকল্পনাটি যথোচিত হয়েছে বলে, আমি মনে করি। এই ভবনের প্রয়োজনীতা বিচিত্র এবং ব্যাপক। সর্বজনের আনুকূল্যে এর প্রতিষ্ঠা উপযুক্তরূপে সম্পন্ন হবে আশা করে আগ্রহান্বিত হয়ে আছি। এই গৃহের সম্পূর্ণতার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্যের এবং গৌরবের রূপ দেখতে পাব।

ইতি
২৭।৫।৩৯
(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্যান্য পত্রাবলি

ই. উডসকে

Artillery Mansions
Victoria Street
London, S.W. 1
রবিবার
১৬.১.৩৮

প্রিয় মিসেস উডস,

শ্রীযুত বাজাজ মারফৎ আপনার যে চিঠি এবং টেলিগ্রাম পেলাম তার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এখানে আসার পর ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত এমন ভয়ঙ্করভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি— যার জন্য আপনাকে লিখতে দেরি হল।

আপনি জেনে খুশি হবেন গত রাত্রে আমি প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।

আমি বিমানযোগে ১৯ তারিখে দেশে ফিরে যাব, ভারতে পৌঁছব ৪ দিনে।

আজ আমি কেমব্রিজ যাচ্ছি, কাল অক্সফোর্ড যাব।

আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আপনি আমার জন্যে যত কষ্ট করেছেন তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।

আপনার আন্তরিক শুভার্থী
সুভাষচন্দ্র বোস।

মিসেস ভেটারকে

Hotel Grande-Bretagne
'Le Petit Palais',
Athens
২১. ১. ৩৮, রাত্রি

প্রিয় মিসেস ভেটার

আমি দুঃখিত যে লন্ডনে যাওয়ার পথে মানচেন পেরিয়ে আসার পরে আমি আপনাকে চিঠি দিতে পারিনি। আমি আরও বেশি দুঃখিত যে ভিয়েনা যেতে পারলাম না। সেখানে যাওয়ার আমার খুবই ইচ্ছে ছিল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইংল্যান্ড নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হল। তবে সেখানে যাওয়া আমার সার্থক হয়েছে। তাঁরা আমাকে আরও সময় দিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কারণ অন্য দিকে মহাত্মা গান্ধী চাইছিলেন আমি যত দ্রুত সম্ভব ফিরে যাই। ভিয়েনা যাবার পরিকল্পনা এ কারণেই ত্যাগ করতে হল। আমি যে জন্যে খুবই দুঃখিত। ভারতে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে অত্যন্ত কঠিন সময় এবং কঠিন পরিশ্রম।

নেপলস থেকে এখানে আসার পথে এবং এখানেও আমরা খারাপ আবহাওয়া পেয়েছি, তাই পৌঁছতে দেরি হয়েছে। আজ রাত্রে আমরা এখানে (এথেন্স-এ) থাকব— কাল থাকব বসরা (ইরাক)-এ। তার পরের রাত্রি—যোধপুর (ভারত)-এ। এবং ২৪ তারিখ দুপুরে আমি কলকাতায় পৌঁছব।

আমার সব বন্ধুকে আমার কথা বলবেন। এবং তাঁদেরকে আমার নমস্কার জানাবেন। আপনার শরীর কেমন? ড. ভেটার কেমন আছেন? আপনাদের দু'জনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

রাসবিহারী বোসের পত্র*

২৫.১.৩৮
টোকিও

প্রিয় সুভাষবাবু,

ভারত থেকে প্রাপ্ত একটি সংবাদপত্রে দেখে খুশি হলাম আপনি কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। বাঙালি হিসেবে আমি আপনার জন্যে গর্ব অনুভব করি। ব্রিটেনের ভারত অধিকারের জন্যে বাঙালিরা অংশত দায়ী ছিল, এবং আমার মতে ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যে ত্যাগস্বীকার বাঙালিদের প্রাথমিক কর্তব্য। ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা, দুঃখ বরণের দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামে

---

* এই পত্রটি ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স কর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হয়, ফলে নেতাজি এ চিঠি পাননি।

ভারতকে নেতৃত্ব প্রদান বাঙালিদের নিয়তি। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সেই কারণে আমি আশা করি, আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্যে আপনি কংগ্রেসকে সুস্পষ্ট নেতৃত্ব প্রদান করবেন। বর্তমানে কংগ্রেস এক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এখন সেটি এক সাংবিধানিক সংগঠন। গভর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। পরাধীন দেশে কোনও সাংবিধানিক ও আইনানুমোদিত সংগঠন কোনওদিন, স্বাধীনতা এনে নিতে পারে না, কারণ শাসকেরা সংবিধান কিংবা আইন রচনা করেন তাঁদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। ব্রিটিশদের দৃষ্টিতে যে-সব সংগঠন অসাংবিধানিক এবং বে-আইনি, একমাত্র তারাই দেশকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে কংগ্রেস অসাংবিধানিক সংগঠনে পরিণত হয়। সেই জন্যেই কংগ্রেস তখন অনেক কিছু করতে পেরেছিল। কিন্তু এখন আবার কংগ্রেস তার আগেকার নিরীহ রূপ ধারণ করেছে। কার্যত কংগ্রেস এবং নরমপন্থী দলগুলোর মধ্যে এখন আর কোনও তফাৎ নেই। আমি বুঝতে পারি না, আগে, যখন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন কংগ্রেস কেন তাঁর সমালোচনা করেছিল। কংগ্রেস এখন ঠিক তাই করেছিল, সাম্প্রতিক তথাকথিত সম্প্রচারের সময়ে যা সুরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য নরমপন্থীরা করেছিলেন। বরং তখনকার নরমপন্থীরা যে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দাবি করেছিলেন, সে-জন্যে তাঁদের প্রশংসাই করতে হয়। এখন মাত্র অল্প কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দি মুক্তি পেয়েছেন, তখন সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করা এবং মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এখন সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে কংগ্রেসের যা করা দরকার তা হল, বিপ্লবাত্মক মনোভাব গড়ে তোলা। এখন কংগ্রেস একটি বিবর্তনবাদী সংগঠন। তাকে পুরোপুরি বিপ্লববাদী সংগঠন হতে হবে। যখন সমগ্র শরীর বিষে জর্জরিত, শুধু কয়েকটি অঙ্গে ওষুধ প্রয়োগ করলে কোনও লাভ হবে না।

অন্ধ অহিংসা-পূজা ত্যাগ করতে হবে, বিশ্বাস বদলাতে হবে। সম্ভবপর সমস্ত পথে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে, সে অহিংসাই হোক আর হিংসাই হোক। অহিংসার বাতাবরণ শুধুমাত্র ভারতীয় পুরুষদের মেয়েলি পুরুষে পরিণত করছে। বর্তমান পৃথিবীতে কোনও জাতিরই অহিংসার কথা চিন্তা করা উচিত নয়, যদি তাকে জগতে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসাবে বাঁচতে হয়। আমাদের সমস্যা হল, দীর্ঘদিন আমাদের কানে পরমার্থের মন্ত্র পড়ানো হয়েছে। ওই ধারণা সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। পরলোকের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আমাদের প্রথমে ভাবতে হবে ইহলোকের কথা। বিবেকানন্দ তাই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। প্রথমে দরিদ্র নারায়ণকে অন্নবস্ত্র ও আশ্রয় দিতে হবে। তারপরে স্বর্গের কথা। মুসলিমরা বলে, "পীর, আমির এ ফকির। যদি ফকির হতে না পারো, আমির হও, জীবন উপভোগ করো। যদি আমির না হতে পারো পীর হও, অর্থাৎ একটি কাফেরকে হত্যা করো, তা হলে লোকে তোমার কবরকে কিংবা পরলোকে তোমাকে দেবতা বলে পুজো করবে।" গীতাও সেই কথাই বলে, আত্মবলি দাও, যাতে ভবিষ্যতের মানুষ সুখভোগ করতে পারে।

কংগ্রেসের উচিত শুধু একটি লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা, তা হল সামরিক প্রস্তুতি। এখনও জোর যার মুলুক তার। এই কথাটি মনে রাখতে হবে। ধর্মের কথা বলে নিজেদের ভুলিয়ে রাখলে চলবে না। কংগ্রেসকে প্রথমে সামরিক বাহিনীর ওপর দখল কায়েম করতে হবে, তার সমস্ত শাখার দখল। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য আমাদের কোনওদিন স্বাধীনতা এনে দেবে না। প্রকৃত প্রয়োজন শক্তি। এই একটি লক্ষ্যের ওপর তোমাদের শক্তি একীভূত করতে হবে। আমি মনে করি, ডা. মুঞ্জ সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করে কংগ্রেসের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করেছেন। ভারতীয়দের সর্বাগ্রে সামরিক বাহিনীর ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে হবে। তাদের অস্ত্র ধারণের অধিকার লাভ করতে হবে।

তার পরেই প্রয়োজন হিন্দু ঐক্য। মুসলিমরাও হিন্দু, যেহেতু তারা ভারতে জন্মেছে, যেহেতু তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তুরস্ক, আফগানিস্তান, পারস্য প্রভৃতি দেশের মুসলিমদের থেকে আলাদা, হিন্দুধর্ম এত উদার যে সে ইসলামকেও নিজের মধ্যে স্থান দিতে পারে। যেমন অতীতে করেছে। সব ভারতীয়ই হিন্দু, অন্য ধর্মে বিশ্বাসী হলেও। যেমন সব জাপানিই জাপানি, তারা বুদ্ধ, ক্রিশ্চান হলেও।

কংগ্রেসের উচিত প্যান-এশিয়া আন্দোলনকে সমর্থন করা। চিন-জাপান যুদ্ধের পিছনে জাপানের উদ্দেশ্য কী না বুঝে জাপানকে নিন্দা করা কংগ্রেসের অনুচিত। জাপান ভারতের এবং অন্যান্য এশীয় দেশের বন্ধু। তার প্রথম লক্ষ্য এশিয়ায় ব্রিটিশ প্রভাব ধ্বংস করা। চিনে সে সেই কাজ আরম্ভ করেছে।

কংগ্রেসের একটি বিশ্বরাজনীতির বোধ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করতে হবে এবং ভারতের স্বার্থে তাকে ব্যবহার করতে হবে। ব্রিটেনের শত্রুদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত। তাই হওয়া উচিত আমাদের বিদেশ নীতি। বাস্তব রাজনীতির মধ্যে ভাবালুতার কোনও স্থান থাকা উচিত নয়। স্বার্থই সর্বদা তার ভিত্তি হবে। জাপান এখন ব্রিটেন রাশিয়া ও আমেরিকার চক্ষুশূল। তার কারণ অতি সহজেই বোঝা যায়। যেমন করে হোক তারা জাপানকে দমিয়ে রাখতে চায়। জাপানের পতন হলে, এশিয়ার নবজন্ম ও এশিয়ার বন্ধনমুক্তির আশা তিরোহিত হবে। জাপান-বিরোধী আন্দোলন করে কংগ্রেস মহা ভুল করেছে। আমাদের মনে রাখা উচিত, একটা সময় আসতে পারে যখন ইংল্যান্ড জাপানের সঙ্গে করমর্দন করবে, এবং জাপানের বিপদের সময়ে ভারতের জাপান-বিরোধী কার্যকলাপের দিকে আঙুল দেখিয়ে ভারতকে নিয়ন্ত্রিত করবে। এখন ভারতীয়দের পক্ষে সবচেয়ে ভাল নীতি জাপানকে সমর্থন করা এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিশ্ববাহিনীতিতে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করে নেওয়া, এবং ব্রিটেনের কাছ থেকে যতটা সম্ভব সুবিধা আদায় করে নেওয়া।

পরাধীন দেশের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে একনায়কতন্ত্র একান্ত প্রয়োজন। যেমন যুদ্ধের সময়ে, তেমনি এখন স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে, একনায়কতন্ত্র ততখানিই অপরিহার্য। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে কিছু পরিমাণে একনায়কতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছিল, সেই কারণেই সে-আন্দোলন অত সফল হয়েছিল।

শান্তির সময়ে গণতন্ত্র কার্যকরী। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে যদি গণতন্ত্র মেনে চলা হয়, দেশের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আমরা জীবন উপভোগ করতেও জানি না, জীবন উৎসর্গ করতেও জানি না। সেইটাই হয়েছে মুশকিল। এ বিষয়ে আমাদের জাপানিদের অনুসরণ করা উচিত, বর্তমানে দেশের জন্যে সানন্দে তারা হাজারে হাজারে প্রাণ দিচ্ছে। এই মানসিকতা আমাদের জানা চাই। আমাদের জানতে হবে, কেমন করে মরতে হয়। তখন ভারতের স্বাধীনতার সমস্যা আপনি মিটে যাবে।

আপনার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। লোকের নিন্দায় কান না দিয়ে, বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যান। সঠিক পথে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে চলুন। আপনি এবং ভারত সাফল্য পাবেন।

আশীর্বাদ সহকারে

আপনার

রাসবিহারী বোস

পু. আপনার বই জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়ে একটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

আমি আবার জোর দিয়ে বলি, 'স্থল, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ হাতে নিন, অন্যান্য বিভাগে ব্রিটেনকে ভারত শাসন করতে দিন।'

বাসন্তীদেবীকে [মূল বাংলা]

৩৮-২ এলগিন রোড
কলিকাতা

ওয়ার্ধা
৬.২.৩৮

শ্রীচরণেষু

মা!

আমি আজ কলিকাতায় রওনা হচ্ছি। সেখান থেকে ১১ই তারিখে রওনা হব। হরিপুরায় ১৩ই তারিখে পৌঁছব।

আপনি কি হরিপুরায় যাবেন না? গেলে আমি খুব সুখী হব। তার কারণ আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন। যাঁর চরণে বসে রাজনীতি শিক্ষা করেছি— আজ তিনি নেই। থাকলে কত আনন্দ করতেন। বেশী কথা লেখার প্রয়োজন নেই— আপনি বুঝবেন। শীঘ্র উত্তর দিবেন (যদি কলিকাতার বাহিরে থাকেন) কারণ আমি ১১ই রওনা হব।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন—
ইতি
আপনার সেবক
সুভাষ

পুনঃ
একটা কথা ভুলবেন না—
"আত্মবৎ মান্যতে জগৎ"
সুভাষ

এইচ. ভি. কামাথকে

টেলিফোন: পার্ক ৬৭৯

৩৮-২, এলগিন রোড
কলিকাতা

প্রিয় মি. কামাথ

আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হলাম। আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি টেলিফোন করতাম, কিন্তু আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন সেটা আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম না। যতদিন আপনি স্বাধীন মানুষ না হন তত দিন আমি অপেক্ষা করব।

আপনি চাকরি থেকে বেরিয়ে আসার পর আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। তখন আমি কোথায় থাকব আমি জানি না। হয়তো তখন আমি সফরে থাকব। কিন্তু

ওপরের ঠিকানায় পত্র দিলে আমি পাব। এই চিঠি আমি হরিপুরার পথে ট্রেনে বসে লিখছি।

সর্বান্তকরণে আমি আপনাকে কংগ্রেসে স্বাগত জানাব। ইতিমধ্যে আমি আপনাকে শুধু বলব, সরকারের যাতে লোকসান হবে, তাতে দেশের লাভ হবে।

দেশের সেবায় আপনার সহযোগী
সুভাষচন্দ্র বোস

নাগপুর মেল
১২. ২.৩৮

উইল রিখটার-এর পত্র

৪ মার্চ ১৯৩৮

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বোস, Esq

১ উডবার্ন-পার্ক
এলগিন রোড পো. অ.
কলিকাতা

প্রিয় মি. বোস

আমার অন্য চিঠিটি ইন্ডিয়ান ইনসিওরেন্স-এ উদ্দীষ্ট সহযোগিতা সম্পর্কে। আমি অন্য কয়েকটি বিষয়ে আপনাকে চিঠি দিচ্ছি।

সর্বপ্রথমে, আমি বলতে চাই, (যদিও একটু দেরি হয়ে গিয়েছে) আমার স্ত্রী এবং আমি আমাদের সফরে এবং আপনার সঙ্গে ও আপনার বন্ধুদের সঙ্গে যে কয়েকটি দিন কাটিয়েছি, তাতে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমরা আবার আপনাদের সহৃদয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আশা করছি আপনাকে কিংবা আপনার চিকিৎসাকে আমরা বেশি বিঘ্নিত করিনি।

দুঃখের বিষয়, আমাদের এখানে কন্টিনেন্টাল কাগজে ভারতীয় রাজনীতির বিশেষ করে হরিপুরার অধিবেশনের কথা খুব কম আছে।

আপনি বলেছেন আপনি বিমা বিষয়ে কিছু বই পড়তে চান। সাধারণত সে সব বইয়ে বিমার বিশেষ একটি শাখার কথাই থাকে এবং কোনও বইয়ে বিভিন্ন শাখার কথা আছে, আমি খুঁজে পাইনি। অতএব আমি এই সঙ্গে পিটম্যান প্রকাশিত বিমা সংক্রান্ত বইয়ের একটি তালিকা আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। তার থেকে আপনি হয়তো বেছে নিতে পারবেন।

বিড়লার যে কোম্পানির কথা আমি বলছিলাম সেটি হল রুবি, যার সঙ্গে আরেকটি ইতালীয় কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বলে শোনা যায়।

আমরা কন্টিনেন্ট-এর (ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের) ব্যাঙ্ক ব্যবসার কথা আলোচনা করেছিলাম। আমি বন্ধুদের সঙ্গে তা নিয়ে কথা বলেছি। তাঁরা আমাকে বলেছেন, দুটি আগ্রহী ব্যাঙ্কের একটি দিয়ে হয়তো কাজ হবে। সে দুটি হল সুইজারিশ ক্রেডিট্যান্টসটল্ট এবং

সুইজারিশ ব্যাঙ্কভেরেইন, এবং দুটিই জুরিখে। আমি যেহেতু প্রথমটির জেনারেল ম্যানেজারদের একজনকে চিনি, এবং দুটির সঙ্গেই আমার গ্রুপের ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে, আপনি যদি চান, আপনার পক্ষ থেকে আমি তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি।

যাই হোক, আমার হেড কোয়ার্টার্স-এ আমাদের আলোচনার কথা জানানোর পর আমি বলতে চাই, আমরা সকলেই যখনই সম্ভব যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করব, এবং আমাদের আশা, আমরা একটি পরিকল্পনা পেশ করতে পারব যাতে আমাদের এবং আপনাদের প্রয়োজন মিটবে।

ইতিমধ্যে আমি জুরিখ, ভিয়েনা এবং বার্লিন হয়ে এসেছি। দুঃখের বিষয় নববর্ষের পরে এখানে আমার স্ত্রীর খুব জোর ঠান্ডা লেগে গেছে। এখনও তাঁর জ্বর সম্পূর্ণ সারেনি। সেই জন্যেই ভিয়েনায় ফিরে আসার পরেও তিনি এখনও মিস ফিউলোপ মিলার এবং মিস স্কনেল্ড-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। এবং আমার মনে হয় এত দিনে তিনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মাত্র কয়েকটি ফোটো পাঠিয়েছেন। ভিয়েনায় গিয়ে, আমি যেমন কথা দিয়েছিলাম, আপনাকেও তার কয়েকটি পাঠিয়ে দেব।

শুভেচ্ছা সহকারে

আপনার
উইল রিখটার

শ্রীমতী ধর্মবীরকে

৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা
২২. ৩.৩৮

প্রিয় দিদি,

দীর্ঘদিন আপনাকে চিঠি দিতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত। তবে আমার বিশ্বাস সবাই এখন আমাকে অনুকম্পা করছে। আমার দিন ও রাত্রি যে-ভাবে ঝড়ের মতো কেটে যাচ্ছে তার জন্যে। এই চিঠি আমি লিখছি প্রচণ্ড তাড়ার মধ্যে, তবু আমি আশা করি আমি যা যা ভাবছি সে-সব স্পষ্ট ভাবে এবং পুরোপুরি ব্যক্ত করতে পারব।

গতকাল সীতা আমাকে মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেখানে আমার ডা. সেনের সঙ্গে দেখা হয়। ডা. সেনের সঙ্গে প্রথম আমার পরিচয় হয় ভিয়েনায়। এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল। মানুষ হিসাবে এবং চিকিৎসক হিসাবেও তাঁর সম্পর্কে আমার অতি উচ্চ ধারণা হয়েছিল। সে-ধারণা আমার বদলায়নি। এবারে সংক্ষেপে বলি। সীতা আর সন্তোষ বিয়ে করতে চেয়েছিল। তারা পরস্পরকে দীর্ঘদিন চেনে, এবং ক্রমে তাদের অন্তরঙ্গতা ঘনীভূত হয়েছে। তার পরিণতিতে তারা এখন মনে করছে, তাদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত। সীতার বিচারবুদ্ধি এবং চরিত্র সম্পর্কে আমার প্রভূত শ্রদ্ধা। সে-কথা আমি আগেই আপনাকে লিখেছি। তাদের সঙ্কল্প সুবিবেচনা প্রসূত এবং আমার মতে সঠিক। আমি তাদের যত দূর জানি, তাতে আমার মনে হয়, বিবাহ করলে তারা সুখী হবে। ডাক্তার এবং

আপনি যদি তাদের প্রস্তাবে সম্মতি দেন এবং তাদের আশীর্বাদ করেন, আমি তাদের উভয়ের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিত হব।

আমার পত্র খুবই তাৎক্ষণিক ও সংক্ষিপ্ত হল, যা বলবার খুলে বলাও হল না। তার একমাত্র কারণ দু'জনের সঙ্গে কাজের মাঝখানে কয়েকটি মিনিটে আমাকে চিঠি লিখতে হল, যা লিখলাম ভাল করে ভেবেই লিখলাম। বস্তুত ভিয়েনায় সন্তোষের টেবিলে যেদিন প্রথম আমি সীতার ফোটো দেখলাম, এ রকম কিছু যে ঘটবে আমি তখনই আন্দাজ করেছিলাম, আমার বরাবরই মনে হয়েছে, এই বিবাহের প্রস্তাব অতি উত্তম এবং বাঞ্ছনীয়।

আপনার স্বাস্থ্য এখন কেমন আছে? আশা করি ডাক্তার এবং লীলা ভাল আছেন। আমিও মোটামুটি ভালই আছি। যদিও কাজের চাপ বেশি।

আপনার
সুভাষ

সীতা ধর্মবীরকে

৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা
২২. ৩. ৩৮

প্রিয় সীতা,

তোমার চিঠি ঠিক আছে। এই সঙ্গে আমার চিঠি পাঠালাম। একবার দেখে নিয়ে, প্রয়োজন হলে সংশোধন করে, যদি মনে হয় ঠিক আছে, তোমার চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিও।

দীর্ঘ পত্র লিখবার আমার সময় নেই, সে জন্যে আমি দুঃখিত। তবে আমার মনে হয়, এতেই কাজ চলে যাবে। লোকে বলে না, 'brevity is the soul of wit?'

জবাবের জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকব। খবর পেলে আমাকে জানিও।

ভালবাসা নিও

তোমার
সুভাষ

মিসেস নাওমি ভেটারকে

১৯৩৮-এর পদাধিকারীগণ
সভাপতি
সুভাষচন্দ্র বোস
কোষাধ্যক্ষ
যমুনালাল বাজাজ
সাধারণ সম্পাদক
জি. বি. কৃপালনি

টেলিফোন: ৩৪১
টেলিগ্রাম: 'কংগ্রেস'
Ref: এলাহাবাদ

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
স্বরাজ ভবন, এলাহাবাদ

অস্থায়ী ঠিকানা

৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা
২৬.৩.৩৮

প্রিয় মিসেস ভেটার,

অনেক দিন আপনাকে চিঠি দিইনি, সেজন্য আমি দুঃখিত।

আমার এক বন্ধু মি. এম. ঘোষ সস্ত্রীক ইউরোপ সফরে যাচ্ছেন। তিনি ভিয়েনায় গিয়ে সেখানকার জীবনযাত্রা দেখতে চান। মি. ঘোষ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমনমোহন ঘোষের নাতি, আপনি যদি শ্রী ও শ্রীমতী ঘোষকে শহরটি ঘুরিয়ে দেখাতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ থাকব। মি. ফ্যালটিস যদি এখন ভিয়েনায় থাকেন, দয়া করে তাঁর সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দেবেন, কারণ শ্রীঘোষ ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপন করতে চান। ভিয়েনায় এখনকার পরিস্থিতিতে আমি বিস্মিত। খবরের কাগজগুলো অস্ট্রিয়ার খবরাখবরে এবং ভিয়েনার ছবিতে ভর্তি। আশা করি আপনারা ভাল আছেন। ড. ভেটার এবং আপনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

মিসেস এন. সি. ভেটার

মিসেস নাওমি ভেটারকে

১৯৩৮-এর পধাধিকারীগণ
সভাপতি:
সুভাষচন্দ্র বোস
কোষাধ্যক্ষ:
যমুনালাল বাজাজ
সাধারণ সম্পাদক
জে. বি. কৃপালনি

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
স্বরাজ ভবন, এলাহাবাদ

টেলিফোন: ৩৪১
টেলিগ্রাম: 'কংগ্রেস'
Ref:

৩৮/২ এলগিন রোড
(অথবা ১ উডবার্ন পার্ক)
৯.৪.৩৮

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আমি অতিশয় আনন্দ সহকারে আমার বন্ধু মি. পি. বি. শীলের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তিনি লন্ডন যাওয়ার পথে ভিয়েনায় যাচ্ছেন। আমি তাঁকে ডা. ভেটার ও আপনার সঙ্গে দেখা করে আমার শুভেচ্ছা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে বলেছি। তাঁর স্বল্পকাল ভিয়েনায় কাটাবার সময়ে আপনি কি সেখানকার দু-একটি জায়গা দয়া করে ওঁকে ঘুরিয়ে দেখাবেন?

অনেক দিন আপনাদের চিঠি দিতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমি আপনাদের ভুলে গেছি।

গভীর শ্রদ্ধা সহকারে

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

পুঃ আমি ভিয়েনায় আরও কিছু দিন থাকতে পারলাম না বলে দুঃখিত; আশা করি আবার আপনাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে পারব।

পি. বি. শীল
হোটেল মার্টিনেজ
কানস

সন্তোষ সেনকে (তারবার্তা)

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ
২০ মে ১৯৩৮
টেলিগ্রাম
বোম্বাই ২০ ২১ সন্তোষ সেন
আটচল্লিশ হনুমান রোড
নয়া দিল্লি

বিবাহ উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন। উপস্থিত থাকার অক্ষমতায় অত্যন্ত দুঃখিত। চিঠি পাঠাচ্ছি।

—সুভাষ বোস

সীতা ধর্মবীরকে

পর্ণকুটী
যারবেদা হিল
পুনা ২১.৫.৩৮

প্রিয় সীতা,

তোমাদের বিবাহ উপলক্ষে লাহোরে যেতে পারব না বলে আমি অতিশয় দুঃখিত। সেই কথা জানিয়ে আমি বোম্বাই থেকে একটি চিঠি দিয়েছি। আমি ২৩ কিংবা ২৪ তারিখে বোম্বাই ফিরব। আশা করি তুমি আমার অবস্থাটা বুঝে হতাশ হবে না। সেই দিন তোমাদের কথাই আমার মনে সারাক্ষণ থাকবে এবং ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করব যেন তোমাদের দু'জনের ওপর তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বর্ষণ করেন এবং মাতৃভূমির সেবার জন্যে তোমাদের দীর্ঘ ও সানন্দ জীবন দান করেন।

এই চিঠিটি সন্তোষকে দেখাবে। আমি দিল্লিতে চিঠি দিচ্ছি, কিন্তু সে-চিঠি তার হাতে বোধহয় পৌঁছবে না।

আমি তোমাকে একটি ছোট পার্সেল পাঠিয়েছি, যদি গ্রহণ কর আমি খুশি হব।

ভালবাসা নিও।

স্নেহ সহকারে
সুভাষ

অতুলচন্দ্র কুমারকে

৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা
৩.৬.৩৮

প্রিয় অতুলবাবু,

অনেক বছর আমি মালদহ যাইনি। শেষ যেবার যাবার চেষ্টা করেছিলাম, সরকার থেকে বাধা এসেছিল। সেই কারণে আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেটি স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু নানা কারণে ১১ কিংবা ১২ তারিখে আমি যেতে পারছি না। যদি আমার সুবিধা অনুযায়ী তারিখ ঠিক করা হয়, আমি খুব খুশি হয়ে মালদহ যাব, পরে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে তারিখ ঠিক করবেন।

মালদহ জেলার সমস্ত সহযোগী কর্মীদের আমার সস্নেহ সম্ভাষণ জানাবেন।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

শ্রীযুত অতুলচন্দ্র কুমার
এম. এল. এ.

সীতা ধর্মবীরকে

২৩.৬.৩৮
(ওয়ার্ধার পথে)

প্রিয় সীতা,

লাহোর থেকে পাঠানো তোমার ২৩ মে-র চিঠির জবাব এখনও দিইনি বলে আমি দুঃখিত। তোমরা বোধহয় এখন দিল্লিতে। বলা বাহুল্য লাহোরে যেতে না পারায় আমি অত্যন্ত হতাশ হয়েছিলাম। দিল্লিতে কোনও সময়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব আশা করি।

সন্তোষকে কয়েকটি লাইন লিখে এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

কলকাতায় সন্তোষের পরিচিত এবং আত্মীয় কয়েকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁদের কয়েকজন তোমাদের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন।

আশা করি তোমরা ঠিকঠাক আছ এবং সব দিক থেকে তোমাদের মিলমিশ হয়েছে।

ভালবাসা।

স্নেহ সহকারে
সুভাষ

পুঃ আমি ভাল আছি।

বি. সি. রায়ের পত্র

৩৬, ওয়েলিংটন স্ট্রিট
কলিকাতা
১৮ জুলাই ১৯৩৮

প্রিয় সুভাষ,

বোম্বাই থেকে যাত্রার সময়ে ট্রেন থেকে লেখা তোমার চিঠি। তুমি আমায় লিখেছিলে পুরসভায় পদ খালি হলেই তুমি আমাকে একটি মনোনয়ন পাঠাবে। মৌলানা আজাদ নিশ্চয় তোমায় জানিয়েছেন যে ডা. কে. এস. রায় আমাকে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোমার মনোনয়নটি পাঠিয়ে দাও, যাতে আমি ডা. কে. এস. রায়ের পতদ্যাগের সঙ্গে সেটি পুরসভা এবং কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সামনে পেশ করতে পারি। এই প্রসঙ্গে আমি একটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। তোমার একটি মনোনয়নপত্র হাতে না নিয়ে আমি পুরসভা কিংবা কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সামনে যেতে চাই না। আমাকে মনোনয়ন দিতে যদি তোমার কোনও অসুবিধা থাকে, আমাকে জানাও, তাহলে ডা. কে. এস. রায়ের পদত্যাগপত্র, আমার কাছে যেটি তিনি রেখে গেছেন, আমি ফেরত দিয়ে দেব।

ফিরতি ডাকে জবাব পেলে খুশি হব।

তোমার
বি. সি. রায়

বিশ্বনাথ দাসকে

১৯৩৮-এর পদাধিকারীগণ
সভাপতি:
সুভাষচন্দ্র বোস
কোষাধ্যক্ষ:
যমুনালাল বাজাজ
সাধারণ সম্পাদক:
জে. বি. কৃপালনি

সভাপতির কলিকাতার ঠিকানা:
৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা
টেলিফোন: পার্ক ৫৯
টেলিগ্রাম : 'সুভাষবোস'

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
স্বরাজ ভবন, এলাহাবাদ
টেলিফোন: ৩৪১
টেলিগ্রাম: 'কংগ্রেস'

১৫ আগস্ট ১৯৩৮

প্রিয় বিশ্বনাথবাবু,

এই সঙ্গে রেজাউল করিমের একখানি বই পাঠালাম। দেশে এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিস্থিতিতে এই বই খুব উপযোগী হতে পারে। লেখক আমার বিশেষ পরিচিত। ইনি একজন

জাতীয়তাবাদী এবং আমার বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করা সম্ভব হলে এই বই সাম্প্রয়াদিকতা প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

আপনার প্রদেশে এই বইখানি ব্যবহার করা যদি সম্ভব হয়, আমি খুব খুশি হব। সেই সঙ্গে লেখকেরও তাতে সাহায্য হবে এবং তিনি তাঁর কাজে উৎসাহিত হবেন।

শুভেচ্ছা সহকারে

আপনার
সুভাষ সি. বোস

মাননীয় শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাস
ওড়িষার প্রধানমন্ত্রী

অপর্ণা দেবীর পত্র [মূল বাংলা]

· 2 Beltala Road
২৩.৮.৩৮

সুভাষবাবু

আমাদের সঙ্কলিত একখানি কীর্ত্তনপদাবলী আপনাকে পাঠালাম।

আশাকরি ভাল আছেন।

ইতি
অপর্ণাদি

বি. সি. রায়কে

২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

প্রিয় ডা. রায়,

আমি এই সঙ্গে একটি বিবৃতির অনুলিপি পাঠাচ্ছি। বিবৃতিটি আমি সংবাদপত্রে দিতে চাই, আশা করি আমি প্রকৃত ঘটনা সঠিক ভাবে বিবৃত করেছি। যদি আপনার অন্য রকম মনে হয়, আমাকে দয়া করে জানাবেন।

আপনার
সুভাষ সি বোস

কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তায় আমি অবগত হলাম শ্রীযুত প্রভুদয়াল হিমৎসিঙ্কার বঙ্গীয় বিধান পরিষদ (Bengal Legislative Assembly) থেকে পদত্যাগের ফলে সৃষ্ট খালি আসনটি সম্প্রতি যেভাবে পূর্ণ করা হয়েছে তা নিয়ে কিছু ভুল ধারণার উদ্ভব হয়েছে। একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে ওই আসনটির জন্যে ডা. বি. সি. রায়কে মনোনয়ন দেওয়া যেত। প্রকৃত ঘটনা

এইরূপ: যে-সময়ে আমি তখনও অন্তরীণ ছিলাম এবং ডা. বি. সি. রায় বিধান পরিষদের নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন, তখন বড়বাজার আসনের দু'জন প্রার্থী শ্রীযুত প্রভুদয়াল হিমৎসিঙ্কা ও শ্রীযুত ঈশ্বরদাস জালানের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হয়েছিল শ্রীযুত প্রভুদয়ালবাবু দু-এক বছর সদস্য থাকবেন, তারপর তিনি পদত্যাগ করবেন, এবং তাঁর জায়গায় শ্রীযুত ঈশ্বরদাস জালান মনোনীত হবেন। কয়েক মাস আগে যখন প্রভুদয়ালবাবু পতদ্যাগের কথা ভাবছিলেন, শ্রীযুত জালান ডা. বি. সি. রায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি শ্রীযুত জালানের প্রার্থী হওয়া অনুমোদন করেন কিনা। ডা. বি. সি. রায় শ্রীযুত জালানকে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বোসের সঙ্গে দেখা করতে বলেন, কেননা তিনি তখন শ্রীযুত জালানকে সাহায্য করতে অক্ষম ছিলেন। প্রভুদয়ালবাবু তাঁর আসন থেকে পদত্যাগ করেন এবং একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দেন যে শ্রীযুত জালানের অনুকূলে তিনি পদত্যাগ করছেন। যখন বিষয়টি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির সামনে আসে, কমিটি মৌলানা আজাদ ও আমাকে নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করে, একজন উপযুক্ত প্রার্থী মনোনীত করার জন্যে। তখন আমি ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী ছিলাম। যখন খবর ছড়িয়ে পড়ল যে শ্রীযুত জালানকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হতে পারে, বড়বাজারের কোনও কোনও মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি হল। বড়বাজার থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি মৌলানার কাছে গেলেন এবং তাঁদের সঙ্গে পরিস্থিতিটি আলোচনা করে তিনি আমায় টেলিফোন করে বললেন, সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে, তাঁর মনে হচ্ছে শ্রীযুত জালানের দাবিটা অগ্রাহ্য করা উচিত নয়, আমি সে বিষয়ে একমত হলাম এবং তার ফলে শ্রীযুত জালান কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হলেন। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি, অনেক দিন আগে আমি ডা. রায়কে বলেছিলাম, তিনি অ্যাসেমব্লিতে কিংবা করপোরেশনে আসুন। আমার সেই কথা অনুযায়ী, কলিকাতা করপোরেশনের প্রাক্তন অলডারম্যান ডা. কে. এস. রায়কে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করলাম এবং তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে সেই শূন্য স্থানে আমরা ডা. রায়কে করপোরেশনে আনতে সক্ষম হলাম। যে কোনও সময়ে ডা. রায় যদি অ্যাসেমব্লিতে আসতে চান, এবং তাঁর জন্যে একটি আসন খালি করে দিতে কোনও সদস্যেকে আমরা রাজি করতে পারি, তাঁকে সদস্য করে নেওয়া যাবে। কিন্তু ওপরে বর্ণিত পরিস্থিতিতে বড়বাজার নির্বাচনকেন্দ্র থেকে ডা. রায়কে বিধান পরিষদে নির্বাচিত করা সম্ভব ছিল না।

অমিতা পুরকায়স্থ (গুহ)-কে [মূল বাংলা]

ওয়ার্দ্ধার পথে
৩।৯।৩৮

ভগিনীসমানাসু

আপনার ২ খানি চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি— কিন্তু উত্তর দেওয়া হয়নি। অপরাধ আমার— ক্ষমা করবেন। কাজের চাপে চিঠির উত্তর দিতে বিলম্ব হয়— যদিও চিঠি পেতে ইচ্ছা করে। এখন চলেছি ওয়ার্দ্ধার পথে— তাই ট্রেনে একটু অবসর হয়েছে। ৬ই তারিখে কলিকাতায় ফিরব, তার পর দিনই আবার রওনা হব— মান্দ্রাজের দিকে।

আপনার চিঠি পেয়ে আমি বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। আপনি কাজ করতে চান এবং জিজ্ঞাসা

করেছেন কি ভাবে এবং কোন্ পথে দেশের সেবা করতে পারেন। কয়জন নারী কর্ম্মী এইরকম প্রশ্ন করে থাকেন? আমাদের দেশে নারীকর্ম্মীর বড় অভাব। সে অভাব আপনি কতকটা পূরণ করতে পারবেন সন্দেহ নেই। অধিকাংশ কর্ম্মী কিছু কাল কাজ ক'রে, তার পর বিদায় গ্রহণ করেন এবং অন্য কাজে মন দেন। নারী কর্ম্মীদের সম্বন্ধে এই কথা বেশী খাটে। সামাজিক অথবা পারিবারিক কারণে নারীকর্ম্মীরা বেশী দিন কাজ করতে পারেন না। তার পর ব্যক্তিগত কারণ তো আছেই। উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব— বিবাহ এবং সংসারের কাজ— এসব কারণ ও আছে।

আমার প্রথম বক্তব্য এই— সেবা ব্রত গ্রহণ করুন। মনে ২ এই সঙ্কল্প করুন যে দেশের সেবাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করবেন। পারবেন করতে? না পারার কোনও কারণ দেখি না।

তার পর— কাজ। আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন কি কাজ করবেন। উত্তরও নিজে দিয়েছেন। কংগ্রেসের কাজ করতে হবে। অবশ্য, অবশ্য! কারণ দেশের স্বাধীনতা না ফিরে পেলে, কোনও মহৎ কাজ— বড় কাজ— করা সম্ভব হবে না। স্বাধীনতা অর্জ্জন করা— শুধু পুরুষের কাজ নয়— নারীর কাজও বটে। সমাজের অর্দ্ধেক নারী— তাই "না জাগিলে ভারত ললনা। ভারত কভু জাগিবে না।" নারীসমাজকে জাগাতে পারে কেবল নারীকর্ম্মীরা। তাই আপনাদের কাজে নামতে হবে। বাধা বিঘ্ন মানলে চলবে না। সব কাজের পথে বাধা আছে। সে বাধা মেনে নিলে মানুষ কোনও মহৎ কাজ কখনও করতে পারবে না। মেয়েদের মধ্যে কয়জন উচ্চশিক্ষা পান অথবা পেতে পারেন? উচ্চশিক্ষা পেয়েও কি আপনারা দেশের কাজ করবেন না? তা হ'লে কাদের উপর আমরা ভরসা করব?

"নারীকল্যাণ সমিতি" করেছেন— খুব ভাল কথা। অশিক্ষিতা মেয়েদের শিক্ষা দিবার চেষ্টা করুন। সঙ্গে ২ অর্থকরী শিক্ষা দিন— যার দ্বারা গরীব মেয়েরা দু পয়সা উপায় করতে পারবে। তার পর ঘরে ২ গিয়ে মেয়েদের কংগ্রেসের মেম্বার করুন। তার পর ছোট ২ মেয়েদের ব্যায়াম শিক্ষা দিন। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা— এসব তাদেরও শিখতে হবে। এদেশে দুর্ব্বৃত্তের দ্বারা নারী হরণ, নারী নির্য্যাতন যা হয়— পৃথিবীর কোথাও তেমন হয় না। এতদিন নারী ছিলেন অবলা— তাকে করতে হবে সবলা। এও আপনাদের কাজ। মেয়েদের শক্তিশালিনী ও সাহসী করে তুলতে হবে। তাহা হলেই তাঁরা বীর প্রসবিনী হবেন।

অনেক কথা বলে ফেল্লাম। এখন থামব। মধ্যে ২ পত্র দিয়ে সুখী করবেন। আমি হয় তো নিময়মত পত্র দিতে পারব না। সে ত্রুটি ক্ষমা করবেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

ইতি

নিঃ

(স্বাঃ) শ্রীসুভাষচন্দ্রবসু

বি. সি. রায়ের পত্র

৩৬, ওয়েলিংটন স্কোয়ার
কলিকাতা
১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

প্রিয় সুভাষ,

তোমার পাঠানো খসড়াটি আমি কয়েকটি সংশোধন সহ ফেরত পাঠাচ্ছি, সংশোধনগুলি এইরূপ :

(১) ঈশ্বরদাস জালান এবং প্রভুদয়ালের মধ্যে যে চুক্তিটি হয়েছিল, সেটি আমি অনুমোদন করেছিলাম, এ-কথা ঠিক নয়, তাঁরা সেই ব্যবস্থা করে আমাকে জানিয়েছিলেন।

(২) প্রভুদয়াল এবং তাঁর মধ্যেকার চুক্তিটি এখনও কার্যকর আছে কি না, জালান সে-কথা আমায় জিজ্ঞাসা করেননি। আমাকে তিনি যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তা হল, তাঁর প্রার্থী হওয়া আমি অনুমোদন করি কি না, এবং আমি উত্তরে বলেছিলাম, তাঁর শ্রীযুত শরৎ বোসের সঙ্গে কথা বলা উচিত, যিনি কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা।

(৩) আমি বিধান পরিষদে কিংবা করপোরেশনে যেতে চাইলে তাতে তোমার কোনও আপত্তি থাকবে না বলে তুমি আমাকে জানিয়েছিলে, এ বক্তব্যও ঠিক নয়। ব্যাপারটা তা নয়। আমার কথা বলতে গেলে, কথাটা ছিল, ওই দুটির যে-কোনও একটিতে আমার যাওয়া যদি তুমি চাইতে, কংগ্রেসের জন্যে আমি সানন্দে কাজ করতাম।

তোমার এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে এমন কয়েকটি কথা আছে যার বিষয়ে আমার নিজের কিছু জানা নেই। যেমন, "বড়বাজারের কোনও কোনও মহলে কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল", "বড়বাজার থেকে মৌলানার কাছে একটি প্রতিনিধি দল গিয়েছিল," ইত্যাদি। আমি শুধু সেই অংশটি সংশোধন করেছি, যার সম্পর্কে আমার নিজের জানা আছে, এবং যেটি আমার মনে হয়েছে সঠিক বিবরণ নয়।

তোমার
বি. সি. রায়

সীতা সেনের প্রতি

প্রযত্নে এন. ডি. পারিখ
২৬ মেরিন ড্রাইভ
ফোর্ট, বোম্বাই
১০. ১০. ৩৮.
(টেলিগ্রাম. Care PENDANT Bombay)

প্রিয় সীতা,

প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও দিল্লি থেকে আসার আগে তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করতে না

পারায় আমি দুঃখিত। শেষ দিনে আমার শরীর ভাল লাগছিল না। অনেক কাজও ছিল। যেদিন সকালে চলে এলাম, আমি দেখা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার সময় ছিল না। মোটের ওপর, তোমাদের সঙ্গে যতটা দেখা-সাক্ষাৎ করবার আমার ইচ্ছা ছিল, ততটা করতে পারলাম না বলে হতাশ হয়েছি। কিন্তু তার জন্যে দায়ী আমি আর আমার কর্মসূচি। যাই হোক, আশাকরি পরের বার এ-রকম হবে না।

এবারে, এ যে ম্যালেরিয়া তাতে সন্দেহ নেই। কে জানে, কানপুরেও হয়তো ম্যালেরিয়াই ছিল। যাই হোক এবারে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইটকে কবজা করা গেছে।

১৫ কিংবা ১৬ তারিখ নাগাদ কলকাতা রওনা হব।

আমি আশাকরি এতদিনে দিল্লি ঠান্ডা হয়েছে। আমি যখন ওখানে ছিলাম, খুব গরম ছিল। গরম আমার আদৌ পছন্দ নয়।

বিজয়ার ভালবাসা ও সম্ভাষণ তোমাদের সকলকে।

স্নেহ সহকারে
সুভাষ সি. বোস

(অস্পষ্ট)-র প্রতি*

৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা
২১ অক্টোবর ১৯৩৮

যমুনালালজির পদত্যাগের বিষয়ে বোম্বাইয়ে এবং পুনরায় ওয়ার্ধাতে তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আমি বারে বারে তাঁকে বলেছি, নানাবিধ কারণে তাঁর পদত্যাগ আমি মেনে নিতে পারছি না। তা ছাড়া, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরাও, আমি যতদূর বুঝেছি, আমার সঙ্গে একমত। আমি মানতে পারছি না এইসব কারণে:

(১) যদিও আমি স্বীকার করি কিছুদিন তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ প্রয়োজন, সেই বিশ্রামের জন্যে তাঁর পদত্যাগ করার দরকার নেই। সদস্যেরা অসুস্থ হলে বিশ্রাম নিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা পদত্যাগ করেননি।

(২) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো আর কাউকে পাওয়া কঠিন।

(৩) আট মাস ইতিমধ্যেই কেটে গেছে, বাকি আছে মোটে চার মাস। তা হলে এই অবস্থায় পদত্যাগ করা কেন?

(৪) এই অবস্থায় পদত্যাগ করলে অনেক গুজবের এবং গল্পের সৃষ্টি হবে। তার মধ্যে কিছু কিছু ওয়ার্কিং কমিটিকে বিব্রত করতে পারে।

ওয়ার্ধাতে যমুনালালজি আমাকে বলেছিলেন যে নাগপুরের একটি পত্রিকায় ইতিমধ্যেই একটা খবর বেরিয়েছে যে তিনি ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করতে চলেছেন, কারণ মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসভা ঠিকমতো কাজ করছে না এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী পদে যমুনালালজিকে প্রয়োজন।

---

* যমুনালাল বাজাজ-এর কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত

আমি আগে থেকেই যা ভয় করেছিলাম, এই খবরে সেটাই সত্য প্রমাণিত হল। যমুনালালজিকে আমি আরও এ বিষয়ে অবহিত করেছিলাম যে, এই সমস্ত গুজব এবং গাল-গল্পের কারণে, কেন তিনি পদত্যাগ করেছেন সে-বিষয়ে একটি বিবৃতি জারি করতে ওয়ার্কিং কমিটি বাধ্য হবে। সেই বিবৃতিতে আমরা কী বলব? শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে তিনি অবসন্ন, এবং তাই তাঁর দীর্ঘ বিশ্রাম প্রয়োজন, এ-কথা বললে পুরো সত্যটি বলা হবে না। কৌতূহলী জনসাধারণ সঙ্গে সঙ্গে বলবে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ৫ মাস অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু পদত্যাগ করেননি।

ওয়ার্ধাতে আমাদের আলোচনার শেষে যমুনালালজি আমার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করলেন। আমি তাঁকে বললাম, যতদিন প্রয়োজন তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কিন্তু পদত্যাগের জন্যে পীড়াপীড়ি করে আমাদের বিব্রত করা তাঁর উচিত নয়। তাঁর মনে হল, তাঁর অন্তিম সিদ্ধান্ত আমাকে জানাবার আগে আপনার সঙ্গে তাঁর একবার কথা বলে নেওয়া দরকার। তাই আমি তাঁকে বললাম ওয়ার্ধাতে আপনার ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁকে আমি অনুরোধ করছি পদত্যাগ না করতে। আপনি যদি তাঁকে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর পদত্যাগের জন্যে জোর করার প্রয়োজন নেই তা হলে আমি সুখী হব।

প্রণাম নেবেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

এম. এন. রায়ের পত্র

২২ অক্টোবর ১৯৩৮

প্রিয় বন্ধু

গত সপ্তাহে আমি যখন লক্ষ্ণৌ-এ ছিলাম, শুনেছিলাম লালা শঙ্করলাল কোনও কাজে সেখানে আছেন এবং তোমার নির্দেশে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বৈঠক নিয়ে আমি ব্যস্ত ছিলাম, এবং তিনি সেখানে ছিলেন অল্পকাল। তাই আমাদের দেখা হল না। এখানে পৌঁছে আমি আজ তাঁর কাছ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি পত্র পেলাম। তাতে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে আমি যেন সেই পত্রের সঙ্গে প্রেরিত একটি খসড়া বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করি। সেটি "এ. আই. সি. সি এবং পি. সি. সি.-র সমস্ত সদস্যদের মধ্যে প্রচার করা হবে। তার উদ্দেশ্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে একটি বামপন্থী গোষ্ঠী গঠন করা।" তিনি আরও লিখেছেন, "শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বোসের পরামর্শক্রমে সেই তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।" বিজ্ঞপ্তিটিতে যাঁরা স্বাক্ষর করবেন বলে আশা করা যায় তাঁদের নামের একটি তালিকা সেই সঙ্গে পাঠানো হয়েছে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই উদ্যোগকে আমি সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাচ্ছি, এবং অতীতে বারে বারে যা করেছি, এবারও আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি, কিন্তু এই প্রচেষ্টাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে প্রাথমিক পদক্ষেপগুলির ওপর। অতএব, আমি দু-একটি প্রস্তাব করছি। আমার আশা তোমরা ভাল করে সেগুলো বিবেচনা করে

দেখবে। বিজ্ঞপ্তিটি একটি খসড়া কাজেই, যাঁরা সেটিতে সই করবেন বলে আশা করা যায়, তাঁরা সংশোধন কিংবা পরিবর্তনের প্রস্তাব করতে পারেন।

মোটের ওপর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত সমস্ত বক্তব্যের সঙ্গেই আমি একমত, তা হলেও আমার মতে দু-একটি পরিবর্তন করলে সেটি আনেক ভাল হবে। অতএব আমি এইসব পরিবর্তনের প্রস্তাব করছি।

১) পঞ্চম অনুচ্ছেদের "এবং সাম্প্রদায়িক" কথাগুলি বাদ দিলে ভাল হয়। সংখ্যালঘুদের জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচ বিনা শর্তে স্বীকার করে নিলে তাতে সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহ দেওয়া হয় না; জাতীয় সংহতির তা পরিপন্থী নয়, গণতন্ত্রও তাতে অস্বীকৃত হয় না।

২) তার পরের অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটিও বর্জন করা উচিত। ওই বাক্যটিতে মনে হচ্ছে, যা পরে হওয়ার কথা তাকে আগে রাখা হয়েছে, বোঝানো হয়েছে ভারত সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থাকা অবস্থাতেই আমরা নাগরিক অধিকার যোগ করতে পারি। নাগরিক স্বাধীনতা নির্ভর করে আমাদের আন্দোলনের সাফল্যের ওপর।

৩) নবম অনুচ্ছেদে কংগ্রেসের চরিত্র সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, আমি তার সঙ্গে একমত নই। আমার মতে বামপন্থীদের কর্তব্য কংগ্রেসকে ভারতীয় জনগণের একটি বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক দলে পরিবর্তিত করা। একমাত্র সে-কাজ করতে পারলেই আমরা কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের যে প্রচেষ্টা, কংগ্রেসকে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের গোষ্ঠীস্বার্থের প্রতিনিধিস্বরূপ একটি সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলে পর্যবসিত করা, সেই প্রচেষ্টা বিফল করতে পারব। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের, রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করায়, কংগ্রেসের যে কর্মসূচি তাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে ভারতের নিপীড়িত, শোষিত জনগণের একটি রাজনৈতিক দল প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক, বৈপ্লবিক নেতৃত্বের অধীনে, একটি প্রগতিপন্থী সামাজিক আদর্শবাদে বিশ্বাসী কংগ্রেস সে প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। সমগ্র পত্রটি সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই রচিত হয়েছে। সেই কারণে উক্ত অনুচ্ছেদটি তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়নি।

৪) আমি এই অনুচ্ছেদটি বাদ দিতে বলছি, যেটি "বর্তমান সময়ের প্রয়োজন"-এর চতুর্থ বিষয়: "সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরিবর্তে"। আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না যে, সাম্প্রদায়িক দল ও নেতারা প্রভাবশালী। জনগণকে সে-প্রভাব থেকে মুক্ত করতে গেলে, সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও নেতাদের প্রভাব খর্ব করতে হবে। সে উদ্দেশ্য সাধিত হবে, তাঁদের নিজেদের বক্তব্য ও দাবিসমূহের ভিত্তিতে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের দ্বারা।

৫) "বর্তমান সময়ের প্রয়োজন"-এর মধ্যে "একটি জোরালো স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন"-এর কথা বলা হয়েছে। তার ফলে একই বস্তুর জন্যে দু'বার শক্তি নিয়োজিত করা হবে। উদ্দেশ্য যদি হয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য একটি সংগঠন তৈরি করা, কংগ্রেস সদস্যদের সক্রিয় করে তুললে সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের চিন্তার অর্থ কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের উপর কোনও কার্যকরী সংগ্রামের জন্য নির্ভর করা চলে না।

৬) এই বিজ্ঞপ্তিপত্রে যাঁদের স্বাক্ষর করবার কথা, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সম্পর্কে আমার কিছু কিছু সংশয় ও আশঙ্কা আছে। গান্ধীপন্থী আদর্শবাদে বিশ্বাসীদের নিয়ে বামপন্থী গোষ্ঠী সংগঠন অর্থহীন। তা ছাড়া, কমরেড মাসানির নেতৃত্বে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল কমিউনিস্টদের সম্পর্কে যে মনোভাব গ্রহণ করেছেন, তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমি বাধ্য হচ্ছি। একটি প্রকৃত বামপন্থী গোষ্ঠী কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গঠনের পক্ষে সেই মনোভাব ক্ষতিকর। Bombay Industrial Disputes Bill-এর প্রতি এবং তার বিরুদ্ধে পরিকল্পিত সাধারণ ধর্মঘটের

সম্পর্কে কমরেড মাসানির দৃষ্টিভঙ্গী বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। যে-সব ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী এমন যাতে একমাত্র ফ্যাসিবাদী দক্ষিণপন্থীদের উদ্দেশ্যই সাধিত হয়, তাঁদের সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে খুবই কঠিন হত, যদি না একটি বামপন্থী গোষ্ঠী সংগঠিত করতে আমি অনেক দূর যেতে প্রস্তুত থাকতাম। আশাকরি কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের এই কমিউনিস্ট-বিরোধী এবং সুবিধাবাদী নীতি প্রতিরোধে তোমার প্রভাব তুমি খাটাবে, যাতে তোমার নেতৃত্বাধীন না হলেও, তোমার অনুপ্রেরণায় যে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে তার সাফল্য সুনিশ্চিত হয়।

এই কয়েকটি কথা বলে আমি প্রস্তাবিত বামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার ঐক্য ঘোষণা করছি, এবং আমার সুপারিশগুলি যদি গৃহীত না হয়, তবুও বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে সম্মতি জ্ঞাপন করছি, যদিও আমি আশা করছি, সুপারিশগুলি তোমার পছন্দ হবে এবং তোমার পরামর্শ অনুযায়ী কর্মসূচিটি সংশোধিত হবে।

তোমার
এম. এন. রায়

এই চিঠির একটি অনুলিপি লালা শঙ্করলালের কাছে পাঠান হল, তাঁর অবগতির জন্য।

ওপরে ৬ষ্ঠ অংশে "গান্ধীপন্থী আদর্শবাদ"-এর পরে অন্তর্ভুক্তির জন্যে নোট:

যাই হোক, আমার পরামর্শ, অন্যদের সমর্থন এই উদ্যোগের জন্যে অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রাপ্তি হবে। তোমার বক্তব্য শোনার পর আমি কয়েকটি নাম প্রস্তাব করব।

প্রাপক:
সুভাষচন্দ্র বোস
৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা

১৯৩৮-এর পদাধিকারীগণ
সভাপতি:
সুভাষচন্দ্র বোস
কোষাধ্যক্ষ:
যমুনালাল বাজাজ
সাধারণ সম্পাদক
জে. বি. কৃপালনি

সভাপতির কলিকাতার ঠিকানা:
৩৮/২ এলগিন রোড, কলিকাতা
টেলিফোন: পার্ক ৫৯
টেলিগ্রাম: 'SUVASBOS'

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
স্বরাজ ভবন, এলাহাবাদ
টেলিফোন ৩৪১, টেলিগ্রাম 'CONGRESS'

বার্তা

বঙ্গদেশে এবং আসামে একটি জাতীয়তাবাদী মুসলিম দৈনিক পত্রিকা অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতার বাণী বঙ্গদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে, বিশেষত মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হবে। স্বাধীনতার প্রকৃতি, স্বাধীনতা লাভের উপায়, স্বাধীনতা থেকে সাধারণ মানুষ কী কী অর্থনৈতিক সুফল লাভ করতে পারেন, এ-সব যদি প্রচার করা হয়, বঙ্গদেশের মুসলিম জনসাধারণ অবশ্যই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। তখন তাঁরা উপলব্ধি করবেন, যেহেতু কংগ্রেসই একমাত্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন, অতএব স্বাধীনতা লাভ করতে হলে কংগ্রেসে যোগদান ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

মুসলিম বঙ্গের জন্য মৌলবি রেজাউল করিমের সম্পাদনায় দৈনিক "দূরবীন" প্রকাশিত হচ্ছে। আমি এই পত্রিকার মঙ্গল এবং ক্রমাগত উন্নতি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

২৩. ১০. ৩৮

সুভাষচন্দ্র বোস

অমলা নন্দী (শংকর)-কে [মূল বাংলা]

Office Bearers for 1938
President
SUBHAS CHANDRA BOSE
Treasurer
JAMANLAL BAJAJ
General Secretary
J.B. KRIPALANI

Presidents Calcutta Address
38-2 Elgin Road, Calcutta
Telephone Park 59
Telegram Suvasbos

All India Congress Committee
Swaraj Bhawan, Allahabad
Telephone 341 Telegram congress

১১/১১/৩৮

কল্যাণীয়া অমলা,

তোমার লেখা "সাত সাগরের পারে" বইখানা আমাকে এক নূতন আনন্দ দিয়েছে। ইয়ূরোপের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ভারতীয় আদর্শকে কিরূপ শ্রদ্ধা করে তা তোমার বইয়ে অনেক স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। ভবিষ্যতে যাঁদের দ্বারা ভারতের কৃষ্টি ও সাধনার গৌরব ঘোষিত হবে, তুমি তাঁদেরও মধ্যে একজন হও, এই কামনা করি। আমার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা গ্রহণ কর।

ইতি
নিত্য শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

কল্যাণীয় শ্রীমতী অমলা নন্দী
কলিকাতা

প্রিয় কুমারী অমলা নন্দীর প্রতি
কলকাতা

এম. এন. রায়ের পত্র

১৩ মোহিনি রোড
দেরাদুন
১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

প্রিয় বন্ধু,

আমার অভিনন্দন তার করার প্রয়োজন ছিল না। লৌকিকতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমাদের ভাবনা। আমার পরামর্শ কিংবা প্রস্তাব তোমার গ্রহণযোগ্য হবে কিনা বুঝতে পারিনি

বলে আমার মতামত ব্যক্তিগত চিঠিতে প্রকাশ্যভাবে তোমাকে জানাইনি। কিন্তু মালদহ থেকে তোমার বিবৃতিতে তুমি যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছ, তারপরে আমার মনে হচ্ছে, এই কথাগুলি তোমাকে লেখা সর্বসাধারণের স্বার্থে আমার কর্তব্য।

আমার মতে গান্ধীজির বিবৃতির পরে তোমার সামনে আর দ্বিতীয় কোনও পথ খোলা নেই। সে বিবৃতি পড়ে তোমার কী মনে হয়েছে আমি জানি না। আমার দৃষ্টিতে ওটি একটি যুদ্ধ ঘোষণা এবং যুদ্ধ চলবে প্রকৃত গান্ধীবাদী পথে, অর্থাৎ অসহযোগিতা দ্বারা। এখন কংগ্রেসে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক, তাতে অসহযোগিতার একটাই অর্থ হতে পারে, তোমাকে এবং তোমার সমর্থকদের হেয় করবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিসাধন। গান্ধীজির বিবৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের স্থানে তোমার এবং তোমার নির্বাচনের যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন, এই উভয়পক্ষেরই একসঙ্গে থাকা সম্ভব হবে না, এক পক্ষকে সরে যেতেই হবে। এই যে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত, তার যুক্তিসম্মত উপসংহার এই: গান্ধীজির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের ঐক্যের বেদীতে তোমাকে আত্মবলিদান দিতে হবে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, সেই আত্মত্যাগ হবে এমন এক ঐক্যের জন্যে যার দ্বারা কংগ্রেসের অকল্পনীয় ক্ষতি হবে। এর মূল্য হবে অত্যধিক। এ ধারণা সর্বৈব ভ্রান্ত যে, কংগ্রেসের ঐক্যের একমাত্র শর্ত, কিংবা আদৌ কোনও শর্ত হতে পারে গান্ধীবাদী সংস্কারপন্থী নেতৃত্বকেই বহাল রাখা। বস্তুত একটি বিপ্লবী গণসংগঠনের ঐক্য গড়ে তুলবার জন্য এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্যে কিছুদিন অন্তর প্রয়োজন হয়, নিজেদের ইচ্ছা যাঁরা সমগ্র সংগঠনের উপর চাপিয়ে দিতে চান তাঁদের অপসারণ। নির্বাচনে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে, কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য পুরনো নেতাদের ওপর আস্থা হারিয়েছেন। আপনার কর্তব্য সংখ্যাধিক্যের রায় থেকে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একটি মহান সংগঠনের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে যা প্রত্যাশিত সেরকম সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সহকারে কাজ করা।

আপনার কী করা উচিত সে বিষয়ে, গত বছরে আপনার নির্বাচনের পর যে পরামর্শ দিয়েছিলাম, তার পরে আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। এ বছর আপনার নিজের মত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না করার কোনও কারণ নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা যাঁরা হারিয়েছেন সেইসব পুরনো নেতাদের সহযোগিতা লাভের জন্যে আপনাকে অনেক দূর যেতে হবে, এই মর্মে আপনার কিছু সংখ্যক বামপন্থী সমর্থক যেসব বিবৃতি দিয়েছেন তাতে আমি বিস্মিত। এ বছরের সভাপতি নির্বাচন সম্পর্কে গান্ধীজি যা বলেছেন সেটাই সঠিক, তিনি পরাস্ত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে কী কর্তব্য সে-বিষয়ে কোনও ভ্রান্তি থাকা উচিত নয়। কংগ্রেসকে এখন নতুন নেতৃত্ব দান করতে হবে। গান্ধীবাদী যেসব নীতি এবং ধ্যান-ধারণা এতদিন কংগ্রেসের রাজনীতি নির্ধারিত করে এসেছে, সেসব থেকে এই নেতৃত্বকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে। গান্ধীবাদী নীতির সঙ্গে প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনীতিকে মেলান যায় না। এ-বিষয়ে বামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনও ভুলভ্রান্তি থাকা উচিত নয়।

বিভেদ নিয়ে ভীতির কোনও অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে, পার্থক্যের অনুভূমিক রেখাটিকে অগ্রাহ্য করেও কোনও লাভ হবে না। নেতাদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, সমগ্র সংগঠন-ব্যাপী যাঁদের অন্ধ অনুগামী আছেন, তাঁরাই কংগ্রেসকে তার লক্ষ্যে পৌঁছবার একমাত্র পথ থেকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছেন। যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের সোচ্চার সমর্থনে এক নতুন নেতৃত্ব কংগ্রেসকে ঠিক রাস্তায় ফিরিয়ে আনবার কাজ হাতে নেবেন, তখন পুরনো নেতাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আসবে, তাঁরা কি কংগ্রেসের প্রতি অনুগত থাকতে চান, না ব্যক্তিগত অহমিকার বশে কংগ্রেসকে ত্যাগ করতে চান। নির্দিষ্ট করে বললে, আপনি অনায়াসে সর্বোচ্চ কার্যকরী সংস্থায় কয়েকজন প্রবীণতর নেতাকে এখনও রাখতে পারেন, কংগ্রেস তাঁদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার

পরেও তাদেরকে কংগ্রেসের সেবা করবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে। কিন্তু সভাপতি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠর যে রায় প্রকট হল সেই অনুযায়ী কার্যকরী সমিতি নির্বাচনে কোনও কারণেই কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দিলে, তা হবে আত্মহত্যার সামিল। আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কংগ্রেসের নতুন নেতৃত্বের এমন সাহস থাকা চাই যেন, তাঁরা এমনকী গান্ধীজিরও ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারেন, সে ইচ্ছা যদি আন্দোলনের বৈপ্লবিক প্রেরণার বিরুদ্ধে যায়।

পরাজিত দক্ষিণপন্থীরা বিনা দ্বিধায়, নবীনতম নেতৃত্বকে হতমান করবার উদ্দেশ্যে যে তাঁদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন, সে কথা মনে রেখে নতুন নেতাদের উচিত চমকপ্রদ রাজনৈতিক সভা-শোভাযাত্রা ইত্যাদির বদলে সংগঠনের মধ্যে নিজেদের অবস্থিত দৃঢ়মূল করবার চেষ্টা করা। বামপন্থীদের জয় নিয়ে উল্লাস করবার সময় এখনও আসেনি। সাংবিধানিক পন্থায় আস্থা, দুর্ভাগ্যক্রমে, শীর্ষনেতাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই এখন আর সীমাবদ্ধ নেই, মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর থেকে সে মনোভাব সংগঠনের নিম্নস্তরেও প্রবেশ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে যাঁরা বামপন্থীদের সঙ্গে আছেন বলে মনে হয়, তাঁদেরও অনেকে সংশোধনবাদী চিন্তাধারার দ্বারা কলুষিত হয়ে গেছেন। সাধারণভাবে সমগ্র দেশে জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি এখনও ওই ধরণের লোকেদের নিয়ন্ত্রণে আছে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থাগুলি থেকে যে-সব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, তার দৌলতেই তাঁদের সে-নিয়ন্ত্রণ তাঁরা বজায় রেখেছেন। নতুন নেতাদের এখনই যে-কাজ করতে হবে, তা হল নিম্নস্তরের ওইসব সংস্থাকে সে-সব অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। তার অর্থ, এটি একটি সাংগঠনিক সমস্যা, যার সমাধান প্রথমেই করা দরকার

সেই কারণে এআইসিসির সেক্রেটারিয়েটের গঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দশকে তলা থেকে ওপর পর্যন্ত গড়ে তোলার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। বিবাদ-বিসংবাদ ও রেষারেষি এখন একটি সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসকে ধ্বংস করে ফেলছে। একমাত্র কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ তার অবসান করতে পারে। এআইসিসি-র সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দেওয়া দরকার।

সাহসী ও সুনিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা আমি বলছি বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যে-সব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হবে তাকে আমি খাটো করে দেখছি। আমি ধরেই নিচ্ছি, নতুন এই এআইসিসি নিশ্চিতভাবে দক্ষিণ পন্থার দিকে ঝুঁকবে। যে ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য তোমার সমর্থক হবেন, তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত প্রগতিবাদী নীতির অনুসরণে সেই এআইসিসি বাধা দেবে, হয়তো তোমাদেরও দেশবন্ধুর মতোই অভিজ্ঞতা হবে। এবং সেই রকম জরুরি অবস্থার জন্যে তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে। সেই অসুবিধা এড়াবার জন্যে এআইসিসি-কে বাতিল করার বর্তমান নীতি তুমি অবলম্বন করতে পারো না। কিন্তু এআইসিসি-র সৃষ্ট এই অসুবিধা অতিক্রম করার একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে। এআইসিসি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের প্রতিনিধি করে না (আমি তাঁদের মনোভাবের কথা বলছি), পদ্ধতিটি এই: একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকতে হবে। সেই অধিবেশন অবশ্যই দক্ষিণপন্থী এআইসিসি-র নীতি অনুমোদন না করে, আপনাদের প্রগতিপন্থী নীতিই অনুমোদন করবে। যে-বিশেষ পথে ডাকতে হতে পারে, সেখানে বামপন্থীরা স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেন। তার জন্যে প্রাথমিক সদস্যদের রাজনীতিবোধের স্তর উন্নীত করে, নিম্নতর কমিটিগুলিকে ক্রিয়াশীল করে, জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি দখল করা দরকার হবে।

পরিশেষে, তুমি কংগ্রেসকে যে-নীতি অনুসরণ করাতে চাও, কংগ্রেস অধিবেশনে তা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করে আলোচনা ও অনুমোদনের জন্যে পেশ করতে হবে। তাতে তুমি পুরনো নেতাদের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত করবার সুযোগ পাবে। ওয়ার্কিং কমিটির সামনে যে-সব প্রস্তাব পেশ করতে হবে। সে-সব প্রস্তাব যদি তোমাদের প্রগতিপন্থী মনোভাব, সভাপতি নির্বাচনে

যে-মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, প্রকাশ করে, ওয়ার্কিং কমিটি এখন যে-ভাবে গঠিত, তাঁরা তা অনুমোদন করবেন না। সে-ক্ষেত্রে তোমাদের প্রস্তাবগুলি সরাসরি কংগ্রেসের সামনে তোমাদের পেশ করতে হবে এবং পুরনো নেতারা প্রগতিপন্থীনীতির প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে বাধ্য হবেন। সে-ভাবে প্রকৃত প্রশ্নগুলি পরিষ্কার হবে, বিতর্ক উচ্চতর রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত হবে। একমাত্র তা হলেই আন্দোলন আরও ভাল করে গড়ে উঠতে সহায়তা হবে।

বলা বাহুল্য, আমি সর্বদাই তোমার কাজে লাগবার জন্যে প্রস্তুত, প্রয়োজন হলেই তুমি আমার সহায়তা পাবে। চিঠিতে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যায় না। অনেকগুলি প্রস্তাব নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা দরকার হতে পারে, একমাত্র ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারেই তা সম্ভব। এ-মাসের মাঝামাঝি আমি কলকাতা পৌঁছব, আশা করি। তখন আমরা ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার সুযোগ পাব এবং আশা করি আমরা কীভাবে সাহায্য করা আপনি চান, জানতে পারব।

শুভেচ্ছা ও আন্তরিক প্রীতি সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

আপনার
এম এন. রায়

মুস্তাফা এল নাহাস পাশা-র প্রতি (তারবার্তা)

ডি. এল. টি

মুস্তাফা এল নাহাশ পাশা
হেলিওপলিস
কায়রো
(মিশর)

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস-এর পক্ষ থেকে আমি আপনাকে এবং আপনার সহকর্মীদের ত্রিপুরিতে ১০ মার্চ এবং পরবর্তী দিনগুলিতে আমাদের বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মিশরীয় জাতির নেতা হিসাবে আপনার আগমন আমাদের দুই জাতির মধ্যে সংহতি দৃঢ়তর করবে এবং আমাদের দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবে। ভারত আপনাদেরকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাবে।

—সুভাষ বোস
সভাপতি

সুভাষ সি. বোস
৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা
৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

এ. আই. সি. সি-র অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের প্রতি

১৯৩৮-এর পদাধিকারীগণ
সভাপতি:
সুভাষচন্দ্র বোস
কোষাধ্যক্ষ:
যমুনালাল বাজাজ
সাধারণ সম্পাদক
জে. বি. কৃপালনি

সভাপতির কলিকাতার ঠিকানা
৩৮-২ এলগিন রোড, কলিকাতা
টেলিফোন: পার্ক ৫৯
টেলিগ্রাম: 'SUVASBOS'

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
স্বরাজ ভবন, এলাহাবাদ
টেলিফোন: ৩৪I, টেলিগ্রাম 'CONGRESS'

অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক
এ. আই. সি. সি.
এলাহাবাদ

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

সমীপেষু

প্রিয়বন্ধু,

আপনি অবগত আছেন, মিশরীয় প্রতিনিধিদল ত্রিপুরি কংগ্রেসে উপস্থিত থাকবেন। অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁদের জন্য দশ দিনের একটি ভ্রমণের কর্মসূচি আমাদের তৈরি করতে হবে। দয়া করে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির কাছে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁরা নিজের নিজের প্রদেশে সেই প্রতিনিধিদলকে আমন্ত্রণ জানাতে চান কি না, এবং নিজের নিজের প্রদেশের মধ্যে তাঁদের ব্যয়ভার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি বহন করতে পারবেন কিনা। আপনি তাঁদেরকে বলবেন, অতিথিদের সর্বাধিক আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা তাঁদের করতে হবে। তাঁদের শুধুমাত্র লাহোর, দিল্লি, আগ্রা, এলাহাবাদ, বেনারস, পাটনা, কলকাতা, মাদ্রাজ, নাগপুর ইত্যাদি বড় বড় শহরে যাবার সময় থাকবে। দূরের জায়গাগুলি বাদ দিতে হবে। সবশুদ্ধ দিন পনেরো তাঁরা ভারতে থাকবেন এবং তার মধ্যে ৩ কিংবা ৪ দিন তাঁরা ত্রিপুরিতে কাটাবেন। সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কমিটিগুলি ত্রিপুরিতে আপনার কাছে উত্তর পাঠাতে পারেন। ত্রিপুরিতে তাঁদের থাকার জন্যে অভ্যর্থনা সমিতিকে আমি আগেই অনুরোধ করেছি।

আপনার
সুভাষ সি. বোস

৩বি স্টোর রোড
বালিগঞ্জ
কলিকাতা
৫ মার্চ ১৯৩৯

সুভাষচন্দ্র বোস
সভাপতি, নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস
ত্রিপুরি

প্রিয় বন্ধু,

আমি ভ্রমণ থেকে ফিরে এলাম প্রবল ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে। এসে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম শুনে যে, আপনিও অসুস্থ। সেই কারণে আবার আমাদের মধ্যে দেখা হয়ে অমীমাংসিত বিষয়গুলির আলোচনা সম্ভব হল না। আমি ধরে নিচ্ছি, কংগ্রেস অধিবেশনে আপনাদের দিক থেকে যে-সব প্রস্তাব পেশ করা হবে, ৬ তারিখের ত্রিপুরির অধিবেশনে আপনারা সে-বিষয়ে একমত হতে পারবেন। আমি এখনও শয্যাশায়ী, তাই ৬ তারিখের আগে ত্রিপুরি পৌঁছতে পারব না। সেই কারণে, ভবিষ্যতে কংগ্রেসকে পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছেন, আমার মতে তাঁদের যে-সব প্রস্তাব উত্থাপন করা উচিত, তার খসড়া আমি কম. জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, খসড়াগুলির কপি এই সঙ্গে পাঠালাম। অন্য বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি যদি সমর্থন করে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রায় নিশ্চিত।

৭ তারিখে বোম্বাই মেলে আমি ত্রিপুরি পৌঁছব।

আশা করি কাজের চাপ আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে না।

আপনার
এম. এন. রায়

জেকব গুণনিধি বিশ্বাসকে

১৯৩৮-এর পদাধিকারীগণ
সভাপতি:
সুভাষচন্দ্র বোস
কোষাধ্যক্ষ:
যমুনালাল বাজাজ
সাধারণ সম্পাদক
জে. বি. কৃপালনি

সভাপতির কলিকাতার ঠিকানা:
৩৮/২ এলগিন রোড, কলিকাতা
টেলিফোন: পার্ক ৫৯
টেলিগ্রাম:
'SUVASBOSE'

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
স্বরাজ ভবন, এলাহাবাদ

পোঃ জিয়ালগোরা
জিলা: মানভূম
বিহার
১৪.৪.৩৯

প্রিয় মি. বিশ্বাস,

সংবাদপত্রে নতুন মনোনীত কাউন্সিলারদের তালিকা দেখার পর থেকে আমি আপনাকে পত্র দেব ভাবছি। আপনি যখন কাউন্সিলার ছিলেন সেই সময়ে সৎ ও অকপটভাবে কাজ করার জন্যে ওঁরা একরকমভাবে আপনাকে শাস্তি দিলেন। আপনার চরিত্র আমি জানি, তাই আমি নিশ্চিত জানি, এ-বারে বাদ পড়ার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না।

করপোরেশনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ১৯২৪ থেকে। আপনি জানেন, কারও চাটুকারিতা করা, কারও মন জুগিয়ে চলার আমার অভ্যাস নেই। কোনও অতিশয়োক্তি না করে আমি বলতে পারি আমার অভিজ্ঞতার এই প্রথম একজন মনোনীত ক্রিশ্চান কাউন্সিলার তাঁর পুরসভা সংক্রান্ত কর্তব্য প্রকৃত ক্রিশ্চানের মতো পালন করলেন। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়কে আমি অত্যন্ত মূল্য দিই, এবং আমি আন্তরিকভাবে আশা করি এই পরিচয় গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হবে।

আমি ফিরে এলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে আশা করি। আমার পরিপূর্ণ আশা, ভবিষ্যতে অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা সহযোগিতা করব, এক সঙ্গে কাজ করব।

আমি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছি।

শ্রদ্ধা সহকারে
আপনার
সুভাষচন্দ্র বোস

অমিয়নাথ বসুকে[১]

জামাডোবা
১৭. ৪. ১৯৩৯

স্নেহের অমি,

ঠিক দু'মাস হল আমি শয্যা নিয়েছি। অনেক দিনের মধ্যে এই বারই আমাকে সবচেয়ে কাহিল করেছে। আমার ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হয়, তার সঙ্গে অন্যান্য গোলযোগও ছিল (লিভার ও অন্ত্রের)। এই অসুখটা এমনই সময়ে হল যখন রাজনৈতিক সংকটের ফলে আমাকে মানসিক উদ্বেগে দিন কাটাতে হচ্ছিল। শারীরিক বা মানসিক বিশ্রাম কোনওটাই তখন ছিল না— বিছানায় শুয়ে শুয়ে, এমনকী দারুণ জ্বর নিয়েও আমাকে কাজ করে যেতে হয়েছে। এক এক সময় মনে হয়েছে আমি আর সেরে উঠব না। যাই হোক, এখন সংকট কেটে গেছে এবং আমি সেরে ওঠার মুখে। আমি এ মাসের ২১ তারিখে বি. পি. সি. সি., এ.আই.সি.সি. ইত্যাদির মিটিং-এ যোগ দিতে কলকাতায় যাচ্ছি। যদিও শরীরের তাপমাত্রা এখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসছে, বেশ কিছুদিন দুর্বলতা থাকবে। যদি পারি গ্রীষ্মকালে একবার চেঞ্জে যাব ভাবছি। দেখি কতদূর কী হয়।

তুমি নিশ্চয় খবরের কাগজ পাও— প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে-পরেকার বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতিগুলো নিশ্চয় দেখেছ। ত্রিপুরি কংগ্রেসের বিবরণও নিশ্চয় চোখে পড়েছে। প্রাচীনপন্থীরা ধরে নিয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি শতকার ২৫ বা ৩০ ভাগের বেশি ভোট পাব না তাইজন্যে ফলাফলটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। ওদের নিজেদের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। ওরা ভাবতে থাকে কেবল ক্ষমতাই (সাতটি প্রাদেশিক সরকার) তাদের হাত ফসকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে না, গান্ধীবাদীরা একযোগে বোধ করতে শুরু করে, তাদের গত বিশ বছরের কাজ একদিনে পণ্ড হয়ে গেল। তাদের যত কিছু অক্রোশ এসে পড়ল আমার উপর। দেশবন্ধুর আমল থেকে তারা আর কারও কাছে এমন হার স্বীকার করেনি। এরপরে এল গান্ধীজির বিবৃতি— তিনি এগিয়ে এলেন প্রাচীনপন্থীদের উদ্ধার করতে এবং বললেন ওদের পরাজয় তাঁর নিজের পরাজয়। যারা "মধ্যপন্থী" তাদের মত বদলাতে শুরু করল। তাদের মন ঝুঁকছিল আমাদের দিকে কিন্তু তাদের কথায়— তারা গান্ধীজিকে উড়িয়ে দিতে পারছিল না।

আমার অসুখটা দারুণ একটা দুর্দৈব হয়ে দাঁড়াল। ত্রিপুরিতে পরিষ্কারভাবে আমাদের পরাজয় ঘটেছে। তবে বোম্বাইয়ের এক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, ঘটনাটা দাঁড়িয়েছিল এইরকম: একজন রুগ্ন লোক বিছানায় শুয়ে শুয়ে লড়াই করছে (১) প্রাচীনপন্থীর ১২ জন মাতব্বরের সঙ্গে, (২) জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে (৩) সাত সাতটি প্রাদেশিক মন্ত্রীমন্ডলীর সঙ্গে (যারা দক্ষিণপন্থীদের জন্য দালালি করছিল) এবং (৪) মহাত্মা গান্ধীর নাম, প্রভাব এবং সম্মানের সঙ্গে। তিনি তাঁর শেষ কথায় আমাদের পরাজয়কে নৈতিক জয় বলে অভিহিত করেন।

আমাদের হারবার আরও কারণ ছিল সি. এস. পি.[২] নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা এবং আমাদের তরফে কয়েকটা চালের ভুল। সি. এস. পি. নেতাদের ত্রিপুরি নীতিতে ওই দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে এমন বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল যে তার ফলে দলের ভিতসুদ্ধ নড়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টিও সি. এস. পি'র সঙ্গে হাত মেলায় কিন্তু শেষ মুহূর্তে সি. পি. নেতারা যা স্থির

---

১ বিহারে জামাডোবায় আরোগ্যকালীন বিশ্রামের সময় ইংল্যান্ডে অবস্থিত শ্রীঅমিয়নাথ বসুকে লেখা চিঠি।
২. সি. এস. পি: কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি

করেছিল (সি. এস. পি. নেতাদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে) তা বানচাল করে দেয় দলের সাধারণ কর্মীদের বিক্ষোভ।

এই সংকটের সময় পণ্ডিত নেহরু ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং আমাদের আদর্শের যতখানি অনিষ্ট করেছেন, তেমন আর কেউ করেননি। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে থাকতেন আমরাই সংখ্যায় বেশি হতে পারতাম। এমনকী তিনি যদি নিরপেক্ষ থাকতেন তা হলেও সম্ভবত আমরা সংখ্যাধিক হতাম। কিন্তু ত্রিপুরিতে তিনি ছিলেন দক্ষিণপন্থীদের দলে। প্রকাশ্যে আমার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচার ১২ জন মাতব্বরের কার্যকলাপের থেকে অনেক বেশি আমার ক্ষতি করেছে। ভাবলে সত্যিই দুঃখ হয়।

আপাতত আমাদের ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত। গান্ধীজি ও আমার মধ্যে কথাবার্তা চলেছে। তাঁরা কোনও একটা মীমাংসার দিকে যাবেন কি না— এত আগে তা বলা যাচ্ছে না। এও সম্ভব যে শেষ পর্যন্ত আমাকে ইস্তফা দিতে হতে পারে।

সাধারণের চোখে সি. এস. পি. বেশ পড়ে গেছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এম. এন. রায়ের লাভ হয়েছে। তিনি এখন বাংলাদেশে ঘুরছেন এবং যেখানেই যাচ্ছেন সবাই তাঁকে ভালভাবে নিচ্ছে। স্বভাবত তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশের একটা দুর্বলতা আছে তবে তিনি সত্যি কোনও প্রতিষ্ঠা পাবেন কি না তা নির্ভর করে তাঁর বন্ধুদের উপর অর্থাৎ যাদের সঙ্গে তিনি জোট বাঁধবেন তাদের উপর। তিনি অত্যন্ত স্বতন্ত্রবাদী, জোট বেঁধে কাজ করা তাঁর ধাতে নেই। এটি তাঁর মস্ত একটা ত্রুটি।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং তার উপসংহার যতই দুঃখদায়ক হোক, তার ফলে কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা তীব্র হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে এইটেই জোগাবে দারুণ প্রেরণা। সামনের ভবিষ্যতে আমাদের কপালে যাই থাক না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমি বাস্তববাদী হিসেবেই এ কথা বলছি। প্রগতিপন্থী ও বৈপ্লবিক শক্তিগুলির শতকরা ৯০ ভাগ আমাদের পক্ষে। আমার দুঃখ হয় যখন ভাবি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ও পরে এবং বিশেষ করে ত্রিপুরিতে জওহর নিজের যে পরিচয় দিয়েছেন তার ফলে এমনকী যারা তাঁর গুণমুগ্ধ ছিল তাদের মধ্যেও জওহর সম্পর্কে ধারণা দারুণভাবে নাড়া খেয়েছে। দেড়ঘণ্টা ধরে প্রতিনিধিরা তাঁর কথা শুনতেই চাননি। তাঁরা শান্ত হলেন একমাত্র যখন মেজদা[১] তাঁদের শান্ত হতে অনুরোধ করলেন। এমন ঘটনা কখনও কেউ শোনেনি। এই পর্যন্তই থাক। ভালবাসা জেনো।

তোমাদের
সুভাষ

---

১ মেজদা— শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

এম. এন. রায়ের পত্র

৩বি স্টোর রোড
বালিগঞ্জ
কলিকাতা
১৮ এপ্রিল ১৯৩৯

প্রিয় বন্ধু,

তোমার কাছে পেশ করা স্মারকলিপির একটি অনুলিপি ভিজিয়ানাগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটি আমার কাছে পাঠিয়েছে। আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে, আমি যেন স্মারকলিপি প্রেরকদের মামলাটা সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তা তোমাকে বুঝিয়ে বলি। স্বভাবতই সে-কাজ আমি করতে পারতাম না, যদি না সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্যের যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করতাম। ভিজিয়ানাগ্রামের জেলা কংগ্রেস কমিটি দু-বৎসর মৌলিক বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে আছে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি তাঁদেরকে হঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত রকম অন্যায় করা হচ্ছে। তবু বিপ্লবপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা যায়নি, কারণ তাঁরা ভাল কাজ করছেন এবং সেই কারণে সদস্যদের আস্থাভাজন। ব্যাপারটার খুঁটিনাটি স্মারকলিপিতে দেওয়া হয়েছে। আমি আশা করি তোমার সেটি পড়ে দেখবার সময়ে হবে, এবং তুমি নির্দেশ জারি করবে, যাতে দক্ষিণপন্থীদের অন্যায় আক্রমণ থেকে বিপ্লববাদীরা সুরক্ষিত থাকেন। উল্লেখ করা যায়, ওই জেলার ১৩ জন প্রতিনিধি সকলেই আমার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, এবং জেলা কংগ্রেস কমিটির ওপর সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের সেটাও একটা কারণ।

তুমি তোমার গুরুভার দায়িত্ব আবার গ্রহণ করবার মতো সুস্থ হয়েছ জেনে আমি খুশি। তোমার পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত কঠিন, এবং সমস্ত প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের আনুগত্য ও দৃঢ় সমর্থন তোমার প্রয়োজন। আমি আবার তোমাকে আমার সম্পূর্ণ সহযোগিতা দান করতে চাইছি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-রকম ধারণাও আমার হচ্ছে যে আমার সহযোগিতার আশ্বাসের আন্তরিকতা সম্পর্কে তুমি সন্দিহান। বস্তুত আমাকে বলা হয়েছে, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলবার সময়ে সম্প্রতি তুমি আমাকে "নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত" বলে বর্ণনা করেছেন। আমার পক্ষে সে-কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তবু, উপরোক্ত ধারণা দূর করার জন্যে তোমার দিক থেকে কোনও রকম নিদর্শন যদি পাওয়া যায়, আমি হব। যদি তোমার মনে হয়, এর ফলে লাভ হবে, অবশ্যই তুমি তা করবে।

শুভেচ্ছা ও আন্তরিক প্রীতি সম্ভাষণ সহকারে

তোমার
এম. এন. রায়

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বোস
জামাডোবা

১৯৩৮-এর পদাধিকারীগণ
সভাপতি:
সুভাষচন্দ্র বোস
কোষাধ্যক্ষ:
যমুনালাল বাজাজ
সাধারণ সম্পাদক
জে. বি. কৃপালনি

সভাপতির কলকাতার ঠিকানা:
৩৮-২ এলগিন রোড, কলিকাতা
টেলিফোন: পার্ক ৫৯
টেলিগ্রাম:
'SUVASBOS'

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
স্বরাজ ভবন,
এলাহবাদ
টেলিফোন: ৩৪১
টেলিগ্রাম: 'CONGRESS'

পোঃ জিয়ালগোরা
জেলা মানভূম
বিহার
১৮ এপ্রিল ১৯৩৯

প্রিয় বন্ধু

আমি আজ আপনাকে এই টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছি:

"দয়া করে সমস্ত পি. সি. সি.-কে অনুরোধ করুন যেন তারা ২৩ এপ্রিল যুদ্ধবিরোধী দিবস পালন করে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সুভাষ বোস।"

আজ সংবাদপত্রে প্রেরিত আমার বিবৃতির একটি অনুলিপি এই সঙ্গে পাঠালাম।

আপনাদের
সুভাষ সি. বোস

সীতা সেনকে

পোঃ জিয়ালগোরা
জিলা মানভূম
বিহার
১৯. ৪. ৩৯

প্রিয় সীতা,

তোমার প্রথম সন্তানের জন্ম উপলক্ষে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি অনেক আগেই আমার লেখা উচিত ছিল। লীলা আমাকে সে-খবর দিয়েছে। সে লিখেছে তোমার খুব কষ্ট

হয়েছিল, কিন্তু আগের চেয়ে ভাল আছ। আশা করি তুমি এবং শিশু এত দিনে দু'জনেই ভাল আছ।

গত দু' মাস আমার সময় যাচ্ছেতাই রকম খারাপ গিয়েছে, তার প্রধান কারণ সংটের সময়টিতেই আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। যাই হোক, এখন সবচেয়ে খারাপ সময়টা কাটিয়ে এসেছি, আমি সেরে উঠছি এবং জীবনসংগ্রামে আবার যোগ দিতে পারব, ২১ তারিখে কলকাতা যাচ্ছি।

সন্তোষ আমাকে মেয়ো হাসপাতালে নিয়ে, না কী নিয়ে যেন, যে-চিঠি দিয়েছিল, তার উত্তর দিইনি বলে সন্তোষের কাছে ক্ষমতা চাওয়া দরকার। ব্যাপারটা নিয়ে আমি কিছু করতে চেয়েছিলাম, যদিও তাতে কোনও ফল হবে কি না আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলির চক্রে পড়ে গেলাম, এবং তার পর থেকে আমি কী অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি কিছুই বুঝতে পারছি না। কিংবা বলা উচিত, আমি দাঁড়িয়েই নেই, বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে আছি

আবার কবে তোমায় চিঠি লিখতে পারব জানি না, কখন আবার লক্ষ্য অর্জনের জোয়াল কাঁধে চাপবে। তবে তোমার খবর মাঝে মাঝে দেবে।

সবাইকে ভালবাসা।

স্নেহ সহকারে
সুভাষ

অক্সফোর্ড ১৮৬
অটল, ড. ২৯
অটোয়া চুক্তি ১৮
অনশন ভঙ্গ ১৫৬, ১৭০
অরবিন্দ ঘোষ ৭৪
'অর্থভাণ্ডার দিবস' ২৮
অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ৮, ১৬, ৩১, ৯৭-১০০, ১০২, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৯, ১২১, ১২৩, ১২৫-১৩০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৪৫, ১৪৬, ১৫২-১৫৬, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ১৭৩, ২০৪, ২১০, ২১৫
অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ ৮১-৮৮, ৯১, ১১৭, ১৪৩
অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ৮২-৮৭, ৮৯
অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ ওয়ার্কিং কমিটি ৮২
অস্ট্রিয়া ৫০
অহিংস গণ-আন্দোলন ১১১, ১২৩, ১২৫
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ১০৯

আইন অমান্য আন্দোলন ১০, ১৯, ৩৬, ৪৮, ১০৭, ১২১, ১২৫
আইরিশ ন্যাশনালিটি অ্যান্ড সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট ১৮
আগ্রা ১৪২, ২১২
আনাতোলিয়া ৫২
আনে, মি. ১৬৯
আফগানিস্তান ২২, ১৮৯
আবিসিনিয়া ৫১
আয়ারল্যান্ড ৬, ৭, ১১, ১৭, ১৮
আর. পাম দত্ত ৩
আলমোড়া ১৪৫, ১৬৮
আলস্টার ৬
আল্লাহ বক্স মন্ত্রিসভা ৯০

ইউনাইটেড প্রেস ১০৯
ইংল্যান্ড ১৮, ২৬, ৫১, ৬৬, ১৪৮, ১৬২, ১৮৭, ১৮৯
ইতালি ৭, ১১, ১৭, ৩৬, ৩৮, ৫০, ৬৬, ১৪৭, ১৬৬, ১৭১
ইন্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ১৯১
ইন্দো-ব্রিটিশ বাণিজ্যচুক্তি ১৮
'ইয়ং ইন্ডিয়া' ১৭
ইরাক ৭, ১৮৭
ইহুদি ৭
ইহুদিদের আশ্রয় ১৪৭, ১৬২

ঈশ্বরদাস জালান ২০০, ২০২

এ. আই. সি. সি./এআইসিসি *দেখুন* অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
এথেন্স ১৮৭
এন. আর. সরকার, শ্রীযুত ৯০
এম. এন. রায় ২১৬
এম. ঘোষ, মি. ১৯৪
এলাহাবাদ ২৮, ৪৭, ৯৩, ৯৬, ৯৮, ১০৭, ১৩৫, ১৪২, ১৪৪, ১৫১, ১৫৩, ১৫৫, ১৬৮, ২১২

ওয়াফদ পার্টি ৭, ১৫
ওয়ার্ধা/ওয়ার্দ্ধা ১৫, ৪৪, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭২, ৮৪, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৫, ১০৪, ১২৩, ১৪২, ১৪৪, ২০৩, ২০৪

কংগ্রেস
ওয়ার্কিং কমিটি ১৫, ৪৩, ৪৪, ৫৯, ৬০, ৭০, ৭১, ৭৭, ৭৮, ৮৪, ৮৫, ৮৮-৯০, ৯২,

৯৪, ৯৫, ৯৭-১০০, ১০২, ১০৬, ১১০, ১১২, ১১৩, ১১৫-১১৭, ১১৯, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১৩২-১৩৮, ১৪৫-১৫০, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৯, ১৬১-১৬৭, ১৭১, ১৭২, ২১১
কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ১৫৩, ১৫৪
কোয়ালিশন (জোট) সরকার ৮৬, ৯২
মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন ১৯৮
কংগ্রেস-লিগ চুক্তি ৮৬
কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি/সি.এস.পি. ২০, ২১, ৯৪, ১০২, ১০৩, ১১৮, ১৫৩
করাচি ১৬১
কলকাতা ৮, ১৪, ৪১, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৭, ৮৪, ৯১, ৯৭, ৯৮, ১২৮, ১৩১-১৩৩, ১৪২, ১৪৩, ১৬১, ১৯৭, ২১১, ২১২, ২১৫
কানপুর ২০৩
কামাল আতাতুর্ক ৩৮, ৪২, ৫২
কামাল পাশা *দেখুন* কামাল আতাতুর্ক
কিচলু, ডক্টর ১৫৮
কৃপালনিজি/ আচার্য *দেখুন* জে. বি. কৃপালনি
কে. এস. রায়, ডা. ১৯৮, ২০০
কেনিয়া ২২
কেমব্রিজ ১৮৬

খড়্গপুর ১৩৩

গণ আইন-অমান্য ৬৭ *দেখুন* আইন অমান্য আন্দোলন
গয়া কংগ্রেস ৬৮
গাড়োয়াল ১৩৬
গান্ধী, মি. *দেখুন* মহাত্মা গান্ধী
গান্ধী-আরউইন চুক্তি ১৭, ১৫১
গান্ধীজি *দেখুন* মহাত্মা গান্ধী
গান্ধী সেবা সংঘ ৯৭, ১০০, ১০৬, ১০৯, ১২৭
গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, পণ্ডিত ১১৭, ১৬৮, ১৬৯
গ্রেট ব্রিটেন ৬, ৭, ১১, ১৪, ২০, ২১, ৩৪, ৪৫, ৫১, ৬৬, ১০৪, ১১১

চরকা সংঘ ১৪৪
চরমপত্র ১১২, ১১৪, ১১৬, ১২০, ১২৩, ১৪০, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৫
চিন ২২, ২৭-২৯, ৩৫, ১৩৮
চিন-জাপান যুদ্ধ ২৯, ১৮৯
চেওকি ১৩৩
চেক মাজিনো লাইন ৫০
চেকোস্লোভাকিয়া ১৭, ৫০, ৫১, ১৫৫
চেম্বারলেন ৫১

জওহরলাল *দেখুন* জওহরলাল নেহরু, পণ্ডি
জওহরলাল নেহরু, পণ্ডিত ৫, ৪২, ৬৬, ৮৬ ১০২, ১০৪, ১৩১-১৩৩, ১৭৬, ২০৪, ২১৬
জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য ৫
জন এন্ডারসন, স্যার ৩৪
জব্বলপুর ৭২, ১৪১
জয়পুর ১২১, ১৪৭, ১৫৫, ১৭১, ১৭৩
জয়প্রকাশ ১৪১, ১৬৩, ১৬৪
জয়প্রকাশ নারায়ণ, কম. ২১৩
জয়রামদাস দৌলতরাম ৫৮
জাঞ্জিবর ২২
জাপান ৭, ২৯, ৫৩, ৫৪, ১৮৯
জাপান-বিরোধী আন্দোলন ১৮৯
জামাডোবা ৭৪
জার্মানি ১১, ১৭, ৩৬, ৫০, ৫১, ৫৩, ৬৬, ১৪৭, ১৬২, ১৬৬, ১৭১
জি. পি. হাতিসিং ২৮
জি. ডি. বিড়লা ৯০
জিন্না ৮১, ১৩৬
জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ আলোচনা ৮৬
জুরিখ ১৯২
জে. বি. কৃপালনি ৫৮, ১০২, ১৩৬, ১৪৬, ১৫২
জোট মন্ত্রিসভা, আসাম ৯০, ১৫৩
জোট মন্ত্রিসভা, পঞ্জাব ৯১
জোট মন্ত্রিসভা, সিন্ধু ৯১
জোট সরকার, বঙ্গদেশ/বাংলা ৯০, ৯১

ঠাকোরসাহেব ১০৭, ১২০

ডয়েল ৩৬
ডলফাস ৫০
ডাবলিন ৪১
ডি ভ্যালেরা, প্রেসিডেন্ট ১১, ১৫, ৩৬, ১৮৬
'ডেইলি ওয়ার্কার' ৩

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ৫

তাও, অধ্যাপক ২৯
তাজমহল হোটেল ১৪১
তুরস্ক ১৩, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৫২, ১৬২, ১৮৯
ত্রিপুরা ১৪২
ত্রিপুরি ৬৫, ৬৬, ৭১-৭৪, ৭৬, ৯৪, ৯৮, ১০১-১০৪, ১১১, ১১৩, ১১৫, ১১৮, ১২০, ১২৯, ১৩৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮-১৫০, ১৫৪, ১৫৭-১৫৯, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ২১১, ২১৩, ২১৫, ২১৬
ত্রিপুরি কংগ্রেস ৫৬, ৬৬, ৭০, ৭১, ৭৬-৭৮, ৯১, ৯২, ৯৫, ১১২, ১২০, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১৪১, ১৪২, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৪, ১৫৮, ১৫৯, ১৭০, ২১২, ২১৫
ত্রিবাঙ্কুর ১২১

দক্ষিণ আফ্রিকা ২২
'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' ৪
দি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পত্র ৫০
দিল্লি ৩২, ৪১-৪৩, ৯০, ৯৬, ১০১, ১০৫, ১০৭, ১১৫, ১২০, ১২২, ১৩৪, ১৪২-১৪৫, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৩, ১৬৪, ১৭০, ১৯৭, ২০২, ২১২
দেশবন্ধু দাশ ৬৮, ১১১, ১১৪, ২১০, ২১৫
দৈনিক "দূরবীন" ২০৭

ধানবাদ ১২২, ১৪৩, ১৫৫, ১৭০, ১৭৩

নরসিং ৯৭
নরিম্যান ১৩৯
নরেন্দ্র দেও, আচার্য ৬০
নলিনী সরকার ৯১
নাৎসি ১২, ৩৬, ৫০, ৫১, ৬৬, ১৬২, ১৬৬
নাগপুর ৬৮, ৭০, ১৩৩, ১৩৪, ২০৩, ২১২
নাহাস পাশা *দেখুন* মুস্তাফা এল-নাহাস পাশা
নিখিল ভারত
  কংগ্রেস কমিটি *দেখুন* অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
  গ্রামীণ শিল্প সংঘ ৫৩
  চরকা সংঘ ৫৩
নীলরতন সরকার, স্যার ৭১, ৭২
নেগুস ৫১
নেপলস ১৮৭
নেপাল ২২
নেলোর ১৬৪
ন্যাশনাল ফ্রন্ট পত্রিকা ৪৮
'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকা ১৬৫, ১৬৬, ১৭১

পট্টভি, ডক্টর *দেখুন* পট্টভি সীতারামাইয়া, ডক্টর
পট্টভি সীতারামাইয়া, ডক্টর ৫৭-৫৯, ১৪৪, ১৫০, ১৬৩, ১৬৫-১৬৭, ১৬৮
পন্থ প্রস্তাব ৭৮, ৯৪, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১০৮, ১১২-১১৪, ১১৭, ১১৯-১২১, ১২৫, ১২৬, ১২৯, ১৩৩, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৯, ১৭১, ১৭২
পাটনা ৬৯, ২১২
পারস্য ২২, ৩৮, ১৮৯
পি. বি. শীল ১৯৫
পুনা ১৩৭
পেশোয়ার ১৪২
প্যান-এশিয়া আন্দোলন ১৮৯
প্যারেলাল ১৭৩
প্যালেস্টাইন ৭, ৬৬
প্রাগ ৫০
প্রভুদয়াল হিমৎসিঙ্কা ১৯৯, ২০০, ২০২

ফিউলোপ মিলার, মিস ১৯২
ফেডারেল রেলওয়েজ অথরিটি ১৬
ফৈজপুর কংগ্রেস ১২৯
ফ্যালটিস, মি. ১৯৪
ফ্রান্স ৫১, ৬৬, ১১১
ফ্রি প্রেস জার্নাল ১৭২
ফ্র্যাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তি ১৪৭

বর্মা ২২
বলশেভিক ১৫১
বল্লভভাই প্যাটেল, সর্দার ৪২, ৫৭-৫৯, ৬৫, ৭০, ৭১, ৯৪, ১০১, ১০৩, ১১৮, ১২৩, ১২৪, ১৩৭, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৭-১৬৯
বসরা ১৮৭
বা ১২২, ১২৭
বাজাজ, শ্রীযুত *দেখুন* যমুনালাল বাজাজ
বারদৌলি ৬১, ৬২, ১৪৫, ১৬৭, ১৬৮
বারাণসী ৫৩, ২১২

বার্মিংহাম ২৫
বার্লিন ১৯২
বিধানচন্দ্র রায়, ডা. ১৩১, ১৪২, ১৯৯, ২০০
বি. সি. রায়, ডা. *দেখুন* বিধানচন্দ্র রায়, ডা.
বিবেকানন্দ ১৮৮
বেজাওয়াদা ৬১
বেনারস *দেখুন* বারাণসী
বেনেশ, ডক্টর ৫০, ৫১
বেলজিয়াম ৫১
বোম্বাই ২৪-২৬, ২৮, ৩৪, ৪৩, ৪৮, ৫৫, ৬১, ৮৬, ১৪১, ১৪৫, ১৬৫, ১৭১, ১৯৬, ১৯৮, ২০৩, ২১৫
বোম্বাই ট্রেড ডিসপিউট বিল ১৩৯, ১৫৩, ১৭১
বোহেমিয়া ১৫৫
ব্রাইস ২৬
ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি ২৩
ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ২০
ব্লুম ৫০, ৫১

ভারত সরকার আইন ৩১, ৬২
ভারতীয় বণিক সভা ২২
ভার্সাই চুক্তি ৫০
ভি.জে. প্যাটেল ৩৭
ভিজিয়ানাগ্রাম ২১৭
ভিয়েনা ২৪, ৫০, ১৬২, ১৮৭, ১৯২-১৯৫
ভুলাভাই দেশাই ৫৮, ১৫২
ভেটার, ড. ১৮৭, ১৯৪, ১৯৬

মজঃফরপুর ৬৯, ৭০
মডার্ন রিভিউ ৬৮
মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত ৫, ৬৮, ১১১
মথুরাদাস ১০৬
মনমোহন ঘোষ ১৯৪
মরিস গয়ার, স্যার ১০৫, ১০৭, ১২০, ১২৪, ১৫৬, ১৭০
মহাত্মাজি *দেখুন* মহাত্মা গান্ধী
মহাত্মা গান্ধী ১৭, ২৩, ৪২, ৪৮, ৬৪-৬৮, ৭০, ৭১, ৭৭, ৭৮, ৮৩, ৮৭, ১১৭, ১১৮, ১৩৭-১৩৯, ১৪৩-১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০-১৭৪, ১৮৬, ১৮৭, ২০৯, ২১৫, ২১৬
মহাদেব দেশাই ১২০
২২৪
মহাবীর সিং, সর্দার ৫
মাণ্ডি হাইড্রোইলেকট্রিক স্কিম ৫৪
মাদ্রাজ/মান্দ্রাজ ৯২, ২০০, ২১২
মানচেন ১৮৭
মার্কস ৪
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৭, ৪৪, ৬০
মালদহ ১৯৭, ২০৯
মালয় ২২
মাসানি, কমরেড ২০৫, ২০৬
মাসারিক, প্রেসিডেন্ট ৫০
মিউনিখ চুক্তি ৬৬, ১৫৫
মিশর ৭, ১৫, ২১, ৬৬
মুঞ্জ, ডা. ১৮৮
মুসলিম লিগ *দেখুন* অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ
মুসোলিনি ৩৮
মুস্তাফা এল-নাহাস পাশা ৬৬, ১৪১
মেক্সিকো ৫৪
মেঘনাদ সাহা ৩৩, ৩৫
মেনশেভিক ১৫১
মেস্টন, লর্ড ৫৬
মোহিতমোহন মৈত্র ৫
মৌলানা আজাদ *দেখুন* মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ৫৬-৫৯, ৬১, ৬২, ৬৬, ৯০, ৯৩, ৯৫, ১০৩, ১৪২, ১৪৫, ১৫৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৯৮, ২০০
মৌলানা সাহেব *দেখুন* মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েন ৩০

যতীন দাস ৫
যমুনালাল বাজাজ ৫৮, ১৮৬, ২০৩, ২০৪
যোধপুর ১৮৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৮, ১৭৭
রাইনল্যান্ড ৫০
রাইশভের ৫০
রাজকোট ৬৫, ৬৬, ৯৭, ১০৩-১০৭, ১১১, ১১৫, ১১৬, ১২০-১২২, ১২৪, ১২৫, ১৩২, ১৪১, ১৪৭, ১৫৫, ১৫৬, ১৭১, ১৭৩
রাজকুমারী অমৃত কাউর ১০৩
রাজেনবাবু/রাজেন্দ্রবাবু *দেখুন* রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বাবু

রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বাবু/ড. ৪২, ৫৮, ৬৬, ১০৩, ১১৫, ১২০, ১২৪, ১৪৫, ১৬৮
রামকৃষ্ণ নামদাস ৫
রামপুর ১২২
রায়, ডা. *দেখুন* বিধানচন্দ্র রায়, ডা.
রাশিয়া *দেখুন* সোভিয়েত রাশিয়া
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৬
রেজাউল করিম ১৯৮, ২০৭

লক্ষ্ণৌ ৮৬, ১৩৫, ১৪২, ২০৪
লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস ৬২, ১২৯
লন্ডন ১৫২, ১৮৭, ১৯৫
লালা শঙ্করলাল ২০৪, ২০৬
লাহোর ১৪২, ১৫৮, ১৯৬, ১৯৭, ২১২
লিগ *দেখুন* অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ
'লিডার' ১১০
লিনলিথগো, লর্ড ৩৯
লীলা ১৯৩, ২১৮
লেনিন ৪, ৬, ৩৮, ১৫১
লেবার পার্টি, গ্রেট ব্রিটেন ২০
লোথিয়ান, লর্ড ১৫০
ল্যাস্কি, প্রফেসর ২৬

শঙ্কররাও দেও ৫৮
শরৎ *দেখুন* শরৎচন্দ্র বসু
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর ৫
শরৎচন্দ্র বসু ৫৭, ৯০, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০১, ১০২, ১১০, ১১৬, ১১৯, ১২৪, ১৪৫, ১৫৬-১৫৯, ১৬৭, ১৭০, ২০০, ২০২
শান্তিনিকেতন ১৩৭, ১৪৬, ১৫২, ১৫৫, ১৭৫, ১৭৭, ১৮০
শিলং ৯০
শুশনিগ ৫০
শ্যাম ২২
শ্রীনিকেতন ১৮০

সতীশবাবু ১৩১, ১৩৪
সত্যাগ্রহ ৪৩, ৪৮, ৬৭, ১১২
সন্তোষ ১৯২, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৭, ২১৯
সর্দার প্যাটেল *দেখুন* বল্লভভাই প্যাটেল, সর্দার
"সাত সাগরের পারে" ২০৮
সাদুল্লা মন্ত্রিসভা ১৫৩
সায়েন্স অ্যান্ড কালচার পত্রিকা ৩৪
সাহা, অধ্যাপক *দেখুন* মেঘনাদ সাহা
সি. আর. দাশ, দেশবন্ধু ২৫
সি. এস. পি. ২১৫, ২১৬ *দেখুন* কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি
সিংহল ২২
সিকান্দার হায়াৎ মন্ত্রিসভা ৯০, ৯১
সিন্ধু ৯০
সুইজারিশ ক্রেডিট্যান্টসটল্ট ব্যাঙ্ক ১৯১
সুইজারিশ ব্যাঙ্কভেরেইন ১৯২
সুদেতেনল্যান্ড ৫০, ৫১
সুনীল *দেখুন* সুনীলচন্দ্র বসু, ডা.
সুনীলচন্দ্র বসু, ডা. ৯৮, ৯৯, ১০১
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার ১৮৮
সুরেশ মজুমদার ১৬৯
সেন, ডা. ১৯২
সেবাগ্রাম ১০৬, ১২২, ১২৩
সোদপুর ১৩১
সোভিয়েত যুক্তফ্রন্ট ২০
সোভিয়েত রাশিয়া ৭, ১১, ২১, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪৪, ৪৫, ৫১, ১৪৭
সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, জার্মানি ১৪
সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, রাশিয়া ১৫১
স্কনেল্ড, মিস ১৯২
স্টালিন ৩৮
স্পেন ৬৬
স্বরূপরাণী নেহরু ৫
স্লোভাকিয়া ১৫৫

হংকং ২৮
হক মন্ত্রিসভা ৯০, ৯১, ১৫৪
'হরিজন' ৬৩
হরিপুরা ৪, ৬৬, ৬৭, ১১১, ১৪৬, ১৬১, ১৯০, ১৯১
হরিপুরা কংগ্রেস ৩১-৩৩, ৬২, ৬৭, ১১৮, ১২৯, ১৫৪
হরেন্দ্র মুন্সি ৫
হাজিপুর ৬৯
হিটলার ৩৮, ৫০, ৫১
হেমপ্রভা দেবী ১৩১
হোর-লাভাল চুক্তি ৫১

9 788177 569391